উপহার

# রাণী-ব্রজসুন্দরী

## প্রথম খণ্ড

ক্ষিতি

( সঞ্চার )

কালাচাঁদ ও ব্রজবালা

১৩২২

# রাণী-ব্রজসুন্দরী

## প্রথম পরিচ্ছেদ
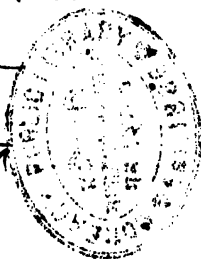
"সন্ন্যাসী-ঠাকুর বল্‌তে পার, আমার রাজুর কপালে কি আছে ?"

রাজুর প্রকৃত নাম কালাচাঁদ রায়। জননী 'রাজু' বলিয়া ডাকিতেন। মাতুল, 'নিরঞ্জন' নাম দিয়াছিলেন; কিন্তু সে নামে তিনি পরিচিত ছিলেন না। প্রথম জীবনে কালাচাঁদ নামেই সংসারে তিনি পরিচিত। কিন্তু জননীর নিকট চিরদিনই তিনি 'রাজু'।

রাজুর বয়স পনর বৎসর; নিবাস বীরজাওন গ্রামে, রাজু বড় ঘরের ছেলে। পিতা নয়ানচাঁদ, গৌড় সুলতানের ফৌজদার ছিলেন। এক্ষণে পিতা গতায়ু, মাতা বর্ত্তমান। জননী হরসুন্দরী, অতিথি সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর বল্‌তে পার, আমার রাজুর কপালে কি আছে ?"

জটাজূট-সমন্বিত বিভূতিবিলেপিত তেজোদীপ্ত-কলেবর সন্ন্যাসী-ঠাকুর হাস্যমুখে উত্তর করিলেন, "মা, আমি ত গণক নই।"

হরসুন্দরী। গণক না হইয়াও কি বলিতে পার না ঠাকুর ?

সন্ন্যাসী। তোমার ছেলে কোথায় আছে ডাক।

তখন ছেলেকে খুঁজিতে চারিদিকে লোক ছুটিল। ছেলে বড় দুরন্ত, বড় একটা ঘরে থাকে না। বৃহৎ অট্টালিকা, বিস্তীর্ণ উদ্যান, তা'তে তার মন টেকে না। কোথায় বাঘ, কোথায় ঘোড়া, এই করিয়া সমস্ত দিন বেড়ায়। পঞ্চদশবর্ষীয় বালকের শক্তি দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইত। যে বাঘের সম্মুখে বড় বড় যোদ্ধারা একাকী যাইতে সাহস পাইত না, কালাচাঁদ অকুতোভয়ে অসিহস্তে তাহার সম্মুখীন হইত। একবার এতদঞ্চলে একটা ঘোড়া আসিয়াছিল, কেহ তাহার পৃষ্ঠে উঠিতে সাহস পায় নাই। বালক কালাচাঁদ লম্ফত্যাগে তাহার পৃষ্ঠে উঠিয়া স্বল্পকাল মধ্যে তাহাকে বশীভূত করিল। বালকের এইরূপ সাহস ও শক্তির অনেক গল্প শুনা যায়।

বালক দুরন্ত হইলেও হিন্দুধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ ছিল। তা' হইবারই কথা। ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মিয়া—পণ্ডিতকুল-তিলক সায়নাচার্য্যের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। সে যখন অনন্যমনে সন্ধ্যাহ্নিক করিত, অথবা বিষ্ণুপূজায় বিনিবিষ্ট থাকিত, তখন তাহাকে দেখিয়া মনে হইত, এমন শান্ত শিষ্ট ছেলে বুঝি জগতে নাই।

কিন্তু গৃহবাহিরে বড় দুরন্ত। গ্রামের যত ছেলে জুটাইয়া বেশ একটা বড় দল করিয়াছিল। তাহাদের ঘোড়ায় চড়িতে, তরবারি চালনা করিতে শিক্ষা দিত। মুসলমানদের তখন অত্যাচার বেশী; কোন গ্রামই তাহাদের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইত না। কিন্তু এই বালক-সম্প্রদায়ের ভয়ে সে অঞ্চলে মুসলমান কোনও অত্যাচার করিত না।

এই বালক-সম্প্রদায়ের নেতা কালাচাঁদ। শুধু শক্তি ও সাহসে যে,

সে সকলের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল, তা' নয়, তাহার চরিত্রবলও যথেষ্ট ছিল। সে কখন মিথ্যা বলিত না, বা অধর্ম্মাচরণ করিত না। সে যাহা ধরিত, তাহা না করিয়া ছাড়িত না। মানুষ বা পশুকে কখন সে ভয় করিত না। তাহার উন্নত চরিত্র দেখিয়া, তাহার উন্নত ললাট, বিশাল বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু, সুগঠিত সুন্দর দেহ দেখিয়া সকলে তাহাকে কেমন একটু ভয় ও ভক্তি করিত।

কিন্তু একজন তাহাকে ভয় করিত না। তাহার নাম, গদাধর সান্যাল। গদাধর সাঁতোড়ের জমীদার-পুত্র। ধনে ও মানে গদাধর, কালাচাঁদ অপেক্ষা বড়; কিন্তু বীর্য্য ও পরাক্রমে বুঝি ছোট। ছোট হইলেও গদাধর কখন কখন কৌশলে কালাচাঁদকে পরাস্ত করিত।

পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিলেও উভয়ে উভয়কে ভালবাসিত, সম্মান করিত। উভয়ের মধ্যে কখন কখন কলহ হইত; কিন্তু কলহহেতু বাক্যালাপ বন্ধ থাকিলেও কেহ কাহারও সঙ্গ ছাড়িত না। একজন বাড়ী গেলে, অপরে তাহার সঙ্গে যাইত; একজন খাইতে বসিলে, অপরে তাহার পাত্রে খাইতে বসিত। কিন্তু যখন তাহারা বালক সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকিয়া মল্লযুদ্ধ বা লক্ষ্যভেদ করিত, তখন তাহারা পরস্পর পরস্পরকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞান করিত।

কোন কোন দিন বালকেরা দুইদলে বিভক্ত হইয়া মল্লযুদ্ধ বা লড়াই করিত। একদলের নেতা কালাচাঁদ, অপরদলের সর্দ্দার গদাধর। কালাচাঁদ কিছু উদ্ধত, কিছু ক্রোধী; সে যেদিন হারিত, সেদিন একটা রাগারাগি হইত। গদাধর কিন্তু তাহা গায়ে মাখিত না—হাসিয়া উড়াইয়া দিত।

প্রত্যহ অপরাহ্নে মল্লক্রীড়া চলিত; আজও চলিতেছিল। এমন সময় কালাচাঁদের গৃহ হইতে জনৈক ভৃত্য আসিয়া কহিল,—"মা-ঠাকুরাণ

ডাক্‌ছেন।” মায়ের নাম শুনিয়া কালাচাঁদ আর কথা কহিল না,—খেলা ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ ভৃত্যের অনুবর্ত্তী হইল। গদাধরও সঙ্গে চলিল।

যেখানে বসিয়া সন্ন্যাসী-ঠাকুর, হরসুন্দরীকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেছিলেন বালকদ্বয় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। হরসুন্দরী বলিলেন, “সন্ন্যাসী-ঠাকুরকে প্রণাম কর।” বালকদ্বয় প্রণাম করিল।

সন্ন্যাসী, কালাচাঁদের ললাট নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, “বালক মহা তেজস্বী—অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন—অস্ত্রকুশলী—

হরসুন্দরী বাধা দিয়া বলিলেন, “ও সব কথা ত আমিও বল্‌তে পারি, ভাগ্যের কথা বল ঠাকুর।”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “ব্যস্ত হইও না মা।”

জননী নীরব হইলেন। বালক, সন্ন্যাসীর দিকে আর একটু সরিয়া আসিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, “মা, তোমার পুত্র মহাযশস্বী হইবে—রাজ-রাজ্যেশ্বর রাজার উপর রাজা হইবে—”

কালাচাঁদ বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বল দেখি ঠাকুর, আমি কখন বাঙ্গালা হ’তে মুসলমান তাড়াতে পারব কি না?”

সন্ন্যাসী। তুমিই একদিন—

কালাচাঁদ। আমিই একদিন কি?

সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বালকের ললাট উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিলেন; কিন্তু কিছু বলিলেন না। জননী ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঠাকুর, মুখখানা এত বিমর্ষ করিলে কেন?”

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, “মা, তোমার এ সন্তানকে অচিরে বিষপ্রয়োগে সংহার কর।”

বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী দ্রুতপদে সেস্থান ত্যাগ করিলেন। গদাধর

ছাড়িল না—সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল; এবং সমীপস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কথাটা শেষ করে যাও ঠাকুর! বন্ধু একদিন কি হবে?"

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "পনর বৎসর মধ্যে নিয়তি তাহা বলিয়া দিবে।"

---

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তারপর সাত বৎসর অতীত হইয়াছে। বালক এক্ষণে যুবক। সময় ধীরে ধীরে কালাচাঁদের দীর্ঘায়ত সুগঠিত দেহের উপর একটী একটী করিয়া সৌন্দর্য্য সাজাইয়াছে। জননী হরসুন্দরী পুত্রের বিবাহ কারণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

সন্নিকটস্থ শ্রীপুর গ্রামে রাধামোহন লাহিড়ীর দুইটী কন্যা ছিল। দুইটিই সুন্দরী। তবে ছোটটির পাশে বড়টিকে রূপহীনা দেখাইত। বড়টির নাম ভূপবালা, ছোটটির নাম ব্রজবালা। ব্রজবালাকে বিবাহ করিবার জন্য অনেকেই লালায়িত; কিন্তু ভূপবালার বিবাহ না হইলে ব্রজবালার বিবাহ হইতে পারে না। জননীর বড় ইচ্ছা, ব্রজবালার সহিত পুত্রের বিবাহ হয়। পুত্রেরও তাই বাসনা।

একদিন গদাধর তাহার বন্ধুকে বলিল,—"কালাচাঁদ, তুমি ভূপবালাকে বিবাহ কর।"

কালাচাঁদ হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি বুঝি ব্রজবালাকে চাও?”

গদা। হাঁ।

কালা। তা’ হ’তে পারে না গদা।

গদা। কেন হ’তে পারে না?

কালা। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, ব্রজবালাকে বিবাহ কর্‌ব।

গদা। কবে প্রতিজ্ঞা করেছ?

কালা। যে দিন তা’কে দেখেছি।

গদা। তা’কে দেখেছ?

কালা। কতবার।

গদা। কালাচাঁদ!

কালা। কি গদা?

গদা। আমিও যে প্রতিজ্ঞা করেছি।

কালা। বেশ, দেখা যাক্ কে পায়।

তখন অপরাহ্ণ। চারিদিকে বন, মধ্যে উন্মুক্ত প্রান্তর, মাথার উপর নীলাকাশ। নীলাকাশ গায় একটা শুভ্রবরণ পাখী উড়িয়া যাইতেছিল, কালাচাঁদ ধনুক উঠাইয়া শরত্যাগ করিল; পাখী অচিরে পদতলে লুটাইয়া পড়িল। গদাধর বলিল, “কালাচাঁদ, যদি আমি সফলকাম হই?”

কালা। তা’ হ’লে এ মুখ আর জন সমাজে দেখাব না।

গদা। কালাচাঁদ, এ প্রতিযোগিতা পরিত্যাগ কর।

কালা। তুমি কেন কর না?

গদা। আমার সাধ্য থাকিলে তোমার জন্যে তাও করিতাম।

কালা। আমারও তাই।

উভয়ের মধ্যে কেমন একটা অপ্রীতি আসিয়া দাঁড়াইল। বাল্যকালের সৌহৃদ্য, স্নেহপ্রীতির বন্ধন দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। গদাধর বলিল, "কালাচাঁদ, কিছুতেই সঙ্কল্প ত্যাগ করিবে না?"

কালা। তুমি কি কখন আমায় সংকল্পচ্যুত দেখেছ?

গদা। বন্ধুর জন্যও সংকল্প ছাড়্‌বে না?

কালা। না—বাঙ্গালার সিংহাসনের জন্যেও না।

গদাধর নিরুত্তর হইল। ক্ষণপরে আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"কালাচাঁদ তুমি কি ব্রজবালাকে ভালবাস?"

কালা। বাসি—সেও বাসে।

গদা। সেও ভালবাসে?

কালা। হাঁ, সেও বাসে।

গদা। মিথ্যাকথা।

কালা। সাবধান গদাধর! কালাচাঁদকে মিথ্যাবাদী বলিতে আজও কেহ সাহস করে নাই।

গদা। আমাকে মারিতে হয় মার; কিন্তু তবু বলিব, কালাচাঁদ তুমি মিথ্যা বলিতেছ।

কালা। কালাচাঁদ জীবনে আজও মিথ্যা বলে নাই। শুন তবে গদাধর, আজিকার কথা নয়—একবৎসর হইতে আমি ব্রজবালাকে ভালবাসিয়া আসিতেছি, একবৎসর হইতে ব্রজবালাও আমাকে ভালবাসিয়া আসিতেছে। উভয়ে উভয়ের প্রণয়াসক্ত—উভয়ে উভয়েরই নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

গদা। আমিও ওই রকম একটা কথা বলিতে পারি।

কালা। কি বলিতে চাও?

গদা। সে কথায় আর কাজ নাই—এখন চলিলাম।

কালা। না ব'লে যেতে পাবে না।

বলিয়া কালাচাঁদ উলঙ্গ তরবারিহস্তে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। গদাধর বলিল, "তুমি কি আমায় মারিতে চাও?"

কালা। ব্রজবালাকে যে ব্যভিচারিণী বলে সে আমার বধ্য।

গদা। তবে আমায় বধ কর; কিন্তু যাহা একবার বলিয়াছি তাহা শতবার বলিতেও পশ্চাৎপদ হইব না।

কালা। গদাধর!

গদা। আর কি কালাচাঁদ? তোমাতে আমাতে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এখন ইচ্ছা হয়—সাধ্য থাকে আমায় বধ কর। কিন্তু একটা কথা বলিয়া রাখি, গদাধরও কখন মিথ্যা বলে না।

কালা। তুমি কি বলিতে চাও, ব্রজবালা তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ?

গদা। হাঁ।

কালা। সে, না তার বাপ্?

গদা। বাপের কথা কে ধরে? সে ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ—অর্থের দাস। আদেশ করিলে এখনই সে মাথায় করিয়া ব্রজবালাকে বহিয়া আনিয়া দেয়। আমি ব্রজবালার কথা বলিতেছি।

কালাচাঁদ কোন উত্তর করিল না; অসি-অগ্রভাগ ভূপৃষ্ঠে প্রোথিত করিয়া নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া বলিল,—"যাও গদাধর, আর কখন আমার সম্মুখে আসিও না।"

গদা। অকারণ গর্ব্ব ও তেজ দেখাইয়া কোন পৌরুষ নাই; কালাচাঁদ রায়!—তোমার বাহুতে যেমন শক্তি আছে, অনেকেরই তেমনি আছে।

কালা। না, তা' নাই, একদিন তা' দেখিবে।" বলিয়া কালাচাঁদ দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কালাচাঁদ গৃহে ফিরিয়া মায়ের কাছে বলিল, "মা, আমি তোমার বধূ আনিতে চলিলাম। যদি রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বে ফিরিয়া না আসি, তাহা হইলে জানিবে, তোমার পুত্রের সহিত এ জীবনে আর সাক্ষাৎ ঘটিল না।"

হরসুন্দরী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কি হয়েছে বাবা?" কিন্তু সে কথার কে উত্তর দেয়? কালাচাঁদ তখন অশ্বারোহণে শ্রীপুর অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে।

শ্রীপুর গ্রামের এক প্রান্তে রাধামোহনের ঘর। ঘর অতি সামান্য। সামান্য হইলেও তন্মধ্যে যে মহামূল্যরত্ন নিহিত রহিয়াছে, তাহা অনেক ধনী ভূস্বামীর গৃহে নাই। কালাচাঁদ সেই রত্নলাভাশায় বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে।

গ্রাম্য-মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই কালাচাঁদ দূর হইতে দেখিতে পাইল, দুইটি মেয়ে কলসী কক্ষে জল আনিতে পুষ্করিণীর দিকে আসিতেছে। পুষ্করিণী গ্রামের বাহিরে। তখনকার দিনে গ্রামে গ্রামে বড় বড় দীর্ঘিকা ছিল। এখন সে সব লোপ পাইতে বসিয়াছে। তখন পুষ্করিণী খনন, পুণ্যময় কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। এখন লোকে পুণ্য খুঁজে না শুধু নাম খুঁজে। তখন পরোপকার লক্ষ্য ছিল, এখন নিজের উপকার লক্ষ্য হইয়াছে, সুতরাং এখন জলাশয় কমিয়া যাইতেছে—চিকিৎসালয় বাড়িতেছে।

যে দুইটি মেয়ে দীর্ঘিকায় জল আনিতে যাইতেছিল, তাহারা রাধা-

মোহনের কন্যা। ভূপবালা আজও ষোড়শ বৎসর অতিক্রম করে নাই; ব্রজবালা তার চেয়ে এক বৎসরের ছোট। ভূপবালা নিরক্ষরা—ব্রজবালা বিদুষী। দুইজনেই সুন্দরী; কিন্তু ব্রজবালাকে দেখিলে ভূপবালার দিকে ফিরিয়া চাহিতে বাসনা হয় না। ভূপবালা গম্ভীরবদনা—ব্রজবালা সদাহাস্যমুখী; ভূপবালা ধীরা, সদা সঙ্কুচিতা—ব্রজবালা চঞ্চলা, গর্ব্বিতা; ভূপবালা লজ্জাবিনম্রবদনা; ব্রজবালা লজ্জাপরিশূন্যা। একটি মল্লিকা—অপরটি স্থল-পদ্মিনী। একটী অন্ধকারের আবরণ পৃথিবীতে না পড়িলে ফুটে না—অপরটি সূর্য্যালোকে জগৎ উদ্ভাসিত না হইলে ফুটিতে চায় না। সুতরাং ব্রজবালা নয়নরঞ্জিনী চিত্তোন্মাদকারিণী রূপসী-শিরোমণি।

কালাচাঁদ অশ্বারোহণে আসিতেছে দেখিয়া ব্রজবালা গতি মন্থর করিল। ভূপবালা সমভাবে চলিতে লাগিল,—পথের পানে চাহিয়া আনতবদনে চলিতে লাগিল। কালাচাঁদ বুঝিল, ব্রজবালা ভালবাসে, তাই সে গতি মন্থর করিল। সমীপস্থ হইয়া বলিল, "ব্রজবালা, আমি তোমার নিকটে এসেছি।"

ব্রজবালা উত্তর করিল না,—শুধু একবার নীলোৎপল তুল্য নয়ন তুলিয়া কালাচাঁদের পানে চাহিল। দৃষ্টিতে কটাক্ষ ছিল না, কিন্তু হাসি ছিল। ব্রজবালার চক্ষু দুইটি আকর্ণ বিস্তৃত—বড় সুন্দর—নীল পদ্মের উপর যেন কৃষ্ণকায় চঞ্চল ভ্রমর উড়িয়া বেড়াইতেছে। কালাচাঁদ মুগ্ধ চিত্তে নীলপদ্ম দেখিতে লাগিল। ব্রজবালা আর অপেক্ষা করিতে পারে না—ভূপবালা অনেকটা পথ চলিয়া গিয়াছে। ব্রজবালা দ্রুতপাদ-বিক্ষেপে চলিতে লাগিল। কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, "ব্রজবালা, তুমি আমাকে ভালবাস?"

ব্রজবালা। কতবার বলব?

কালাচাঁদ। আর একবার বল।

ব্রজবালা। বাসি।

কালাচাঁদ। আর কাহাকেও বাস না?

ব্রজবালা সহসা ঘুরিয়া কালাচাঁদের পানে চাহিল—মুহূর্ত্তের জন্য তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করিল; পরে বলিল, "না।"

কালা। সত্য বলিতেছ?

ব্রজ। হাঁ।

কালা। মাথার উপর নীলাকাশ; তার উপর ভগবান্—তুমি সত্য বলিতেছ?

ব্রজবালা একবার আকাশ পানে চাহিল; তথায় সকলই শূন্য দেখিল। পরে ফিরিয়া অগ্রগামিনী ভগিনীর পানে চাহিয়া দেখিল; সেও অনেকটা দূরে। ব্রজবালা নিঃসঙ্কোচে উত্তর করিল,—"সত্য বলিতেছি।"

কালাচাঁদ সে কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিল; সহাস্যমুখে প্রেমার্দ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"ব্রজ আমায় বিবাহ কর্‌বে?" ব্রজ উত্তর না করিয়া শুধু একবার সলজ্জ সহাস্য দৃষ্টিতে কালাচাঁদের পানে চাহিল। কালাচাঁদ সেই দৃষ্টিটুকু লইয়া ব্রজবালার পিতৃভবনাভিমুখে প্রস্থান করিল।

---

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাধামোহনের গৃহে কালাচাঁদ সচরাচর আসিত; সুতরাং তাহাকে দেখিয়া গৃহস্বামী কিছুমাত্র বিস্মিত হইলেন না। কিন্তু কালাচাঁদ যখন বলিল,—"লাহিড়ী মহাশয়, আমি তোমার কন্যাকে বিবাহ কর্‌তে এসেছি," তখন রাধামোহনের বিস্ময় ও আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি বলিলেন, "বেশ বাবা, বেশ! তোমার মত জামাই পাওয়া ত ভাগ্যের কথা। তা' বিবাহ কবে হ'বে?"

"আজই।"

"আজই!"

"হাঁ, সন্ধ্যার পরে।"

"সে কি বাবা, আমার যে কোন যোগাড় নেই।"

"কোন যোগাড়ের প্রয়োজনও নেই, শুধু একটি পুরোহিত আবশ্যক। তা' গ্রামে তা'র অভাব কি?"

লাহিড়ী মহাশয়ের নগ্ন স্কন্ধের উপর একখানা গামছা ছিল। তিনি তাহা বাম স্কন্ধ হইতে উঠাইয়া দক্ষিণ স্কন্ধে স্থাপন করিলেন; শামুক টিপিয়া একটিপ নস্য গ্রহণ করিলেন; পরে কেশ-বিরল মস্তকে হস্ত বিমর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "তা পুরোহিতের অভাব কি?"

"তবে আয়োজন করুন।"

আয়োজন কি করিতে হইবে তাহা লাহিড়ী মহাশয় জানেন না; তিনি সাদাসিধা লোক, সংসারের ব্যাপারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। তিনি স্মৃতি, ন্যায়, পুরাণ লইয়া থাকেন; গৃহিণী সংসার দেখেন, প্রাপ্যাদি আদায় করেন, গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে প্রয়োজন অপ্রয়োজনে কোন্দলাদি করেন। সুতরাং কন্যার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তার এলাকার বহির্ভূত। ভাবিয়া চিন্তিয়া কর্ত্তা, গৃহিণীর শরণাপন্ন হইলেন।

গৃহিণী তখন গোশালায় দুগ্ধদোহনে বিনিযুক্ত। কর্ত্তা সংবাদ দিলেন, "তোমার কন্যার বিবাহ উপস্থিত।"

গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, গাভী ও বৎস উভয়েই পরিত্রাণ পাইল। গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পাত্র কে গো?"

কর্ত্তা। কালাচাঁদ রায়।

গৃহি.। বেশ পাত্র, বেশ ছেলে! ভূপিও কালাচাঁদকে ভালবাসে।

কর্ত্তা। কেমন করে জান্‌লে?

গৃহি। কেমন করে আবার জান্‌লুম? আমি কি কাণা, না আমি কখন কাউকে ভালবাসি নি?

কর্ত্তা মানিয়া লইলেন, গৃহিণী চক্ষুবিশিষ্টা ও ভালবাসিতে সম্পূর্ণ সমর্থা। গৃহিণী তবু ছাড়িলেন না,—তিনি সহাস্যে বর্ণন করিতে লাগিলেন, তিনি কিরূপে কৈশোরে বধূ জীবনে লুকাইয়া লুকাইয়া রাধামোহনকে দেখিতেন—তিনি কিরূপে দেখা না দিয়া দেখিবার জন্য নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করিতেন—

কর্ত্তা বাধা দিয়া বলিলেন, "সে সব কথা এখন থাক্—সময় অল্প, তুমি এখন বিবাহের উদ্‌যোগ কর গে।"

গৃহি। বিয়ে কবে?

কর্ত্তা। আজ।

গৃহি। সে কি গো!

কর্ত্তা। তা' আমি কি করব? ছেলে জিদ ধরেছে, কাজেই আমাকে সম্মতি দিতে হয়েছে।

গৃহি। সম্মতি দিলেই হ'ল কি? ঘরে ত কিছু থাকা চাই; যোগাড় কোথা হ'তে হবে?

কর্ত্তা। ছেলে বলে যোগাড়ের প্রয়োজন নেই—শুধু পুরোহিত ডাক'।

গৃহি। আজ দিন ভাল?

কর্ত্তা। উত্তম দিন—অধিকন্তু সুতহিবুক যোগ—

গৃহি। ও সব রাখ। তা আমাদের কিছু খরচ হবে না?

কর্ত্তা। কিছু না।

গৃহিণী আহ্লাদে পরিপ্লুত হইলেন। হইবারই কথা; অরক্ষণীয়া কন্যা বিনাব্যয়ে পাত্রস্থা হইতে চলিল। পাত্র আবার যে সে নয়,—রূপে গুণে, কুলশীলে বাসবতুল্য। গৃহিণীর আনন্দ দেখিয়া কর্ত্তা, দন্তরাজি আকর্ণ বিস্তার করিয়া হাসিলেন, এবং দক্ষিণ স্কন্ধের গামছা বামস্কন্ধে ফেলিয়া পুরোহিত অন্বেষণে যাত্রা করিলেন।

পুষ্প, চন্দন, শালগ্রাম-শিলাদি লইয়া পুরোহিত যথাসময়ে বিবাহ দিতে আসিলেন। পুরোহিত আসিল দেখিয়া পাড়ার লোকেরা ব্যাপার কি দেখিতে আসিল। মেয়েছেলে সকলে শুনিল, কালাচাঁদের সঙ্গে ভূপবালার বিবাহ। ব্রজবালাও শুনিল; সে বড় একটা দুঃখীত হইল না, কিন্তু বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইল। বাণাহতা ব্যাঘ্রী যেমন গর্জ্জিয়া উঠে, সেও তেমনই গর্জ্জিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার গর্জ্জন কেহ শুনিল না, ক্রোধও কেহ দেখিল না। সে হাস্যমুখে আলিপনা দিতে লাগিল, পিঁড়ির অপর পৃষ্ঠে পিটুলী গোলা জলে শুধু লিখিল,—

বিলোক্য পরদার-প্রেমাভিমত্তং
চন্দ্রমসং তং প্রফুল্লমনসং
বিদীর্য্য শতধা ক্রোধনো গদাপাণিঃ
সমাকীরন্নভসি হ্মাতিমিরাবৃতে ॥

কি লিখিল, না লিখিল, কেহ তাহা দেখিল না—বুঝিল না। সকলে তখন ক'নেকে সাজাইতে ব্যস্ত। সাজাইবার কিছু নাই। ফুল চন্দনে যতদূর হয়, ততদূর হইল। ফুল চন্দন ছাড়া আর একটা জিনিষ ছিল,—সেটা ভূপবালার বিমল আনন্দোচ্ছ্বাস। ভূপবালা ফুলহারে সাজিয়া, চন্দনে চর্চ্চিত ও বিমল জ্যোতিতে স্নাত হইয়া পাত্রের নিকট আনীত হইল, কালাচাঁদ বলিল, "এ কে? ব্রজবালা কই?"

রাধামোহন বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ব্রজবালা?"

সুদূরশ্রুত অশনিনিনাদতুল্য গর্জ্জিয়া কালাচাঁদ বলিল, "হাঁ ব্রজবালা—একে কে চায়?"

অশনি ভূপবালার মাথায় পড়িল। কিন্তু সে মরিল না, মরিলে বুঝি ভাল ছিল; হতভাগিনী নীরবে অধোবদনে বসিয়া রহিল। রাধামোহন ভাবিলেন, কালাচাঁদ হয়ত ভূপবালাকে চিনিতে পারে নাই। তাই তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন,—

"এটি আমার কন্যা ভূপবালা।"

কালাচাঁদ উগ্রভাবে বলিল, "তোমার ভূপবালাকে যথা ইচ্ছা দান কর গে, আমায় ব্রজবালা দাও।"

রাধামোহনের মাথায় পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পুরোহিতের পানে চাহিলেন। পুরোহিত তখন মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন, "জ্যেষ্ঠা কন্যা পাত্রস্থা না হইলে কনিষ্ঠা উদ্বাহিতা হইতে পারে না।"

কথাটা কালাচাঁদের স্মরণ ছিল না। অপরাহ্ণে গদাধর কেমন গোল বাধাইয়া দিয়াছিল। এক্ষণে এই গুরুতর আপত্তির কথা শুনিয়া কালা-চাঁদ নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, ভূপবালা চৈতন্য হারাইয়া ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িল। আত্মীয়েরা তখন তাহাকে ধরাধরি করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে গৃহান্তরে লইয়া গেল। সেখানে জননীর যত্নে সত্বরই ভূপবালা চৈতন্য লাভ করিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল; দেখিল, ঘরে আর কেহ নাই। তখন অতি মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "মা!"

জননী উত্তর করিলেন,—"কি মা?"

ভূপ। মা, আমি চিরকাল এমনই থাকিব, তুমি ব্রজবালাকে পাত্রস্থ কর।

মা। সে কি ভূপ!

ভূপ। কেন মা, তোমাদের কাছেই না হয় চিরকাল থাক্‌লুম।

মা। আমরা আর ক'দিন মা?

ভূপবালা কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময় রাধামোহন হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কি?"

কর্ত্তা উত্তর করিলেন, "কালাচাঁদ দুই জনকেই বিবাহ করিতে চায়।"

গৃহিণী। দুই মেয়ে কে?

কর্ত্তা। হাঁ।

গৃহিণী। তোমার মত কি?

কর্ত্তা। আমি ত বিশেষ কোন আপত্তি দেখি না, কুলীনের ঘরে এমন অনেক ঘটে। তা' তোমার মত না হ'লে ত কিছু হবে না।

গৃহিণী নিরুত্তর রহিলেন। গৃহকোণে মৃন্ময় দীপাধারে ক্ষুদ্র দীপ জ্বলিতেছিল; গৃহিণী দীপ পানে চাহিয়া একটু কি ভাবিলেন। বোধ হয় গদাধরকে তাঁহার মনে পড়িল। গৃহিণীর বড় ইচ্ছা ছিল, রাজকুমারের সহিত কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয়। তিনি এই কামনা বুকে ধরিয়া গ্রাম্য দেবতা ভীমেশ্বরের মন্দিরে কত মাথা কুটিয়াছেন। তাঁহার স্মরণ হইল, একজন জ্যোতিষী গণনা করিয়া বলিয়াছিল, ব্রজবালা রাজরাণী হইবে। এক্ষণে সব আশা চূর্ণ হইল। গৃহিণী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিলেন, —"তাই হো'ক।"

কর্ত্তা প্রস্থান করিলেন, ভূপবালা ডাকিল, "মা!"

জননী উত্তর না দিয়া কন্যার পানে চাহিলেন। কন্যা বলিল, "ছি!"

জননী নয়ন ফিরাইয়া লইলেন—কোনও উত্তর করিলেন না। কন্যা বলিল, "এখনও বাবাকে ফিরাও!"

জননী। ভবিতব্য কে খণ্ডাবে মা?

ভূপ। ভবিতব্য ত মানুষ নিজেই সৃষ্টি করে।

জননী। এখন আর ফির্‌বার উপায় নাই—বাগ্‌দান এতক্ষণ হ'য়ে গেছে।

বাগ্‌দান হইয়াও গিয়াছিল। ক্ষণপরে কন্যাদান হইল। কালাচাঁদ, দুইজনকেই বিবাহ করিল—ছাড়িল না। তবে ভূপবালাকে সঙ্গে লইয়া গেল না—শুধু ব্রজবালাকেই লইল। বিবাহের পর রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় ব্রজবালাকে শিবিকায় উঠাইয়া কালাচাঁদ অশ্বারোহণে গৃহে ফিরিলেন।

পরদিন প্রভাতে আসিয়া গদাধর দেখিল, রাধামোহনের গৃহ নিরানন্দ। শুনিল, কালাচাঁদ পূর্ব্বরাত্রিতে ব্রজবালাকে বিবাহ করিয়া লইয়া গিয়াছে। শুষ্ক ফুল, ছিন্ন মালা, উৎসৃষ্ট চন্দন, চণ্ডীমণ্ডপের স্থানে স্থানে পড়িয়া

রহিয়াছে। আলিপনা দেওয়া পিঁড়িখানি দেওয়ালের গায় হেলান রহিয়াছে। পিঁড়িতে কি লেখা ছিল। গদাধর পড়িল ;—

বিলোক্য পরদারপ্রেমাভিমত্তং
চন্দ্রমসং তং প্রফুল্লমনসং ।
বিদীর্য্য শতধা ক্রোধনো গদাপাণিঃ
সমাকীরন্নভদ্রি হ্যমাতিমিস্রাবৃতে ॥

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তা'রপর আরও দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। কালাচাঁদ দেখিল, ব্রজবালাকে লইয়া যতটা সে সুখী হইবে মনে করিয়াছিল, ততটা সুখী হইতে পারিল না। ব্রজবালা ক্রোধী, গর্ব্বিতা, মুখরা, উদ্ধতা। ব্রজবালা আত্মসুখ-পরায়ণা, নির্ম্মম হৃদয়হীনা, ব্রজবালা ঘোর আত্মাভিমানিনী, লজ্জাসঙ্কোচ-পরিশূন্যা। কিন্তু তা'র রূপ আছে—নিরুপম, অতুলনীয় রূপ। যৌবনের সঙ্গে রূপ দিন দিন বাড়িতেছিল। বিধাতা যেন সৌন্দর্য্যরাশি আহরণ করিয়া আনিয়া তাহার অঙ্গে অঙ্গে সাজাইতে লাগিলেন। কিন্তু রূপের তৃষ্ণা, রূপের মোহ কতদিন? পিপাসা মিটিয়া গেলে স্বচ্ছ নির্ঝরিণীর জলও ভাল লাগে না। দুই বৎসরের মধ্যেই কালা-চাঁদের ভুল ভাঙ্গিল। তখন সে পা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্রজবালা ভাবিয়াছিল, সে বুঝি রূপের মোহে কালাচাঁদকে চিরদিন

আচ্ছন্ন রাখিতে পারিবে। যখন দেখিল, কালাচাঁদ উপাসক না থাকিয়া সমালোচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন তাহার ক্রোধ, আত্মাভিমান আরও গর্জ্জিয়া উঠিল। যতই সে কালাচাঁদকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল, ততই কালাচাঁদ দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে এমন একদিন আসিল, যে দিন কালাচাঁদ ভাবিল, এ অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে গৃহে আনিয়া ভাল করি নাই।

তখন ভূপবালাকে মনে পড়িল। ভূপবালা পিতৃগৃহে; একদিনের জন্যও সে শ্বশুরালয়ে আসে নাই। অভাগিনী ভূপবালা যেখানে ফুটিয়াছিল, হতাদরে সেইখানেই শুকাইতেছিল। একদিনের জন্যও সে শ্বশুরালয়ের নাম করে নাই, একদিনের জন্যও সে নিজের দুঃখের কথা মুখ ফুটিয়া অপরকে বলে নাই; অনাঘ্রাত বনকুসুমের মত নির্জ্জনে ফুটিয়া নির্জ্জনে শুকাইতেছিল।

বহুকাল পরে তাহাকে কালাচাঁদের মনে পড়িল—বহুকাল পরে সেই চিরলাঞ্ছিত বিস্মৃত-প্রায় ভার্য্যাকে কালাচাঁদের স্মরণ হইল। প্রাবৃট্‌কালে ঘোর ঝঞ্ঝাবাতের দিনে সূর্য্যকে যেমন মনে পড়ে, ভূপবালাকে কালাচাঁদের তেমনই মনে পড়িল; কিন্তু তাহার মুখখানি কি রকম, কালাচাঁদ তাহা কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিল না।

কালাচাঁদ একদিন অপরাহ্ণে পালঙ্কোপরি বসিয়া ব্রজবালাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভূপবালাকে মনে পড়ে?"

ব্রজবালা শয্যায় শুইয়া মেঘদূত পড়িতেছিল; পুঁথি হইতে নয়ন উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বল দেখি?"

কালাচাঁদ। তাহাকে আনিব ভাবিতেছি।

ব্রজবালা। কোথায়?

কালাচাঁদ। এখানে।

ব্রজবালা পুঁথি ফেলিয়া দিয়া বলিল, "আমি থাকিতে এখানে অপরের স্থান হইতে পারে না।"

কালাচাঁদ। সে কথা আমি বুঝিব,—তুমি কে?

ব্রজ। আমি কে? এরই মধ্যে বিস্মিত হয়েছ আমি কে? ভাল, আগেকার কথা না তুলে, এখনকার পরিচয়ই দি,—আমি তোমার স্ত্রী, সহধর্ম্মিণী, গৃহকর্ত্রী।

কালা। ভূপবালাও আমার স্ত্রী, সহধর্ম্মিণী—

ব্রজ। সে তোমার উপপত্নী।

কালা। ব্রজবালা!

ব্রজ। ভয় দেখাচ্ছ? ভয় কা'কে বলে ব্রজবালা তা' জানে না। আমি শতবার বল্‌ব, ভূপবালা তোমার উপপত্নী।

কালা। তুমি নির্লজ্জ।

ব্রজ। সত্যবাদী মাত্রেই নির্লজ্জ। তুমি সত্য ক'রে বল দেখি—মাথার উপর আকাশ, তার উপর ভগবান্, তুমি সত্য ক'রে বল দেখি, তুমি কি শুধু ব্রজবালাকে বিবাহ কর্‌তে যাও নি?

কালা। গিয়েছিলাম, কিন্তু—

ব্রজ। তুমি কি আমার জন্যে তোমার বাল্যবন্ধু গদাধরের সহিত কলহ কর নি? তুমি কি একদিন সন্ধ্যাকালে উন্মত্ত হৃদয়ে ছুটে গিয়ে পিতার নিকট করযোড়ে ব্রজবালাকে ভিক্ষা কর নি? তুমি কি বিবাহ-সভায় ভূপবালাকে উপেক্ষা ক'রে ব্রজবালার জন্য লালায়িত হও নি?

কালা। হয়েছিলাম, কিন্তু ব্রজবালাকে আগে বিবাহ করি নি—ভূপবালাকে করেছিলাম।

ব্রজ। যা'কে আগে বিবাহ করেছ, সেই বুঝি তোমার স্ত্রী?

কালা। সেই আমার সহধর্ম্মিণী।

ব্রজ। আর পরে যাকে বিবাহ করেছ?

কালা। সে?—সে—

ব্রজ। উপপত্নী—উত্তম। যে তোমার স্ত্রী, তাহাকে লইয়া থাক—উপপত্নীকে বিদায় দাও। এক গৃহে স্ত্রী ও উপপত্নীর স্থান হইতে পারে না।

কালা। ব্রজবালা, তুমি পাপিষ্ঠা।

ব্রজ। আর তুমি ধার্ম্মিকচূড়ামণি, না? একজনের হৃদয় পদদলিত করিয়া কুক্কুরীর ন্যায় তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, আর একজনকে বলি দিবার অভিপ্রায়ে যূপকাষ্ঠ নির্ম্মাণ করিতেছ; তুমিই ধর্ম্মস্তম্ভ।

কালাচাঁদ উত্তর করিল না; শয্যা ছাড়িয়া গবাক্ষ সন্নিধানে আসিয়া দাঁড়াইল। গবাক্ষ পথ দিয়া আকাশ, প্রান্তর, নদী দেখা যাইতেছিল। কালাচাঁদ মহাশূন্য পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্রজবালা, মেঘদূত উঠাইয়া লইয়া পুঁথি পানে চাহিয়া রহিল।

কালাচাঁদ দেখিল, আকাশ যেন প্রান্তরের বুকের উপর ক্রমে নামিয়া আসিতেছে। আকাশ যত নামিয়া আসিতেছে, পৃথিবী তত নামিয়া যাইতেছে। দূরে পর্ব্বতমালা মস্তক উন্নত করিয়া আকাশকে ধরিয়া রাখিবার প্রয়াস পাইতেছে। আকাশ বাধা মানিতেছে না,—পৃথিবীকে পিষিয়া মারিবার উপক্রম করিতেছে। অবশেষে পৃথিবী সরিয়া গেল—পর্ব্বতমালা কোথায় মিলাইয়া গেল,—আকাশতলে রহিল, কালাচাঁদ একা। কালাচাঁদ যে দিকে চায়, সেই দিকে আকাশ—ধূম্রকায় দীপ্তিশূন্য অনন্ত অসীম আকাশ। কালাচাঁদ অবলম্বন খুঁজিল, পাইল না। কালাচাঁদের দৃষ্টি রুদ্ধ হইল, শ্বাস বন্ধ হইল।

অনেকক্ষণ পরে কালাচাঁদ সংজ্ঞা লাভ করিল। তখন সে বাতায়ন

হইতে সরিয়া আসিয়া বলিল, "অনেক আশা করিয়া তোমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম, ব্রজবালা।"

ব্রজবালা পুঁথি হইতে নয়ন না উঠাইয়া অতি রুক্ষস্বরে বলিল, "আমিও অনেক আশা বুকে ধরিয়া সকলকে ঠেলিয়া তোমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম।"

কালা। সকলকে ঠেলিয়া ?

ব্রজ। হাঁ, সকলকে ঠেলিয়া। তুমি যেমন একদিন আমার উপাসক ছিলে, তেমনই অনেকে ছিল।

কালা। গদাধরের কথা বলিতেছ ?

ব্রজ। নামে প্রয়োজন কি ?

তখন গদাধরের বিস্মৃত-প্রায় কথাগুলি কালাচাঁদের স্মরণ পথে উদিত হইল। সে একদিন আকাশতলে বনরাজি বেষ্টিত প্রান্তরের মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল,—'গদাধরও কখন মিথ্যা বলে না।' কালাচাঁদ ভাবিল, "তবে গদাধর কি সত্য বলিয়াছিল ?" জিজ্ঞাসা করিল, "গদাধর কি তোমাকে বিবাহ কর্‌তে চেয়েছিল ?"

"চেয়েছিল—শতবার চেয়েছিল !"

কালাচাঁদ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। তারপর সরিয়া গেল; দূরে গবাক্ষ সন্নিধানে আসিয়া পুনরায় দাঁড়াইল। আকাশ পৃথিবী, পাহাড় নদী সব দেখিল। তারপর আবার ফিরিয়া গিয়া ব্রজবালার অতি সন্নিকটে দাঁড়াইল; এবং ঝাঁকিয়া পড়িয়া ব্রজবালার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া দন্তে দন্ত চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি তা'কে ভালবাসিতে ?"

ব্রজ। আমি ?—আমি ?—তুমি নির্ব্বোধ।

কালা। শতবার নির্ব্বোধ; নইলে তোমায় বিবাহ করি ?

ব্রজ। তুমি অকৃতজ্ঞ।

কালা। আমি অকৃতজ্ঞ নই,—তুমিই অকৃতজ্ঞ ব্রজবালা! মানুষ, মানুষকে যতটা দিতে পারে, আমি তোমাকে ততটা দিয়েছিলাম।

বলিয়া কালাচাঁদ কক্ষত্যাগ করিল। স্ত্রীর সহিত কলহ করা তাহার অভিপ্রায় নহে। সে অনেক সহিয়াছে, ব্রজবালার শত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছে; কিন্তু আজ আর পারিল না—ধৈর্য্যচ্যুত হইল। সে মায়ের কাছে গিয়া বলিল, "মা, বড় বউ কি চিরদিন পিত্রালয়েই থাকবে?"

মায়ের অপরাধ কি তাহা ত জানি না। পুত্র, বড় বউকে আনিতে ইচ্ছা করে নাই, সুতরাং তাহাকে আনা হয় নাই, তবে ছেলের নিকট মা চিরদিনই অপরাধী; মায়ের নিকট ছেলে কখন অপরাধী নয়। এক্ষণে পুত্র ইচ্ছা প্রকাশ করিবা মাত্র জননী আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "থাকবে কেন? আমি এখনই লগ্ন দেখিয়ে তাকে আনাবার ব্যবস্থা করছি।"

জননী ব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ পুরোহিতের নিকট লোক পাঠাইলেন। অসময়ে তলব পাইয়া পুরোহিত মহাশয় অধিকতর ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। তবে পাঁজি পুঁথি আনিতে ভুলিলেন না। সেটা সকল সময়ে দ্বিতীয় বস্ত্রের ন্যায় পুরোহিত মহাশয়ের সঙ্গে থাকিত। তিনি অনেক গণনার পর দিন স্থির করিয়া দিলেন,—পরদিন প্রভাতে দশ দণ্ডের পর বধূকে আনিবার লগ্ন স্থির হইল। সে সংবাদ সকলে শুনিল,—ব্রজবালাও শুনিল। কিন্তু কাহাকেও সে কিছু বলিল না—স্বামীর সহিতও আর সাক্ষাৎ করিল না। গভীর নিশীথে যখন সকলে সুপ্ত, তখন সে তাহার অলঙ্কার ও অর্থ লইয়া গৃহত্যাগ করিল।

---

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া কালাচাঁদ দেখিল, তাহার কক্ষমধ্যে হর্ম্ম্যতলে একখানি পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। পত্রখানা ব্রজবালার। উঠাইয়া লইয়া কালাচাঁদ পড়িল। তাহাতে লেখা ছিল,—

"তুমি ভেবেছ কালাচাঁদ, ব্রজবালা তোমার খেলার পুতুল—ব্রজবালা তোমার বিলাসের উপাদান! ভুল বুঝেছ মূর্খ! ব্রজবালা দাসী হ'তে জন্মগ্রহণ করে নি—ব্রজবালা ললাটে রাজমুকুট ধারণ ক'রে সিংহাসনে বস্‌তে জন্মেছে।

যে রূপ পৃথিবীতে দুর্লভ—দিল্লীশ্বরের ঈপ্সিত, আকাঙ্ক্ষিত, তুমি তাহা উপভোগ কর্‌তে পেয়েছিলে; কিন্তু তুমি আপনাকে ভাগ্যবান্‌ মনে না ক'রে, নিজের ভাগ্যলক্ষ্মীকে পদাঘাতে দলিত কর্‌লে।

আমি চলিলাম—তোমার পাপগৃহ ছাড়িয়া—তোমার নীচ সংসর্গ ছাড়িয়া জন্মের মত চলিলাম। ভরসা আছে, একদিন আবার সাক্ষাৎ হইবে; তখন দেখিব, কে বলবান্‌—কে কাহাকে দুর্ব্বল পাইয়া পীড়ন করে।"

পত্রে স্বাক্ষর নাই—স্বাক্ষরের প্রয়োজনও নাই। পত্র পড়িতে পড়িতে কালাচাঁদ দ্বাদশ সূর্য্যের তেজে জ্বলিয়া উঠিল, সে ক্রোধানল—আগ্নেয় ভূধরের সঞ্চিত অনল রাশির তুল্য—এতদিন শমিত ছিল, তাহা আজ জ্বলিয়া উঠিয়া কালাচাঁদের ধৈর্য্য, হিতাহিত জ্ঞান ভস্মীভূত করিল। কালাচাঁদ কাহাকেও কিছু না বলিয়া অসি হস্তে অশ্বারোহণে গৃহত্যাগ

করিল। তাহার রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া কেহ কিছু জিজ্ঞাসাও করিতে সাহস পাইল না।

কালাচাঁদ গৃহত্যাগ করিয়া গদাধরের অট্টালিকা অভিমুখে ধাবিত হইল। পথে যাইতে যাইতে ভাবিল,—"এতদিন আমি দুর্ব্বল ছিলাম, আজ আমি সবল। এতদিন আমি পীড়ন করিতে অসমর্থ ছিলাম, আজ আমি সম্পূর্ণ সমর্থ।"

কালাচাঁদ অচিরে গদাধরের অট্টালিকা-দ্বারে আসিয়া উপনীত হইল। শুনিল, গদাধর তথায় নাই। গদাধর ছিলও না। সে এখানে বড় একটা আর থাকে না। প্রয়োজন হইলে কথন কথন আসে; নতুবা সাঁতোড়ে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করে। সাঁতোড় এখান হইতে অনেকটা পথ। সেইখানেই ক্ষুদ্র রাজ্যের ক্ষুদ্র রাজধানী। বীরজাওন গ্রামে বিস্তীর্ণ জমীদারি ছিল বলিয়া তথায় একটা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল; এবং একজন প্রবীণ কর্ম্মচারীর অধীনে থাকিয়া গদাধর কাজ কর্ম্ম শিক্ষা করিত।

গদাধরের পিতা তখন জীবিত ছিলেন। তিনি সাঁতোড়ে থাকিতেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শক্তিধর তাৎকালিক রাজধানী গৌড়ে থাকিতেন। গদাধর বীরজাওনে থাকিয়া বিষয় কর্ম্ম দেখিতেন। কিন্তু গত দুই বৎসর হইতে এতদঞ্চলে বড় একটা সে আসে না।

কালাচাঁদ যখন আসিয়া দেখিল, গদাধর প্রাসাদে নাই, তখন সে সাঁতোড়ের পথ ধরিল, অনেকটা পথ যাইবার পর কালাচাঁদ দেখিল, কে একজন অশ্বারোহী বীরজাওন অভিমুখে আসিতেছে। তাহার সঙ্গে প্রায় বিংশতি সশস্ত্র শরীর-রক্ষী। কালাচাঁদ ক্রমে নিকটস্থ হইল; তখন অশ্বারোহীকে কালাচাঁদ চিনিল,— সে গদাধর।

উভয়ে উভয়ের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। দুই বৎসরের পর এই

সাক্ষাৎ। দুই বৎসর সময়-সাগরে বিম্ব-মাত্র; বিম্ব হইলেও দাগ রাখিয়া গিয়াছে। গদাধরের আর সে শ্রী নাই, লাবণ্য নাই—সব শুকাইয়া গিয়াছে। গদাধর দেখিল, কালাচাঁদের লাবণ্য যেন উছলিয়া উঠিতেছে—কালাচাঁদ যেন সুখ ও সমৃদ্ধিতে, তেজ ও শক্তিতে ফাটিয়া পড়িতেছে। গদাধর কিছু না বলিয়া পথ অতিক্রম করিবার উদ্যোগ করিল। কালাচাঁদ নড়িল না; ডাকিল, "গদাধর!"

গদাধর কি ভাবিতেছিল; সে চমকিয়া উঠিয়া কালাচাঁদের মুখপানে চাহিল। কালাচাঁদ রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "গদাধর, ব্রজবালা কোথায়?"

গদাধর উত্তর না করিয়া বিস্ময়-চকিত নয়নে কালাচাঁদের পানে চাহিয়া রহিল। কালাচাঁদ বলিল, "গদাধর শঠতা ছাড়—সত্য কথা বল।"

গদাধর। কি বলিব?

কালা। ব্রজবালা কোথায়?

গদা। তাহা তুমি ভাল জান।

কালা। আবার শঠতা।

গদা। গদাধর শঠতা জানে না—মিথ্যা জানে না; গদাধর চিরদিন নির্ভীক, সত্যবাদী।

কালা। দুই বৎসর পূর্ব্বে বনরাজিবেষ্টিত প্রান্তরের মধ্যে দাঁড়াইয়া মিথ্যা বল নাই?

গদা। না।

কালা। আজ বলিতেছ না?

গদা। না।

কালা। ধর্ম্মসাক্ষী?

গদা। হাঁ।

কালা। তুমি ধর্ম্মদ্রোহী মিথ্যাবাদী।

গদা। যে নিজে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক, সে জগৎকে অসত্যময় দেখে।

কালা। তুমি যদি সে দিন সত্য বলিয়া থাক, তবে আজ মিথ্যা বলিতেছ।

গদা। তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে।

কালা। সাবধান গদাধর, আগুন লয়ে খেলা কর না।

গদা। এ ভয় শিশুকে দেখাও গে—এখন পথ ছাড়।

কালাচাঁদ একটু ইতস্ততঃ করিয়া পথ ছাড়িল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে তোমার অনুচরের মধ্যেও মারিতে পারিতাম।"

কথা কয়টা একজন বৃদ্ধ সৈনিকের কাণে গেল। সে বাল্য কাল হইতে সাঁতোড়-রাজের চাক্‌রি করিয়া আসিতেছে। আজ রাজকুমারকে অপমানিত হইতে দেখিয়া সে আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিল না,— ধনুক উঠাইয়া শরযোজনা করিল। কালাচাঁদ তখনও নিকটে, বেশী দূর যাইতে পারে নাই। বৃদ্ধ সৈনিক অশ্বদেহ লক্ষ্য করিয়া শরত্যাগ করিল। কালাচাঁদ অচিরে অশ্বসহ ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িল।

শব্দে চমকিত হইয়া গদাধর পিছন ফিরিয়া দেখিল। দেখিল, ধূলিধূসরিত কালাচাঁদ উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে মৃতপ্রায় অশ্ব সান্নিধ্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; বৃদ্ধ সৈনিক দ্বিতীয় শর ধনুকে যোজনা করিয়া কালাচাঁদের ললাট লক্ষ্য করিতেছে। গদাধর তদ্দৃষ্টে চীৎকার করিয়া উঠিল। সৈনিক পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল; গদাধর সেই অবকাশে ছুটিয়া আসিয়া শরমুখে দাঁড়াইল। সৈনিক বিস্মিত ও ক্ষুব্ধচিত্তে ধনুক নামাইল।

তখন গদাধর অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া বৃদ্ধ সৈনিককে বলিলেন, "আমার ঘোড়া কালাচাঁদকে দিয়া এস।"

সৈনিক দ্বিরুক্তি করিল না—সসম্মানে প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিল। কালাচাঁদ্ অশ্ব গ্রহণ করিল, কিন্তু সহসা তাহাতে উঠিল না,—বিস্মিত নয়নে গদাধরের পানে চাহিয়া রহিল। গদাধর সে দিকে লক্ষ্য করিলেন না; মৃদুকণ্ঠে শুধু বলিলেন, "যাও, ব্রজবালার স্বামী, নির্ব্বিঘ্নে যাও—কুশাঙ্কুরও যেন তোমার চরণে বিদ্ধ না হয়।"

গদাধর যখন অদৃশ্য হইল, তখন কালাচাঁদ নিঃশব্দে অশ্বারোহণ করিল। গদাধর যে পথে গিয়াছিল, সেই পথ পানে পুনরায় চাহিল। তা'র পর নিজের গন্তব্য পথ ছাড়িয়া গৌড়ের পথ ধরিল। কালাচাঁদ জীবনে আর দেশে ফিরিল না।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

গদাধর পথের মাঝে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিল। তখন কালাচাঁদ অদৃশ্য হইয়াছে। অনেকক্ষণ চিন্তার পর গদাধর যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে ফিরিল—বীরজাওন আর গেল না।

গদাধর স্থির করিয়াছিল, ব্রজবালা স্বামীর সহিত কলহ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া আসিয়াছে—রাধামোহন তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। গদাধর ভাবিল, "তা' কালাচাঁদ আমাকে ব্রজবালার কথা জিজ্ঞাসা করে কেন? আমি ব্রজবালার কে? আমাকে হয়ত এতদিন সে বিস্মৃত হয়েছে।"

ফিরিয়া সাঁতোড়ে পঁহুছিতে মধ্যাহ্ন অতীত হইল। সাঁতোড় একটী ক্ষুদ্র নগর—ক্ষুদ্র রাজ্যের ক্ষুদ্র রাজধানী। নগরের উপকণ্ঠে একটা বিস্তীর্ণ পুষ্পোদ্যান। সেই ফুলময় উদ্যানের মধ্যে—নক্ষত্র বিভূষিত আকাশ মধ্যে চন্দ্রমা-তুল্য—শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্রকায় হর্ম্ম্য। ক্ষুদ্র হইলেও এমন সৌন্দর্য্যময় গৃহ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। সাঁতোড়-রাজ নানা দিগ্দেশ হইতে সুনিপুণ শিল্পী আনাইয়া এই গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; এবং সুন্দররূপে সাজাইয়া গৃহের নাম রাখিয়াছিলেন, "শ্বেতা"। এক্ষণে 'শ্বেতা' গদাধরের আবাস স্থল।

গদাধর বিবাহ করে নাই। বিবাহে সম্মতি করাইতে কেহ পারে নাই। কত কন্যাদায়গ্রস্ত অভিভাবক গদাধরকে ধরিয়াছিল; কত ইন্দুনিভাননা নানা দেশ হইতে আহৃত হইয়া গদাধরকে দেখান হইয়াছিল; কিন্তু গদাধর বিবাহ করিতে কিছুতেই প্রলুব্ধ হইল না। সংসারে কেমন যেন সে নিস্পৃহ; সকল কার্য্যেই তার অনাসক্তি। খেলা ধূলা, মল্লক্রীড়া কিছুই আর ভাল লাগে না। এমন কি গদাধর বিষয় কর্ম্মও বড় একটা দেখে না। তবে মাতা পিতার মনস্তুষ্টির জন্য কতকটা দেখা শুনা করিতে হইত। সকল সময়েই সে নিশ্চেষ্ট ভাবে শ্বেতার পুষ্পোদ্যান মধ্যে বসিয়া থাকিত।

গদাধর সাঁতোড়ে ফিরিয়া আসিয়া শরীর-রক্ষীদের বিদায় দিল; এবং কাহারও সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া একাকী শ্বেতায় আসিল। শ্বেতার চারিদিকে উদ্যান—উদ্যানময় ফুল—ফুলে ফুলে ভ্রমর। গদাধর কাহারও পানে ফিরিয়া চাহিল না,—অসীম চিন্তার ভারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে এক নিভৃত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

ঘরটি অতি সুন্দর। মাথার উপর কাঠ বা লোহা নাই—শুধু একখানা প্রকাণ্ড সাদা পাথর বিছান রহিয়াছে। সেই পাথরের গায়

কত সোণার পাতা, কত প্রবালের ফল। প্রাচীর গাত্রে কত বড় বড় গাছ লেখা রহিয়াছে। কোনও গাছের ছায়ায় বসিয়া শ্রান্ত পথিক বিশ্রাম লইতেছে—কোন তরুশাখাতলে বসিয়া কৃষক রমণী তাহার ক্ষুধার্ত্ত স্বামীকে ভোজন করাইতেছে। এক দিকের প্রাচীরে একটি ক্ষুদ্র তটিনী অঙ্কিত রহিয়াছে। সাদা পাথরের গায় নীল শিলা বসাইয়া জল দেখান হইয়াছে। তটিনী আঁকিয়া বাঁকিয়া গ্রাম, প্রান্তর, বন অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। গ্রাম, ক্ষুদ্র কুটীর নিচয়ে পরিপূর্ণ—প্রান্তর, শস্য-শষ্প-সমাচ্ছন্ন—বন, নক্ষত্র-প্রদীপ্ত নীলাকাশ তুল্য কুসুম প্রফুল্ল। বনের ধারে কৃষ্ণকায় সাওতাল বালিকারা নগ্নদেহে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে; কেহ ফুল তুলিয়া কেশে পরিতেছে, কেহ বা গরু মহিষকে জল খাওয়াইতেছে। গ্রামের নীচে নদীর তটে কুলবধূরা দীপ হস্তে দাঁড়াইয়া অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যপানে চাহিয়া রহিয়াছে। সূর্য্য তখনও সম্পূর্ণ ডুবে নাই,—আধখানা জলের ভিতর ডুবিয়া গিয়াছে, আধখানা জলের উপর জাগিয়া রহিয়াছে ও কে যেন সেই নীল জলের উপর সিন্দূররাশি ঢালিয়া দিয়াছে—জল জ্বলিতেছে—বধূরা হাসিতেছে—মাথার উপর পাখীরা ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

কোন স্থানে দশাবতারের চিত্র—কোন স্থানে দশমহাবিদ্যার চিত্র। কোথাও শুভ্রশেখর বনরাজি-বেষ্টিত হিমালয়—গিরি উপত্যকায় যোগীন্দ্র-ভূষণ মহাদেব ধ্যানমগ্ন—দূরে মন্মথ ফুলধনু আকর্ষণ করিতেছেন— ইন্দ্র-চন্দ্র দেবাদি শূন্যপথে উদ্বিগ্নচিত্তে দণ্ডায়মান। আবার কোন প্রাচীরে বাল্মীকি-আশ্রম অঙ্কিত রহিয়াছে। ভয়চকিতা রোরুদ্যমানা সীতাদেবীকে নিবিড় অরণ্য মধ্যে বিসর্জ্জন দিয়া রামানুজ লক্ষ্মণ কিরূপে একটু অগ্রসর হইতেছেন, আবার অশ্রু মোচন করিয়া কিরূপে ফিরিয়া দেখিতেছেন, তাহা বিশেষ কৌশলসহকারে চিত্রে দেখান হইয়াছে।

এইরূপ কত চিত্র প্রাচীর-গাত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে। গদাধর কোনও চিত্রপানে ফিরিয়া দেখিল না। ধীরে ধীরে আসিয়া একখানা প্রস্তরাসনের উপর উপবেশন করিল। দণ্ডের পর দণ্ড অতিবাহিত হইল, গদাধর উঠিল না। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। ভৃত্য আসিয়া কক্ষে দীপ জ্বালিয়া দিয়া গেল। তখন গদাধরের চমক ভাঙ্গিল।

উঠিয়া গদাধর একটা পেটিকা খুলিল। তন্মধ্যে গজদন্ত-নির্ম্মিত একটা ক্ষুদ্র কৌটা ছিল। গদাধর সেই কৌটা মধ্য হইতে তিনখানি পত্র বাহির করিল। পত্রগুলি একে একে পড়িল। শেষ পত্রে লেখা ছিল,—"যতদিন না তস্কর কর্ত্তৃক রত্ন অপহৃত হইবে, ততদিন কি নিশ্চেষ্ট ও নীরব থাকিবে? আমি যে তোমারই প্রতীক্ষায় দেহ মন লইয়া বসিয়া আছি, গদাধর! তোমার ব্রজসুন্দরী।"

গদাধর পত্রখানি বারম্বার পাঠ করিলেন। অবশেষে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া বাতায়ন-পথে নিক্ষেপ করিলেন।

---

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

কে এ সঙ্গীত গাহিল? কে এ গীত গাহিতে গাহিতে দিগ্‌দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ছুটিয়া গেল? কে অনন্ত হইতে এ শব্দ-তরঙ্গ তুলিয়া অনন্তে লুকাইল? আমার মনোমধ্যে যে কথা লুকান ছিল, সে কথা কে প্রতিধ্বনিত করিল? কে 'চোক গেল', 'চোক গেল' বলিতে বলিতে—প্রাণের ব্যথা গাহিতে গাহিতে জগৎ চমকিত করিয়া অনন্ত আকাশে ছুটিয়া পলাইল? কে তুমি রূপের জ্বালায় চক্ষু হারাইয়া অনন্তকাল ব্যাপিয়া অবিশ্রান্ত ছুটিয়া বেড়াইতেছ?

যে রূপ দেখিয়া তুমি চক্ষু হারাইয়াছ, সে রূপ কখন কি নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছ, পাখী? যদি তাহা দেখিতে পাইতে তাহা হইলে তুমি ছুটিয়া পলাইতে পারিতে না;—সে রূপের আগুনে পুড়িয়া মরিতে। বুঝি সে অনলে পুড়িয়া মরিবার আশায় আকাশময় তাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছ?

আমি তাহাকে খুঁজিতে পাইলাম না—আমার প্রাণের ব্যথা জানাইতে পারিলাম না। যদি তোমার ওই অনন্ত আকাশ, বা কোন প্রাণীশূন্য, শব্দশূন্য প্রদেশে ছুটিয়া বেড়াইতে পাই, তাহা হইলে প্রাণের সাধ মিটাইয়া বারেক তাহাকে খুঁজিয়া দেখি। আর যদি তোমার ওই জগৎ-মাতান গলাখানি পাই—আর তোমার ওই নির্লজ্জতা পাই, তাহা হইলে আমার প্রাণের লুকান ব্যথা একবার বিশ্বময় গাহিয়া বেড়াই।

মাথার উপর পাখী ডাকিয়া গেল; গদাধর উদ্যানমধ্যে প্রস্তরাসনের উপর বসিয়া তা' শুনিল। তখন প্রাতঃকাল, সদ্য অরুণোদয় হইয়াছে। আকাশময় পাখী, উদ্যানময় ফুল। গদাধর সুদূর আকাশ পানে চাহিয়া কত কি ভাবিতেছিল। এমন সময় একটা পাখী 'চোখ গেল' 'চোখ গেল' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে উল্কাবৎ ছুটিয়া পলাইল। গদাধর সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া পাখী পানে চাহিয়া দেখিল। পাখী মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইল। বিহঙ্গম যে মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল, গদাধর সেই মহাশূন্য পানে চাহিয়া নীরবে একাকী বসিয়া রহিল।

ক্ষণকাল পরে গদাধর সহসা দেখিল, একটি মনুষ্য-ছায়া তাহার আসন পার্শ্বে আসিয়া স্থির হইল। গদাধর ফিরিয়া দেখিল। দেখিল, একজন অপরিচিত ব্যক্তি, একখানি পত্র হাতে লইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। গদাধর পত্রখানি লইয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে লেখা ছিল,—"যদি তোমার ব্রজসুন্দরীকে আজও স্মরণ থাকে, তাহা হইলে এই পত্র-বাহকের অনুগমন করিবে।"

গদাধর স্তম্ভিত হইলেন। ব্রজবালার পত্র! এতকাল পরে আবার! পাঁচ ছয়বার পত্রটুকু পাঠ করিলেন। ছোট চিঠিখানা বারম্বার পড়িয়া বড় করিয়া লইলেন। তবু তাঁহার তৃপ্তি হইল না; যে এ পত্রখানা আনিয়াছিল, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। নয়ন ফিরাইয়া পুনরায় পত্র পাঠ করিলেন। তা'রপর স্পন্দিত হৃদয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পত্র-বাহককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমায় পাঠিয়েছেন?"

পত্রবাহক। আকাশের দেবী।

গদাধর। তিনি কোথায় আছেন?

পত্রবাহক। পাহাড়ে।

গদাধর। আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পার্‌বে?

পত্রবাহক। পার্‌ব।

গদাধর। তোমার সঙ্গে ঘোড়া আছে?

পত্রবাহক। না।

গদাধর তখন অশ্বশালা হইতে দুইটী ঘোড়া লইলেন; এবং উভয়ে তদুপরি আরোহণ করিয়া পর্ব্বত সানুদেশে সত্বর উপস্থিত হইলেন। পর্ব্বত তত বড় নয়, এবং নগর হইতে তত বেশী দূরেও অবস্থিত নয়। পর্ব্বত-তলে উপস্থিত হইয়া গদাধর অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন; এবং পথ-প্রদর্শকের সাহায্যে স্বল্পকালমধ্যে এক নিভৃত প্রদেশে উপস্থিত হইলেন, পথপ্রদর্শক তথা হইতে বিদায় লইল। গদাধর দেখিলেন, পর্ব্বত-পৃষ্ঠে কোথাও জনমানব নেই। তিনি দাঁড়াইয়া একটু ভাবিলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল, কেন তিনি পরপত্নী ব্রজবালার আহ্বানে আসিলেন? ব্রজবালা তাঁর কে? কেহ নয়। তবে ইহাও হইতে পারে ব্রজবালা হয়ত কোন বিপদে পড়িয়া তাঁহাকে ডাকিয়াছে; ব্রজবালা হয়ত পথ হারাইয়া বীরজাওনের পথ খুঁজিতেছে। কিন্তু কই ব্রজবালা?

গদাধর আর একটু উঠিয়া চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, একটু ঊর্দ্ধে, বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া শিলাতলে আকাশের দেবী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। দুইখানি চরণ, দুইখানি শিলার উপর; বাম বাহু কোমল তরু দেহোপরি বিন্যস্ত। বৃক্ষপল্লব দেহের স্থানে স্থানে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—পুষ্পিত কদম্বশাখা মাথার উপর ছত্র ধরিয়াছে। গদাধর তাঁহার বাল্যসহচরী ব্রজবালাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, এক্ষণে দেখিলেন, দেবী-প্রতিমা। জন্মান্ধ সহসা চক্ষু পাইয়া নবোদিত সূর্য্যের প্রতি যেমন চাহিয়া থাকে, গদাধর তেমনই স্পন্দহীন নয়নে বিমুগ্ধচিত্তে ব্রজ-বালার পানে চাহিয়া রহিলেন। গদাধর দেখিলেন, তাঁহার মানসাঙ্কিত

চিত্রের চেয়ে এ ব্রজবালা কত সুন্দর! কিশোরী ব্রজবালার চেয়ে নবযৌবনা ব্রজবালা কত উজ্জ্বল!

ব্রজবালা ডাকিল, "কুমার!"

গদাধর চমকিয়া উঠিলেন,—সঙ্গীতঝঙ্কারে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। ব্রজবালা বলিল, "কুমার চিনিতে পার?"

গদাধরের দেহ একটু কাঁপিয়া উঠিল। তারপর তিনি স্থির হইয়া বলিলেন,—"ব্রজ—"

ব্রজবালা। ডাক, ডাক, আবার তেমনই করে ব্রজসুন্দরী বলে ডাক।

গদাধরের বুকের রক্ত সহসা থামিয়া গেল; তাঁহার মনে হইল, এ কা'র সঙ্গে বাক্যালাপ করছি! এ ত আমার সে ব্রজসুন্দরী নয়! আমার ব্রজ অনেক দিন মরে গেছে—এ ত কালাচাঁদের ব্রজবালা।

ব্রজবালা শিলার উপর হইতে নামিয়া আসিল। গদাধর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কেন ডেকেছ, ব্রজবালা?"

ব্রজবালা। না না, আমি ব্রজবালা নই, আমি তোমার ব্রজসুন্দরী।

গদাধর। ছি ছি!

ব্রজবালা আর একটু অগ্রসর হইল। গদাধর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি পথ হারিয়েছ? বীরজাওনে যেতে চাও?"

ব্রজবালা। না, না—সেখানে আর নয়।

গদাধর। তবে পিত্রালয়ে?

ব্রজবালা ভ্রূকুটি করিল; বলিল, "আমি তোমার কাছে এসেছি, কুমার!"

গদাধর কাঁপিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "আমার কাছে!"

"হাঁ, তোমার কাছে। আশ্রয় দিতে তুমি কি কাতর?"

গদাধর শিলার উপর বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে তুফান

উঠিল। অবশেষে বলিলেন, "ব্রজবালা, গৃহে ফিরে যাও—এখনও সময় আছে।"

ব্রজবালা। যে গৃহ ত্যাগ করেছি, সে গৃহে আর ফিরব না।

গদাধর। কেন গৃহত্যাগ করলে ব্রজবালা!—গৃহ যে মন্দির।

ব্রজ। কেন গৃহত্যাগ করলুম, শুনবে? কেন মাতাপিতা, স্বামী, আত্মীয়স্বজন, লজ্জা, ধর্ম্ম, কুল, মান ত্যাগ করলুম শুনতে চাও? কুমার, আমি তোমার—

গদা। না, আমি শুনতে চাইনে—তুমি গৃহে ফিরে যাও।

ব্রজ। বলেছি ত গৃহে আর ফিরব না; আশ্রয় না দেও, পথে পথে বেড়াব।

গদা। তোমায় এমন অধঃপতিত দেখ্‌ব কখন তা ভাবিনি, ব্রজবালা! আমি যে অনেক উচ্চে সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করে তোমার প্রতিমা পূজা করতুম। তুমি কেন সে সিংহাসন ভাঙ্‌লে, কেন সে প্রতিমা চূর্ণবিচূর্ণ করলে?

ব্রজ। তুমিও আমায় ঘৃণাভরে উপেক্ষা করলে? বেশ। কিন্তু স্মরণ রাখিও, গদাধর, আমি পাপ করে থাকি, সে তোমার জন্য—অধর্ম্মাচরণ করে থাকি, সেও তোমার জন্য। আমি চলিলাম—জীবনে আবার দেখা হবে—

বলিতে বলিতে ব্রজবালা দ্রুতপদে পর্ব্বত অবতরণ করিল এবং স্বল্প-কাল মধ্যে অদৃশ্য হইল।

গদাধর সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং ব্রজবালার দিকে হস্ত প্রসারণ করিলেন। ব্রজবালা তখন অদৃশ্য হইয়াছে। গদাধর চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "ব্রজবালা—ব্রজসুন্দরি!"

কোথায় ব্রজবালা? গদাধর হতাশ ভাবে শিলাপৃষ্ঠে বসিয়া পড়িলেন।

# রাণী-ব্রজসুন্দরী

## দ্বিতীয় খণ্ড

অপ্

(প্রেম)

কালাচাঁদ ও দুলারী

# প্রথম পরিচ্ছেদ

তখন বাঙ্গালার মসনদে সলিমন সা কররাণী অধিষ্ঠিত, সলিমন বীর-পুরুষ—বাঙ্গালার রাজ্য বাহুবলে অধিকার করিয়াছিলেন, যখন বাহাদুর সা ও জালালউদ্দীন ধরাধাম ত্যাগ করিল, তখন সলিমন সা শ্যেনপক্ষীর ন্যায় বাঙ্গালার উপর পড়িলেন; এবং মসনদে বসিয়া দিল্লীর বাদসাহের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। সলিমন আগন্তুক ও বিদেশী হইলেও ন্যায়-পরায়ণ ও প্রজারঞ্জক ছিলেন।

রাজধানী তখন গৌড়ে। আদিশূরের গৌড়ে নয়—বল্লালসেনের গৌড়ে নয়—মুসলমানের গৌড়ে। এত বড় সমৃদ্ধিশালী নগরী ভারতে তৎকালে ছিল না। লক্ষ্মণাবতী ভাঙ্গিয়া—স্বর্ণপ্রসূ বাঙ্গালার রত্নরাজি লুঠিয়া মুসলমান এই গৌড় গড়িয়াছিল; একদিনে নয়—তিন শত বৎসরে। সেই গৌড় আজ—সেই গর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত গৌড় আজ বসুধা-হৃদয়ে মুখ লুকাইয়াছে।

আজ মুখ লুকাউক, কিন্তু একদিন গৌড় গর্ব্বস্ফীত হৃদয়ে দুর্গচূড়ে অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকা উড়াইয়া মহানগরী দিল্লীকেও উপহাস করিত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় মোগল দিল্লী গড়িতেছে মাত্র,—তখনও শক্তি ও যশঃ মণ্ডিত হয় নাই। যে, দিল্লী আগ্রা সাজাইয়াছিল ভারতে মোগলরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, সে তখন বইরাম খাঁর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিন্নভিন্ন রাজ্য গ্রথিত করিতেছে মাত্র। ভারতবর্ষে তখন চারিদিকে আগুন জ্বলিয়াছে। সে আগুনের ভিতরেও উড়িষ্যা, কোচ-

বিহার, আসাম, কামরূপ হিন্দু স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। মুসলমান সহস্র চেষ্টা করিয়াও তথায় ইসলাম-বৈজয়ন্ত উড়াইতে পারে নাই। যাহা বখ্তিয়ার খিলিজি বা সের সা পারে নাই, তাহা আর কে পারিবে? কিন্তু একজন পারিয়াছিল। যে পারিয়াছিল, সে তখন বাঙ্গালায় জন্ম লইয়াছে।

সলিমন সা প্রত্যহ দরবার-গৃহে রত্নমণ্ডিত সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। রাজকার্য্যে তাহার ঔদাস্য ছিল না। একদা প্রাতঃকালে তিনি সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময় একজন প্রার্থী আসিয়া তাঁহার সিংহাসন-নিম্নে দাঁড়াইল। প্রার্থী বাঙ্গালী—তরুণবয়স্ক—সুদর্শন। তাহার পরিধানে মূল্যবান্ পরিচ্ছদ, কটিতে রত্নমণ্ডিত বহুমূল্য তরবারি। কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সিংহাসন-নিম্নে উপবিষ্ট ছিলেন। তথা হইতে পেশকার উঠিয়া প্রার্থীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও?"

প্রার্থী উত্তর করিল, "তোমার কাছে কোন প্রার্থনা নাই।"

পেশকার। তবে কার কাছে তোমার প্রার্থনা?

প্রার্থী। বঙ্গের অধীশ্বর সুলতানের কাছে।

পেশ। একই কথা। প্রার্থনা কিছু থাকে নিবেদন কর—আমি বঙ্গেশ্বরের কাছে পেশ করিব।

প্রার্থী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া সুলতানের পানে চাহিয়া বলিল, "সুলতান, আমার প্রার্থনা আছে।"

সুলতান দেখিলেন, প্রার্থী বলিষ্ঠ, নির্ভীক ও তেজস্বী। তাঁহার মন আকৃষ্ট হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রার্থনা কি? বিচার চাও?"

প্রার্থী। না।

সুল। জায়গীর চাও?

প্রার্থী। না—আমি কর্ম্মপ্রার্থী।

সুল। কর্ম্ম? পেশকারের পদ চাও?

প্রার্থী। না।

সুল। মন্ত্রীপদ?

প্রার্থী। না; আমি সামান্য সৈনিকের পদ প্রার্থনা করি।

সুল। তরবারি ধরিতে জান?

প্রার্থী। জানি।

সুল। পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছ?

প্রার্থী। শস্ত্রবিদ্যায় আমায় পরীক্ষা করিতে পারে, এমন লোক বাঙ্গালায় দেখি না।

সুলতান একটু হাসিলেন। তিনি নিজে একজন মস্ত যোদ্ধা। সম্রাট আদিল সাকেও একদিন তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিতে হইয়াছিল। এবম্বিধ যোদ্ধার সম্মুখে যুবকের স্পর্দ্ধা বাতুলতা মাত্র। সুলতান তাই একটু হাসিলেন; দেখাদেখি সভাসদেরাও হাসিল। সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

প্রার্থী। কালাচাঁদ রায়।

সুল। পিতা কে?

প্রার্থী। নয়ানচাঁদ রায়।

সুল। কোন্ নয়ানচাঁদ?

প্রার্থী। যে নয়ানচাঁদ, মোগল-সেনাপতি জাহাঙ্গীর কুলি বেগকে তাড়াইয়া গৌড়ের দ্বার সম্রাট সের সার জন্য উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন।

সুল। বুঝিয়াছি; তুমি ফৌজদার নয়ানচাঁদের পুত্র। যে বংশে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ, কালাচাঁদ, সে বংশের সম্মান রক্ষা করা কর্ত্তব্য। তোমাকে আমি তোমার পিতার পদ প্রদান করিলাম; তুমি গৌড়-

নগরীর ফৌজদার পদে নিযুক্ত হইলে। ভরসা আছে, তুমি তোমার পিতার নাম কলঙ্কিত করিবে না।

কালাচাঁদ তরবারি ঝটিতি কোষমুক্ত করিয়া ললাটে তিনবার স্পর্শ করাইল; এবং তাহা উন্মুক্ত অবস্থায় সিংহাসন-পদতলে রক্ষা করিয়া সসম্মানে বলিল, "বাদসাহের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।"

সুলতানের আদেশে উজির উঠিয়া আসিয়া কালাচাঁদকে তরবারি প্রত্যর্পণ করিলেন। কালাচাঁদ পুনরায় মস্তক নমিত করিয়া অভিবাদন করিলেন।

ফৌজদারের পদ মহাসম্মানিত। পূর্ব্বে সেন রাজাদের সময়ে নগর-পাল যে কার্য্য করিত, মুসলমান রাজত্বকালে ফৌজদার সেই কার্য্য সম্পন্ন করিত। নগর-রক্ষার ও দোষী ব্যক্তির বিচারের ভার তাহার উপর। রাজধানীর সমস্ত সৈন্য ও প্রহরী তাহার অধীন। তবে দুর্গের উপর তাহার কোন কর্ত্তৃত্ব ছিল না।

কালাচাঁদ এই মহাগৌরবান্বিত ফৌজদারের পদ পাইয়া কৃতার্থ হইল; এবং পরওয়ানা ও দণ্ড লইয়া মহাহৃষ্টান্তঃকরণে প্রস্থান করিল।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফৌজদারের বাসের জন্য একটা অট্টালিকা নির্দ্দিষ্ট ছিল। কালাচাঁদ তথায় আসিয়া উঠিলেন। অট্টালিকাটি রাজপ্রাসাদের সন্নিকট। প্রাসাদের পিছনে, কিয়দ্দূরে—মহানন্দা। কালাচাঁদ মুসলমানের নক্‌রি গ্রহণ করিলেও হিন্দুয়ানী ছাড়িল না। প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া মহানন্দায় স্নান করিতে যাইত; স্নানান্তে ললাট মৃত্তিকা চর্চ্চিত করিয়া বিষ্ণুস্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে গৃহে ফিরিত। তৎকালে পূজাহ্নিকের বড় বেশী সময় পাইত না—তাড়াতাড়ি কাছারি যাইতে হইত।

তখন প্রাতে চারি দণ্ডের সময় কাছারি বসিত, এবং মধ্যাহ্নে ভাঙ্গিত। প্রথাটা ভাল কি না জানি না, তবে স্বাস্থ্যকর বটে। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আহারান্তে পরিশ্রম করাটা ঠিক নয়। আহারের পর শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ পরিশ্রমই নিষিদ্ধ। আমাদের প্রধান আহার মধ্যাহ্নকালে—শীতপ্রধান দেশস্থ জাতির প্রধান আহার সন্ধ্যার পর। আমরা মধ্যাহ্নভোজনের পর কার্য্যে ব্রতী হই—ইংরাজ প্রভৃতি জাতিরা সায়াহ্ন ভোজনের পর আমোদ প্রমোদে রত হ'ন। ফল এই দাঁড়াইতেছে, আমরা অম্লপিত্ত রোগ আহ্বান করিয়া লইতেছি, আর ইংরাজেরা স্বাস্থ্য ও শক্তির আশ্রয়স্থল হইতেছেন।

প্রথাটা ভাল হউক, বা মন্দ হউক, হিন্দু রাজাদের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছিল; মুসলমানেরা তাহার কোনও ব্যতিক্রম করে নাই।

অতএব কালাচাঁদকে রজনীপ্রভাতে স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া কাছারি যাইতে হইত। মধ্যাহ্নে ফিরিয়া আসিয়া কালাচাঁদ পুনরায় স্নান করিত। কেননা, ম্লেচ্ছ সংস্পর্শে আসিত বলিয়া সে আপনাকে অপবিত্র জ্ঞান করিত। কালাচাঁদ শুদ্ধাচারী দশকর্ম্মান্বিত পরম বৈষ্ণব। হবিষ্যান্ন তাহার সচরাচর আহার ছিল—বিষ্ণু-পূজা ও পুরাণ-পাঠ তাহার নিত্য-কর্ম্ম ছিল।

তখনকার দিনে হিন্দুরা যে বেশে কাছারি যাইত, এখন সে বেশ লোপ পাইয়া আসিতেছে। ধুতি হিন্দুরা বহু প্রাচীন কাল হইতে পরিয়া আসিতেছে। তবে দেশ বিদেশে প্রকার ভেদ। মুসলমানের আমলে হিন্দুরা ধুতির উপর চোগা চাপকান চড়াইত—মাথায় পাগ্‌ড়ি লাগাইত। ইংরাজ আমলে অনেক হিন্দু ধুতি ফেলিয়া পায়জামা পরিল; আর সব প্রায় ঠিক রহিল, তবে সে পাগ্‌ড়ি অবস্থান্তরিত হইল।

কালাচাঁদ চোগা চাপকান পরিত বটে, কিন্তু সেই চোগার উপরে কোমরে তরবারি বাঁধিত; পাগ্‌ড়ি ফেলিয়া মাথায় উষ্ণীষ চড়াইত। চরণে একপ্রকার নাক-উঠান বিচিত্র পাদুকা। আবার পাদুকার উপরিভাগ স্থানে স্থানে কাটা; সম্ভবতঃ বাতাস প্রবেশের পথ রাখা হইত। কালাচাঁদ এইরূপ বেশভূষা করিয়া প্রত্যহ কাছারি যাইত।

একদিন কালাচাঁদ মধ্যাহ্নকালে কাছারি হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, একটী বালক তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। কালাচাঁদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা হ'তে আস্‌ছ?"

বালক উত্তর করিল, "বীরজাওন হ'তে।"

বীরজাওনের নাম শুনিয়া কালাচাঁদ একটু অন্যমনস্ক হইল। মাকে মনে পড়িল—পাপিষ্ঠা ব্রজবালার কথাও স্মরণপথে উদয় হইল; কিন্তু অভাগিনী ভূপবালার কথা একবারও মনে আসিল না। কালাচাঁদ

বালককে নিজের শয়নকক্ষে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা—মা কি তোমায় পাঠিয়েছেন ?"

"হাঁ।"

"কেন ?"

"আপনি কি আর দেশে ফিরিবেন না ?"

"না—জীবনে না।"

এবার বালক একটু অন্যমনস্ক হইল। কালাচাঁদ সেই অবসরে তাহাকে উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তোমায় পূর্ব্বে কখন দেখেছি বলে মনে হয় না ; তোমার বাড়ী কি বীরজাওনে ?"

বালক উত্তর করিল, "না, এখান হ'তে অনেক দূরে আমার বাড়ী ; কিছুদিন পূর্ব্বে বীরজাওনে আমি এসেছি।"

কালাচাঁদ পোষাক পরিচ্ছদ খুলিতে লাগিল। বালক বলিল, "তবে মাকে—মা ঠাকুরুণকে কেন এইখানে আনুন না ?"

কালা। এখানে ? অসম্ভব।

বালক। অসম্ভব কেন ?

কালা। মুসলমানের ভয়ে হিন্দুরা এখানে পরিবার ল'য়ে বাস করে না।

বালক। ফৌজদারেরও কি সে ভয় আছে ?

কালা। সম্পূর্ণ আছে ; প্রতি মুহূর্ত্তে আমি পদচ্যুত ও নিগৃহীত হ'তে পারি।

বালক। তবে আমাকে এখানে থাক্‌তে হবে।

কালা। কেন ?

বালক। মা ঠাকুরুণের এইরূপ আদেশ আছে।

কালা। আমার কাছে থেকে কি কর্‌বে ?

বালক। আপনার সেবা যত্ন করব।

কালা। কেন অকারণ দেশ ছেড়ে আমার কাছে পড়ে থাকবে?

বালক। ভৃত্যের দেশ বিদেশ সব সমান।

কালা। তুমি কি জাত?

বালক। ব্রাহ্মণ।

কালা। রাঁধতে পার?

বালক। পারি।

কালা। বেশ। আমি একটি ব্রাহ্মণ-ভৃত্য খুঁজিতেছিলাম; মধ্যাহ্নে আসিয়া স্বহস্তে আর রাঁধিয়া উঠিতে পারি না। তোমার নাম কি বালক?

বালক। নাম? লোকে বুনা বলিয়া ডাকে।

কালা। বনবিহারী বুঝি নাম ছিল?

বালক। হবে।

কালা। বেশ, বুনা, তুমি আমার কাছে থাক।

---

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বুনাকে পাইয়া কালাচাঁদের অনেক কষ্টের লাঘব হইল। মধ্যাহ্নে কাছারি হইতে ফিরিয়া কালাচাঁদ দেখিত, নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত রহিয়াছে। শুধু রন্ধন করিয়াই বুনা ক্ষান্ত থাকিত না,—বুনা মধ্যাহ্ন পূজার ফল ও গঙ্গাজল স্বয়ং আহরণ করিয়া রাখিত—কালাচাঁদের পোষাক পরিচ্ছদাদি যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিত। প্রভাতে কালাচাঁদ নিজে ফুল আহরণ করিতেন ও নদীতে স্নান করিয়া কূলে বসিয়া পূজা সমাপন করিতেন। বুনা, কালাচাঁদের শয়ন-কক্ষ মার্জ্জনা করিত—যত্নের সহিত শয্যা রচনা করিত—স্বহস্তে তাম্বূল প্রস্তুত করিয়া শয্যার উপর রাখিয়া দিত; কালাচাঁদের যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, বুনা তাহা স্বহস্তে সযত্নে সম্পন্ন করিত। কালাচাঁদ যতক্ষণ গৃহে থাকিতেন, বুনা ততক্ষণ ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। সন্ধ্যার পর কালাচাঁদ যখন পুরাণ পাঠ করিতে বসিতেন, তখন বুনা অদূরে ভূপৃষ্ঠে বসিয়া পুরাণ শুনিত। কালাচাঁদ শয়ন করিলে তবে সে কালাচাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আহারাদি করিতে যাইত।

কালাচাঁদ অচিরে বুনার গুণে মুগ্ধ হইলেন। বুনার প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন খাইয়া তৃপ্তি—বুনার পরিচর্য্যায় তৃপ্তি—বুনাকে পুরাণ শুনাইয়া তৃপ্তি। বুনা যে কাজটা না করিত, কালাচাঁদের সে কাজটা ভাল লাগিত না—বুনা পুরাণ শুনিতে না আসিলে কালাচাঁদ পুরাণ খুলিয়া বসিয়া থাকিতেন—বুনা আহারান্তে পদসেবা না করিলে কালাচাঁদের নিদ্রাকর্ষণ হইত না—

বুনা সঙ্গে সঙ্গে না ঘুরিলে কালাচাঁদের কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিত। অল্পদিনের মধ্যে কালাচাঁদ বুনার গুণে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন।

একদিন কালাচাঁদ, বুনাকে বলিল, "তোমাকে পেয়ে আমি বড় সুখে আছি; আমায় ছেড়ে কোথাও যেও না, বুনা।"

বুনা উত্তর করিল না; মুখখানা একটু ফিরাইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কালাচাঁদ বলিল, "আমি বড় স্বার্থপর; না বুনা? তোমার আত্মীয়স্বজন কোথায় পড়ে রইল, আর আমি তোমাকে এখানে ধরে রাখ্‌লাম।"

বুনা মুখ নত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "গুরুজনের নিকট শুনেছি, যিনি অন্নদাতা, তিনিই শ্রেষ্ঠ আত্মীয়।"

কালাচাঁদ। তোমার অন্নের অভাব কি বুনা? বাদশাও তোমার মত ভৃত্য পাইলে কৃতার্থ হ'ন।

বুনা অধোবদনে নিরুত্তর রহিল। কালাচাঁদ বলিল, "তোমাকে ভৃত্য বলা উচিত হয় না; তুমি আমার আত্মীয়। বুনা আমার ভাই নাই, ভগ্নী নাই—জগতে মা ছাড়া আমার আর কেহ নাই। আজ এই বিদেশে তোমাকে পেয়ে আমি সকল দুঃখ ভুলেছি।"

বুনা আর বসিল না,—উঠিয়া কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিল।

একদিন কালাচাঁদ, বুনাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বুনা, ঘোড়ায় চড়্‌তে পার?"

"না।"

"অস্ত্র ধর্‌তে?"

"না।"

"আমি তোমায় শিখাব।"

কালাচাঁদ বুনাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অস্ত্রবিশারদ গুরুর

শিক্ষকতায় বুনা কয়েক মাসের মধ্যেই অশ্বারোহণে ও শস্ত্রচালনায় নৈপুণ্যতা লাভ করিল।

বুনা আর একটা জিনিষও শিখিল, সেটা লেখা পড়া। বুনা এক এক দিন দেখিত, কালাচাঁদ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া পুরাণপাঠ বন্ধ রাখিতেন। কালাচাঁদের পাঠেচ্ছা থাকিলেও আর পারিয়া উঠিতেন না। কেহ যদি পড়িয়া শুনায় তাহা হইলে কালাচাঁদ শুনিতে পারেন। বুনার বাসনা হইল, পুরাণ পড়িয়া কালাচাঁদকে শুনাইবে, তাই বুনা গোপনে রাত্রি জাগিয়া লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিল। ফৌজদারের একজন বৃদ্ধ হিন্দু কর্ম্মচারী একটু একটু করিয়া সাহায্য করিত। বুনা ছয় মাসের মধ্যে অনেকটা আয়ত্ত করিয়া একদিন পুরাণ খুলিয়া দেখিল। দেখিল, পুরাণপাঠ তত কঠিন নয়। দুই চারি দিন গোপনে অভ্যাস করিল; পরে একদিন সাহস করিয়া কালাচাঁদের সম্মুখে পুঁথি খুলিল। সে দিন কালাচাঁদ বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; পড়িতে আরম্ভ করিয়া কালাচাঁদ পুঁথি বন্ধ করিলেন। বুনা বলিল, "আর পড়্‌বেন না?"

কালাচাঁদ। না, আজ আর পারছি না। তুমি যদি পড়্‌তে জান্‌তে!

বুনা। তা' হলে কি আপনি সুখী হ'তেন?

কালা। বড় সুখী হ'তাম, বুনা!

বুনা। তবে পুঁথি দিন, আমি পড়্‌ছি।

কালা। তুমি ত পড়্‌তে জান না।

বুনা। কিছু কিছু শিখেছি।

কালা। শিখেছ? আমি ত কোন দিন তোমায় পড়্‌তে দেখিনি।

বুনা উত্তর না করিয়া অধোবদনে নীরব রহিল। কালাচাঁদ বলিলেন, "পড় দেখি।"

বুনা পুঁথি খুলিল। সে যে পড়িতে পারিবে, কালাচাঁদের তাহা কোন

মতে প্রত্যয় হইতেছিল না। বুনা পারিলও না,—কেমন সব গোল হইয়া যাইতে লাগিল। বুনা যত পরিষ্কার কণ্ঠে তাড়াতাড়ি পড়িবার চেষ্টা করে ততই তাহার কণ্ঠ বন্ধ হইয়া আসে—পাঠেও ততই ভুল হয়। বুনার কান্না আসিল; অবশেষে বুনা পুঁথি বন্ধ করিয়া স্ফীতবক্ষে প্রস্থান করিল।

---

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুলতানের মহিষীকে আমাদের আপাততঃ কোন প্রয়োজন নাই কিন্তু তাঁহার কন্যাকে আমাদের সবিশেষ প্রয়োজন। কেননা, তিনি যুবতী ও সুন্দরী। সৌন্দর্য্যময়ী যুবতী না হইলে উপন্যাসের অঙ্গ সাজিবে কেন? এখন যদি আমরা বৃদ্ধা সুলতান মহিষীকে আসরে টানিয়া আনি, তাহা হইলে অনেকেই হয়ত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া এইখানেই পুস্তক পাঠ বন্ধ করিবেন। সেরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার যাহাতে সংঘটিত না হয়, আমাদের সে বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য, অতএব বৃদ্ধাকে ছাড়িয়া যুবতীর অবতারণা করিলাম।

সুলতান-তনয়াকে ইতিহাস যে নাম দিয়াছে, আমরাও তাঁহাকে সেই নাম দিলাম। নামটিও ভাল, দুলারী বিবি। দুলারী অবিবাহিতা।

দুলারী সপ্তদশবর্ষীয়া বিকশিতযৌবনা—ক্ষীণাঙ্গী—কমলিনীলাঞ্ছিত দুগ্ধালক্তকবরণা; দুলারী নীলাম্বুবিলোলনয়না—শশহীনশশাঙ্কবদনা। দুলারী সুন্দরীশ্রেষ্ঠ—পরমাসুন্দরী।

প্রাসাদমধ্যে দুলারীর স্বতন্ত্র মহল। এই মহলে সহসা একদিন সন্ধ্যাকালে একটা গোল উঠিল। দুলারী তখন তাঁহার মহল-সংলগ্ন উদ্যানে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। সঙ্গে দুইজন দাসী বা সহচরী ছিল। একজনের নাম চন্দনা, অপরার নাম ময়না। দুলারী বিবি তাহাদের এই-রূপ নামকরণ করিয়াছিলেন। উভয়েই শিক্ষিতা ও সম্ভ্রান্তবংশীয়া। চন্দনা বলিতেছিল, "নবাব-পুত্রি, বিবাহ কি কখন করবে না?"

দুলারী বিবি উত্তর করিলেন, "কি জন্যে? দাসী হবার জন্যে?"

চন্দনা। বিবাহ করলেই কি দাসী হ'তে হয়? হিন্দুরা ত তা' বলে না।

দুলারী। সে চাষাদের কথা ছেড়ে দাও। তা'দের পুরুষগুলো সহধর্ম্মিণী খোঁজে, আর মাগীগুলো স্বামী স্বামী, দেবতা দেবতা করে অস্থির। তা'দের সঙ্গে আমার তুলনা!

চন্দনা। তুমি কি স্বামী খোঁজ না?

দুলারী। না; আমি সাহাজাদি—নবাবপুত্রী—আমি ভৃত্য খুঁজি।

এমন সময় সেই পুরুষের অগম্য স্থানে একজন রূপবান্ যুবক লতা-কুঞ্জান্তরাল হইতে নির্গত হইয়া বলিল, "সাহাজাদি, ভৃত্য উপস্থিত।"

দুলারী সাতিশয় বিস্মিত হইয়া তীক্ষ্ননয়নে যুবককে নিরীক্ষণ করিলেন। দেখিলেন, যুবকের পরিচ্ছদ যাবনিক। যুবক রূপবান্—তরুণবয়স্ক। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

যুবক। সাহাজাদীর বান্দা; তদ্ব্যতীত আমার অন্য পরিচয় আপাততঃ নাই।

দুলারী। কেন এখানে মরিতে আসিলে?

যুবক। সাহাজাদীর রূপ-বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে আসিয়াছি, মরিতে পাইব না কি?

দুলারী। নিরাশ হইতে হইবে না—সে ব্যবস্থা এখনই করিতেছি।

বলিয়া তিনি ময়নাকে ইঙ্গিত করিলেন। প্রহরী ডাকিতে সে চলিয়া গেল।

তখনও পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় নাই। সূর্য্য ক্ষণপূর্ব্বে নিবিয়া গিয়াছে; কিন্তু সন্ধ্যার ললাটে চাঁদ তখনও দীপ জ্বালে নাই। স্বর্গ-বালারা তখনও নীলাম্বুসলিলে দীপ ভাসায় নাই। তখনও মল্লিকা ফুটে নাই—কোকিল বা পাপিয়া তখনও নিবৃত্ত হয় নাই;—পাখীর গান তখনও বসন্তানিলে ভাসিয়া মল্লিকাকে জাগাইতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আকাশের তখনও প্রভাত—পৃথিবীর তখন সন্ধ্যা। একের আশা—অপরের স্মৃতি। একের জন্ম—অপরের সমাধি। কিন্তু নির্ব্বাণ কোথাও নাই।

যুবক, আকাশ বা পৃথিবী কিছুই দেখিল না—শুধু দুলারীকে দেখিল। নয়ন ভরিয়া দেখিয়া অবশেষে বলিল,—"সাহাজাদি, দূর হইতে—বহুদূর হইতে তোমার রূপের কথা শুনিয়াছিলাম। তাই জীবনকে বিপন্ন করিয়াও তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। দেখিলাম, তুমি অতি সুন্দর। নবাব-পুত্রি, আমার জীবন যৌবন গ্রহণ করিবে কি?"

দুলারী উত্তর দিবার পূর্ব্বে চন্দনা বলিল, "উভয়ই অচিরে গৃহীত হইবে—ব্যস্ত হইও না।"

তাতারী প্রহরীর পদশব্দ শ্রুত হইল। যুবক সকলই বুঝিল। বলিল, "সাহাজাদি, অপরাধ ক'রে থাকি, তুমি শাস্তি দেও।"

দুলারী উত্তর না করিয়া প্রস্থানোদ্যতা হইলেন। যুবক বলিল, "আমাকে জল্লাদের হাতে দিতেছ! এ কি নবাব-পুত্রীর উপযুক্ত কাজ? যে ভালবাসে তা'কে কখন কাঁদাইও না,—প্রাণে মারিও না। তুমিও হয়ত একদিন কাহাকেও ভালবাসিবে—"

দুলারী বলিলেন, "ভালবাস্‌তে হয় তোমার মত কুকুর বাচ্ছাকে নয়।" যুবকের মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে আর কিছু বলিল না; প্রহরীর

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতে কালাচাঁদ বিচারে বসিয়াছেন। তখনকার দিনে বিচারকার্য্য বড় অদ্ভুত প্রণালীতে হইত, আইন-কানুন বড় একটা ছিল না। বিচারকের বিবেচনা ও অভিরুচির উপর অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বাধীনতা নির্ভর করিত। সময় সময় পদস্থ ব্যক্তি বা মোল্লারা আসিয়া বিচারককে অনুরোধ উপরোধ করিতেন। বিচারককে সময় সময় বাধ্য হইয়া নির্দ্দোষকে দণ্ড দিতে হইত ও দোষীকে ছাড়িয়া দিতে হইত। কিন্তু কালাচাঁদ এই সকল প্রচলিত নিয়মাদি লঙ্ঘন করিয়া নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর নির্ভর করতঃ অপরাধীর বিচার করিতেন। তদ্ধেতু তাঁহাকে অনেকের অপ্রিয় হইতে হইয়াছিল। আজিকার ঘটনা দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

একজন হিন্দু-যুবক আজ প্রাতে অভিযুক্ত হইয়া কালাচাঁদের বিচারালয়ে আনীত হইয়াছে। অপরাধ আম-চুরি। অভিযোক্তা একজন পাঠান-আমির। তিনি স্বয়ং বিচারগৃহে উপস্থিত। তাঁহাকে কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আসামীকে চিনেন?"

আমির। হাঁ—না—চিনি না।

কালা। কোথায় আম ছিল?

আমির। আমার বাগানে—গাছে।

কালা। চুরি কর্‌তে কে দেখেছে?

আমির। আমি ও আমার সাক্ষী।

কালা। আপনার সাক্ষী কই?

আমির। আসামী ভাঙ্গিয়ে নিয়েছে; হতভাগার পয়সার জোর খুব।

কালা। আসামী ধনী?

আমির। একজন বড় সওদাগর।

কালা। কি করে জান্‌লেন?

আমির। অনেকদিন হ'তে আমি ওকে চিনি; আমার সঙ্গে দেনা-পাওনা আছে।

কালা। কবে কোন্ সময়ে আম পেড়েছে?

আমির। কাল—রাত্রি ২টার সময়।

কালা। আপনি তখন কোথায় ছিলেন?

আমির। আমার ঘরে।

কালা। কি করে দেখলেন?

আমির। ফুট্‌ফুটে চাঁদ্‌নি রাত—

কালা। কাল তৃতীয়া গেছে—চাঁদ ছয় দণ্ড মাত্র ছিল—

আমির। আপনি কিছু জানেন না; আমি স্বচক্ষে দেখিছি—ফুট্‌-ফুটে চাঁদনি রাত—আসামী গাছে উঠে আম পাড়্‌ছে—

কালা। আপনি মিথ্যা কথা বল্‌ছেন—আসামী খালাস।

আমির। (সক্রোধে) কি আমি মিথ্যাবাদী!

এমন সময় নবাবের বখ্‌সি আসিয়া বলিল, "আমি দেখিছি, আসামী গাছে উঠে আম পাড়্‌ছে—উজির সাহেবও দেখে থাক্‌বেন; তিনি বলে

পাঠালেন, আসামীকে যেন শূলে দেওয়া হয়। লোকটা ভয়ানক চোর—

কালা। আপনাদের কথায় বিশ্বাস করিলাম না।

আমির ও বথ্সি মহা ক্রুদ্ধ হইয়া বেগে প্রস্থান করিলেন।

এমন সময় দুইজন তাতারী প্রহরী, অপরিচিত মুসলমান যুবককে লইয়া বিচার-গৃহে প্রবেশ করিল। কালাচাঁদ, যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?"

"তোমার বন্দী।"

"তদ্ব্যতীত অন্য কোন পরিচয় নাই ?"

"থাকিতে পারে, কিন্তু বলিতে বাধ্য নই।"

ফৌজদার কালাচাঁদ মুস্কিলে পড়িলেন। বন্দীর চক্ষু ও ললাট দেখিলে তাঁহাকে সামান্য ব্যক্তি বলিয়া মনে হয় না। সামান্য হইলে বন্দী পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইত না। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বন্দীকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নিবাস এ দেশে বলিয়া অনুমান হয় না ; কোথায় থাক ?"

বন্দী। আপাততঃ ফৌজদারের বিচারালয়ে।

কালা। তৎপূর্ব্বে ?

বন্দী। নবাবকন্যার উদ্যানে।

কালা। অপরাধ স্বীকার করিতেছ ?

বন্দী উত্তর না দিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিল। ফৌজদার বলিলেন, "বুঝিলাম, তুমি সহজে পরিচয় দিবে না।"

বন্দী। পরিচয়ের প্রয়োজন কি ?

কালা। বিশেষ প্রয়োজন আছে। চাষার ছেলের প্রতি একরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়া থাকে, আর আমির ওমরাহের ছেলে হইলে—

বন্দী। এরূপ অবস্থায় চাষার ছেলের প্রতি কিরূপ দণ্ডাদেশ হইয়া থাকে?

কালা। সামান্য শাস্তি,—যথা বেত্রাঘাত।

বন্দী। আর আমির ওমরাহের ছেলে হইলে?

কালা। মৃত্যুদণ্ড।

বন্দী। উত্তম। আমাকে কি বলিয়া মনে হয়?

কালা। আমির ওমরাহের ছেলে।

বন্দী। কিসে সেটা অনুমান হয়?

কালা। তোমার নির্ভীকতা, তোমার তেজ, তোমার চক্ষু, তোমার ললাট ব্যক্ত করিতেছে, তুমি সামান্য ব্যক্তি নও।

বন্দী। আমার পরিচ্ছদ দেখিয়া কি অনুমান হয়?

কালা। তুমি ছদ্মবেশী।

বন্দী। বেশ—তবে মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থা হউক।

কালা। কিন্তু তোমার তরুণ বয়স দেখিয়া দয়ার উদ্রেক হয়, চাপল্য-বশতঃ যদি কিছু করিয়া থাক—

বন্দী। আমি দয়াপ্রার্থী নই, ফৌজদার সাহেব!

এমন সময় ময়না বিচার-গৃহে আসিয়া দর্শন দিল। কালাচাঁদ পূর্ব্বে কখন তাহাকে দেখেন নাই; জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

ময়না অভিবাদন না করিয়া একটু তেজের সহিত বলিল, "আমি নবাবপুত্রীর বাঁদী।

কালা। এখানে কেন?

ময়না। বিবিসাহেবা পাঠিয়েছেন।

কালা। তোমার সাক্ষ্যের প্রয়োজন নাই—বন্দী অপরাধ স্বীকার করিয়াছে।

ময়না। আমি সাক্ষ্য দিতে আসিনি।

কালা। তবে কি জন্যে এসেছ?

ময়না। সাহাজাদীর আদেশ শুনাতে এসেছি।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ফৌজদার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আদেশ! কি আদেশ?"

ময়না। তিনি আদেশ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি চোরের ন্যায় তাঁহার উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অপমান করিয়াছে, সে ব্যক্তি যেন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

ফৌজদারের বদন আরক্তিম হইল।

বন্দী ময়নাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "নবাবপুত্রীকে বলিবে যে, তাঁহার রূপে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলাম। তখন জানিতাম না, তাঁহার হৃদয় এত কুৎসিত। যে কুৎসিত, তাঁহার প্রতি আর আমি অনুরক্ত নই।"

ফৌজদার। বন্দি!

বন্দী। কি তিরস্কার করিবে ফৌজদার সাহেব? তোমার প্রভু-কন্যাকে কুৎসিত বলিয়াছি, এই আমার অপরাধ? উত্তম, শাস্তি দাও—দণ্ড গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু মানুষে আর আমায় কি শাস্তি দিবে? দেওতা দেখিতে আসিয়া ডাইনি দেখিলাম—বিচারকের কাছে আসিয়া ধর্ম্মাধিকরণে জল্লাদ দেখিলাম। শাস্তি দাও—সামান্য অপরাধে মৃত্যু-দণ্ড দাও।

কথা কয়টা ফৌজদারের কাণে গেল কিনা জানি না। কিন্তু তাঁহার বদন তখনও আরক্তিম, ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত, অধরৌষ্ঠ বিযুক্ত। তিনি তীব্রদৃষ্টিতে ময়নার পানে চাহিয়া বলিলেন, "নবাবপুত্রীকে বলিবে, আমি বন্দীকে আপাততঃ কোনও শাস্তি দিতে পারিলাম না। যতদিন না

তাহার পরিচয় পাই, ততদিন সে আমার অতিথিস্বরূপ আমার গৃহে অবস্থান করিবে; কারাগৃহেও তাহাকে পাঠাইতে পারিব না। এখন যাও।"

ময়না সাতিশয় বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইল; বলিল, "উত্তম—নবাবপুত্রীকে শুনাইব, তুমি কিরূপে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছ।"

ফৌজদার রোষপরবশ হইয়া বলিলেন, "তাঁহাকে আরও শুনাইও যে, ফৌজদার রমণীর ভৃত্য নহে।"

ময়না কি উত্তর দিতে যাইতেছিল; কিন্তু ফৌজদারের গম্ভীর ভাব দেখিয়া কিছু বলিতে সাহস পাইল না। যাইবার সময় শুধু বলিয়া গেল, "সাবধান ফৌজদার সাহেব, অচিরে আগুন জ্বলিবে।"

ফৌজদার বন্দীর পানে ফিরিয়া বলিলেন, "যুবক, তুমি আমার গৃহে অতিথিরূপে অবস্থান করিতে প্রস্তুত আছ?"

বন্দী উত্তর করিল, "ফৌজদার সাহেব, হিন্দুকে এ যাবৎ কখন আমি শ্রদ্ধা করি নাই। হিন্দু কত বড় হইতে পারে, তুমি আজ তাহা দেখাইলে। আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি, তোমার অনুমতি ব্যতীত তোমার গৃহের বাহিরে যাইব না।"

---

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ময়নার নিকট সকল কথা শুনিয়া নবাবপুত্রী ক্রোধে গর্জ্জিতে লাগিলেন। কিন্তু সহসা কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিন দিনের মধ্যে নবাবের দর্শন মিলিল না। তথন দুলারী পিতাকে পত্র লিখিয়া সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন। নবাব, প্রিয়তমা কন্যার আহ্বানে সত্বর আসিয়া দর্শন দিলেন। নবাব-পুত্রী বলিলেন, "পিতা, তোমার কন্যার অন্তঃপুরে যদি কোনও অপরিচিত যুবক বিনানুমতিতে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহাকে কি শাস্তি দাও?"

"মৃত্যুদণ্ড।"

"যদি কেহ তোমার কন্যাকে অপমানিত করে, তাহা হইলে তাহাকে কিরূপে দণ্ডিত কর?"

"যে দণ্ড আমার কন্যা প্রার্থনা করে।"

"উত্তম। একজন বিদেশী যুবক আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে; তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কর। আর যে ব্যক্তি তাহাকে আশ্রয় দিয়ে আমাকে অবমানিত করেছে, তাহাকে অচিরে পদচ্যুত কর।"

"সে ব্যক্তি কে?"

"ফৌজদার।"

নবাব চমকিত হইলেন। তাঁহার প্রিয় ফৌজদার এমন কাজ করিবে? তা' হইতেও পারে। কাফের হিন্দুর অসাধ্য কিছুই নাই;

তা' ছাড়া ফৌজদারের বিরুদ্ধে অনেক আমির ওমরাহ আজকাল অভিযোগ করিতেছেন। এমন কি বখ্‌সি, পেশকার, সেরেস্তাদার প্রভৃতি অনেকেই ফৌজদারের পদচ্যুতি প্রার্থনা করিয়া নবাবের নিকট দরবার করিয়াছেন। তবু নবাব ভাবিলেন, "অপরাধী আর কেহ হ'ল না কেন?"

দুলারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতার অভিপ্রায় কি?"

নবাব বলিলেন, "ফৌজদার কে জান?"

দুলারী। জানি—সে একজন কাফের।

নবাব। কাফের বলিলে তাহার অমর্য্যাদা করা হয়; যে বংশে নবাবেরা বিবাহ করিতে এ যাবৎ সঙ্কোচ বোধ করেন নাই, ফৌজদার কালাচাঁদ সেই বংশের অলঙ্কার-স্বরূপ।

দুলারী। সে কি বংশমর্য্যাদায় নবাবজাদীর চেয়েও বড়?

নবাব। না, তা' নয়।

দুলারী। তবে যে ভৃত্য, প্রভুকন্যার অবমাননা করে, তা'কে দূর কর।

নবাব। আমি এখনই ফৌজদারকে ডাকাইতেছি।

বলিয়া নবাব প্রস্থান করিলেন; এবং ফৌজদারকে ডাকিতে পাঠাইয়া একটি ক্ষুদ্র কক্ষমধ্যে উপবেশন করিলেন। ফৌজদার প্রাসাদেই ছিল, অচিরে আসিয়া অভিবাদন করিল। নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোনও ব্যক্তি নবাবজাদীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিল কি?"

ফৌজদার। অন্তঃপুরে নয়—উদ্যানে প্রবেশ করেছিল।

নবাব। একই কথা।

ফৌজ। একই কথা নয়; বিদেশী অজ্ঞানতাবশতঃ উদ্যানে প্রবেশ করতে পারে।

নবাব। যাক্—তা'কে কি শাস্তি দিয়েছ?

ফৌজ। তাহার বিচার স্থগিত আছে।

নবাব। কেন?

ফৌজ। তাহার পরিচয় অভাবে।

নবাব। পরিচয়ের প্রয়োজন? অপরাধী সকল অবস্থাতেই অপরাধী।

ফৌজ। তা' ঠিক নয়, সুলতান! একটা চাষার ছেলেকে বেত্রাঘাত করিতে পারি, কিন্তু নবাবজাদার গায়ে হাত তুলিতে পারি না। খোদা যাহাদের বড় করিয়াছেন, তাহারা চিরদিন বড় থাকিবে। এক-জনের অবমাননা করিয়া সম্প্রদায়ের অবমাননা করিতে পারি না।

নবাব। তুমি কি মনে কর, এ ব্যক্তি কোনও ছদ্মবেশী নবাবজাদা?

ফৌজ। আমার বিশ্বাস তাই।

নবাব, ফৌজদারকে তিরস্কার করিবার আর কোনও পথ পাইলেন না; বরং তাহার নির্ভীক ও যুক্তিসঙ্গত উত্তরে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। নবাব, কালাচাঁদকে বিদায় দিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় ঈষন্মুক্ত দ্বার-পথে দুইটি নীলোৎপলসদৃশ চক্ষু দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন, দুলারী আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়াছে। তখন তিনি মুখ ফিরাইয়া কালাচাঁদকে বলিলেন, "তুমি নাকি সে ব্যক্তিকে নিজের গৃহে আশ্রয় দিয়েছ?"

ফৌজ। দিয়েছি।

নবাব। অন্যায় কাম করেছ।

ফৌজ। অন্যায়? একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবককে দস্যুতস্করের সাহচর্য্যে বাস করতে কারাগারে না পাঠিয়ে অন্যায় কাজ করেছি?

নবাব। যদি সে পলায়?

ফৌজ। তখন তাহার পরিবর্ত্তে আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করবেন।

নবাব আঁর কি বলিবেন ?—নিরুত্তর রহিলেন। ফৌজদার জিজ্ঞাসা করিলেন, "নবাবের আর কোনও আদেশ আছে কি ?"

নবাব দ্বার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। বিস্মিতনয়নে দেখিলেন, দ্বার তখন ঈষন্মুক্ত নয়—অর্দ্ধমুক্ত; দুলারীর শুধু নয়ন দুইটি দৃষ্ট হইতেছিল না—সমস্ত দেহ দৃষ্ট হইতেছিল। ভাবিলেন, দুলারী ক্রুদ্ধ হইয়াছে। তখন তিনি কৃত্রিম রোষসহকারে ফৌজদারকে বলিলেন, "যাহা হউক, আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছি। নবাবজাদীর ইচ্ছা, তোমাকে পদচ্যুত—"

ফৌজদার বাধা দিয়া বলিলেন, "উত্তম, আমি এখনি পদত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছি।"

নবাব। সহসা যেও না, আমি নবাবজাদীকে বুঝিয়ে দেখ্‌ব।

ফৌজদার। ক্ষমা কর্‌বেন জনাব! আমি স্ত্রীলোকের অধীনে নক্‌রি করতে আসিনি।

বলিয়া তিনি কক্ষত্যাগ করিলেন। নবাব ঈষৎ রুষ্ট হইলেন। রোষটা শুধু ফৌজদারের উপর নয়—দুলারী বিবির উপরও কিছু। নবাব উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় দুলারী আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। নবাব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি ?"

দুলারী পা না ছাড়িয়া উত্তর করিল, "বাবা, ফৌজদারকে ফিরাও—তাঁহাকে স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কর।"

নবাব বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি! তুমিই যে তাহার পদচ্যুতি প্রার্থনা করেছ!"

দুলারী। অন্যায় করেছি পিতা! ফৌজদার নিরপরাধ—দোষী আমি। আমায় ক্ষমা করুন—ফৌজদারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করুন।

নবাব। মরিতে চলিলাম, তবু নারী-চরিত্র বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। যাহা হউক তোমার বাসনামত কার্য্য করিব।

বলিয়া নবাব প্রস্থান করিলেন।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

কালাচাঁদের নক্‌রি ছাড়া হইল না,—নবাব তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন না। ছদ্মবেশী বন্দীরও বিচার হইল না—অতিথিস্বরূপ কালাচাঁদের অট্টালিকায় সে ব্যক্তি অবস্থান করিতে লাগিল।

একদা প্রভাতে কালাচাঁদ মহানন্দা-সলিলে অবগাহন স্নান করিয়া পদব্রজে গৃহে ফিরিতেছেন। পশ্চাতে দুইজন ভৃত্য কোষাকুষি, ফুলের সাজি প্রভৃতি লইয়া চলিয়াছে। কালাচাঁদের পরিধানে শুভ্র কৌশিক বস্ত্র, স্কন্ধোপরি হরিনামাবলী। ললাটে মৃত্তিকার ত্রিপুণ্ড্রক, বাহু চন্দন চর্চ্চিত, চম্পকনিন্দীবরণ দেহের উপর শুভ্র যজ্ঞোপবীত। অনির্ব্বচনীয় শোভা! কালাচাঁদের রূপ যেন উছলিয়া উঠিতেছিল।

কালাচাঁদ যে পথ বহিয়া যাইতেছিলেন, সে পথ প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানের পার্শ্ব দিয়া গিয়াছে। দুলারী বিবি সৌধ-চূড়ায় উঠিয়া উদয়োন্মুখ ভানু দেখিতেছিলেন। সহসা কালাচাঁদের চন্দ্রবৎ সুন্দর মূর্ত্তি দুলারীর নয়নে পড়িল। তখন তিনি ভানু ছাড়িয়া চাঁদকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার পার্শ্বে চন্দনা ও ময়না উভয়ই দণ্ডায়মান ছিল। ময়না কালাচাঁদকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "সাজাদি, এই সে কাফের।"

দুলারী ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া ঈষৎ তেজের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ কাফের, ময়না বিবি ?"

ময়না বিস্মিত হইয়া দুলারীর মুখ-প্রতি চাহিল। নবাবজাদীর ভাবটা ঠিক বুঝিল না ; বলিল, "যে তোমার অপমান করেছিল।"

দুলারী। আমার অপমান! কা'র সাধ্য বঙ্গেশ্বরের দুহিতাকে অপমান করে ?

ময়না। অপমান করবার চেষ্টা করেছিল।

দুলারী। তুমি ফৌজদারের কথা বলছ ? তিনিত কোনও দিন আমার অবমাননা করেন নি। তুমি ভুল বুঝেছ ; তিনি আপন কর্ত্তব্য প্রতিপালন করেছিলেন।

ময়না আরও বিস্মিত হইল। কিছু বলিল না ; তীক্ষ্নয়নে দুলারীর প্রতি চাহিয়া রহিল। দেখিল, নবাবজাদী স্পন্দহীন নয়নে কালাচাঁদকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। ফৌজদার তখনও নয়নান্তরাল হয়েন নাই—অস্তগমনোন্মুখ চন্দ্রের ন্যায় ধীরে ধীরে অপসৃত হইতেছেন।

সহসা ময়নার মনের অন্ধকারমধ্যে আলো ফুটিয়া উঠিল। সে বুঝিল, কেন নবাবজাদীর চক্ষে ফৌজদার আজ নিরপরাধ। তাহার ওষ্ঠ-প্রান্তে একটু হাসি ভাসিয়া গেল। কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না। ময়না মনোভাব গোপন করিয়া কালাচাঁদের প্রতি চাহিতে চাহিতে বলিল, "কাফেরগুলা কি কুৎসিত! উলঙ্গ গায়ে মুখে কতকগুলো মাটী লেপেছে —যেন চিতেবাঘের মত দেখ্‌তে হয়েছে।"

দুলারী রাগিয়া উঠিলেন ; কিন্তু কিছু বলিলেন না ; শুধু একবার তীক্ষ্নয়নে ময়নার প্রতি চাহিলেন। ময়না বুঝিল, নবাবজাদী তাহার প্রতি রোষান্বিত হইয়াছেন। তবু সে ছাড়িল না ; বলিল, "রাগই কর আর যাই কর, কথাটা কিন্তু ঠিক।"

চন্দনা বলিল, "ফৌজদারকে কুৎসিত বল্‌লে নবাবজাদী রাগ্‌বেন কেন?"

ময়না সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "শুধু কুৎসিত! ভিক্ষুক—গোলাম—অসভ্য বর্ব্বর—"

"ময়না!"

"কি নবাবজাদী?"

"তুমি মূর্খ।"

"এতদিনে জান্‌লে?"

"তুমি মিথ্যাবাদী।"

"নিশ্চয়ই।"

"তুমি নিন্দুক।"

"তা'তে আর সন্দেহ নেই।"

দুলারী সরিয়া আসিয়া ময়নার সম্মুখীন হইলেন। নবাবজাদীর মুখ একটু আরক্তিম; নবোদিত ভানুর ছটা আবার সেই মুখের উপর পড়িয়া মুখখানাকে আরও লাল করিয়াছে। কর্ণভূষা দোলাইয়া সুলতান-তনয়া একটু তেজের সহিত বলিলেন, "তুমি অসভ্য বর্ব্বর।"

"আর কি?"

"আর কি! শুনিতে চাও? তবে শুন—তুমি যাহাকে কুৎসিত বলিতেছ, তাহার মত রূপবান্ আমি সংসারে দেখি নাই; যাহাকে ভিক্ষুক গোলাম বলিতেছ, তাহার তুলনায় দিল্লীর সম্রাটও আমার নিকট তুচ্ছ। স্মরণ রাখিও বাঁদি! এই কাফের, এই ভিক্ষুক নবাবজাদীর খসম; সে ছাড়া নবাবজাদীর আর দ্বিতীয় খসম নাই।"

ময়না একটু হাসিল; বলিল, "এ মূর্খ ক্ষণপূর্ব্বে তা' বুঝেছে; কিন্তু তুমিও স্মরণ রেখো নবাবজাদি, এ সম্মিলন অসম্ভব।"

দুলারী। কেন অসম্ভব, ভবিষ্যদ্দর্শী?

ময়না। ফৌজদার তোমায় গ্রহণ করবে না।

দুলারী। আমায়—বঙ্গাধিপের একমাত্র দুহিতাকে গ্রহণ করবে না? যা'কে পা'বার জন্য দিল্লীশ্বর লালায়িত, তা'কে একজন দরিদ্র ফৌজদার গ্রহণ করবে না? তুমি বুদ্ধি হারিয়েছ।

ময়না। তোমার গর্ব্বই অন্তরায় হ'বে।

দুলারী। তাই বলে কি আমায় বিস্মৃত হ'তে হ'বে, আমি কে?

ময়না। বিস্মৃত হ'তে না পারলে ভালবাসতেও পারবে না, ফৌজদার কালাচাঁদকেও পাবে না।

দুলারী। হুকুম করলে ফৌজদার ছুটে এসে পদপ্রান্তে লুটাবে।

ময়না। আগে পায়ের কাছে আন, তারপর বলিও ময়না মিথ্যাবাদী।

আদরিণী কন্যা জননীর নিকট মনোভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। নবাব-মহিষী কন্যাকে অনেক বুঝাইলেন; বলিলেন, "শত শত সুলতান-পুত্র যাহার করুণা প্রার্থনা করে, সে একজন সামান্য বান্দার জন্য লালায়িত? ছি ছি, এ ঘৃণিত প্রস্তাব আর উত্থাপন করিও না। দিল্লীশ্বরের সহিত যাহাতে তোমার বিবাহ হয়, তাহার ব্যবস্থা আমি করিতেছি।"

কন্যা বলিলেন, "মা, ঐশ্বর্য্যে সুখ আছে বটে, কিন্তু ভালবাসায় যত সুখ, এত সুখ কিছুতেই নেই। আমি ঐশ্বর্য্য ছাড়্‌তে পারব না—কালাচাঁদকেও ছাড়্‌তে পারব না। তুমি যদি আমার আব্দার না রাখ, তবে কে আমার আব্দার রাখ্‌বে মা? আমি আর কা'র কাছে বল্‌ব, 'ওগো, আমার জীবন শ্মশান করো না—আমায় প্রাণে মেরো না'? তুমি ছাড়া আর আমার কে আছে মা, আমার চোখে জল দেখ্‌লে কাঁদবে, আমায় মরতে দেখ্‌লে মরবে?"

স্নেহময়ী জননীর প্রাণ গলিয়া গেল; তিনি স্নেহভরে কন্যাকে বুকে টানিয়া লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। দুলারী বুঝিলেন, জননীর আনুকূল্য সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। নবাবজাদী ভুল বুঝেন নাই। মহিষী মনে মনে স্থির করিলেন, "কন্যা যা'তে সুখী হয়, আমি তা' করব।"

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

তা'র পর কিছু দিন কাটিয়া গেল। নবাবকন্যা প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে ছাদের উপর আসেন; কালাচাঁদও প্রত্যহ পরিচারক সমভিব্যাহারে স্নান পূজার্থে নদীতীরে গমন করেন। দুলারী অতৃপ্তনয়নে কালাচাঁদকে দেখেন; কালাচাঁদ নিম্নতুণ্ডে সম্মুখস্থ পথ দেখেন। দুলারী, কালাচাঁদ ছাড়া আর কিছু দেখেন না; কালাচাঁদ বাহ্যেন্দ্রিয় নয়ন দ্বারা সম্মুখস্থ পথ ছাড়া আর কিছু দেখেন না।

একদিন দুলারী বিবি সবিস্ময়ে দেখিলেন, কালাচাঁদ যখন স্নান পূজা সমাপন করিয়া গৃহে ফিরিতেছেন, তখন উজির খাঁজাহান লোডী অভিবাদন করিয়া কালাচাঁদকে কি বলিলেন। কালাচাঁদ, প্রত্যুত্তর করা দূরে থাক্, উজিরের পানে ফিরিয়াও দেখিলেন না। তখন তিনি জগন্নাথস্তোত্র আবৃত্তি করিতেছিলেন,—

"দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকলজগতাং সিন্ধুসুতয়া
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

পরব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়দলোৎফুল্লনয়নো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোঽনন্তশিরসি।
রসানন্দো রাধাসরসবপুরালিঙ্গনসুখো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥
ন যাচেঽহং রাজ্যং ন চ কনকমাণিক্যবিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবধূং।
সদাকামং কাম্যং প্রমথপতিনোদ্গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥”

উজির উত্তর না পাইয়া পুনরায় কালাচাঁদকে কি বলিলেন। কালাচাঁদ ফিরিয়াও দেখিলেন না। উজির তখন নীরবে কালাচাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। উজির, ফৌজদারের অনেক উচ্চে অধিষ্ঠিত, তিনি ইচ্ছা করিলে কালাচাঁদকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে পারেন, সেই উজিরকে একজন ফৌজদারের হাতে এরূপভাবে লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়া দুলারী সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, ফৌজদারের কি তেজ!

উজির আসিয়াছিলেন, রাজাদেশ ফৌজদারের নিকট নিবেদন করিতে। তিনি ছাড়িলেন না, পশ্চাদনুসরণ করিয়া ফৌজদারের গৃহ পর্য্যন্ত গমন করিলেন। তথায় ক্ষণকাল অবস্থান করিয়া ফৌজদারকে রাজ-সন্নিধানে লইয়া চলিলেন।

সুলতানের জরুর আদেশ। কক্ষের পর কক্ষ অতিক্রম করিয়া ফৌজদার অবশেষে এক নিভৃত ক্ষুদ্র কক্ষমধ্যে উপনীত হইলেন। সেখানে একখানি কুসুমোপম কোমল গালিচার উপর সুলতান উপবিষ্ট ছিলেন। নবাবের আদেশে উজির কক্ষত্যাগ করিলেন। একজন খোজা

য়-সংবরণ করিতে পারিলেন না; গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কি পারবে না? সাহাজাদীর জন্যও পারবে না?"

কালা। না, জাঁহাপনা।

নবাব। তুমি মৃত্যু-বাঞ্ছা করেছ।

কালা। ভয় দেখাবার প্রয়োজন নেই, সুলতান, আমি মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি। যে আপনার প্রজা, ভৃত্য, তা'কে ভয় দেখাবার প্রয়োজন কি?

নবাব উত্তর না করিয়া ক্ষণকাল নীরব চিন্তা করিলেন। ভাবিয়া দেখিলেন, বিবাহের প্রস্তাব করিয়া ভাল করেন নাই। এক্ষণে পিছাইলে মানমর্য্যাদা থাকে না। কি একজন কাফের সাহজাদীকে প্রত্যাখ্যান করিবে? কখনই নয়। যখন প্রস্তাব করিয়াছি, তখন ফৌজদার হয় বিবাহ করিবে, নয় ঘাতকের হস্তে প্রাণ দিবে। নবাব চিন্তাসাগরে নিমজ্জিত হইলেন।

তিনি কি স্থির করিলেন জানিনা; কিন্তু ক্ষণকাল পরে মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর সাহাজাদী যদি হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন?"

কালা। তা'হলেও তাঁকে গ্রহণ করতে পারব না।

নবাব। কারণটা ফৌজদার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

কালা। যে রমণীকে আমি অভিলাষ করি না, তাঁহাকে আমি গ্রহণ করতে পারি না।

নবাব স্তম্ভিত হইলেন। এত বড় কথা তাঁহার মুখের উপর কেহ বলিতে পারিবে, তিনি কখন তা' ভাবেন নাই। নবাব দেখিলেন, কালাচাঁদ ভিতরের সকল কথাই বুঝিতে পারিয়াছে;—সে বুঝিয়াছে যে, সে দুলারী বিবির অভিলষিত এবং তাহারই বাসনানুসারে নবাব এ বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। বুঝিয়াই কালাচাঁদ ইঙ্গিতে

দুলারী বিবিকে উপযাচিকা বলিতেছে—উপযাচিকা বুঝিয়াই তাহাকে ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিতেছে। নবাবের গর্ব্ব চূর্ণ হইল, উন্নত ফণায় বেত্রাঘাত পড়িল। তিনি যেন একটু অধৈর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুন ফৌজদার, এক দিকে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ পদ, অপর দিকে মৃত্যুদণ্ড; কোন্‌টা বরণ করিতে ইচ্ছা কর?"

কালাচাঁদ। মৃত্যুদণ্ড—সহস্রবার মৃত্যুদণ্ড।

নবাব। ভাল, তাহাই হইবে। কিন্তু—কিন্তু এই কি তোমার শেষ কথা?

কালা। শুন নবাব, তোমার দাসত্ব করতে এসেছি, শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও তোমার কাজ করব। যাহা রাজা প্রজার নিকট, প্রভু ভৃত্যের নিকট, পিতা পুত্রের নিকট দাবী করতে পারে, তাই কর; তা'র বেশী অগ্রসর হও, তোমার তরবারি তোমাকে প্রত্যর্পণ করব। (তরবারি কোষমুক্ত করিয়া সুলতানের সম্মুখে রক্ষা করিলেন)। আমার দেহ তোমার, আমার জীবন তোমার; কিন্তু আমার মন্ত্র বা ধর্ম্মের উপর তোমার কোনও অধিকার নেই। বাঙ্গালার নবাব, এই আমার শেষ কথা।

নবাব। দুই সপ্তাহ তোমায় সময় দিলাম; দুই সপ্তাহ পরে তোমার শেষ কথা শুনিব। এখন তরবারি গ্রহণ কর।

কালা। না নবাব, তোমার দাসত্ব আর করব না।

বলিয়া কালাচাঁদ অভিবাদনান্তে প্রস্থান করিলেন। সুলতান যেখানে বসিয়াছিলেন, সেইখানেই বসিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহারই পরাজয় হইয়াছে।—"কিন্তু এ ব্যক্তির হস্তে যদি কন্যাকে অর্পণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে অযোগ্য পাত্রে কন্যা ন্যস্ত হইত না। কি তেজ! কি গর্ব্ব! এ ত মানুষ নয়—যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ! আমি যদি পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় মনুষ্য-চরিত্র কিছুমাত্র বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে

আমি শতবার বলিব, কালাচাঁদের ন্যায় তেজস্বী ও বিশ্বাসী কর্ম্মচারী আমার রাজ্যমধ্যে বিরল। কিন্তু হায়, তাহাকে পুরস্কৃত না করিয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইতেছে।"

# নবম পরিচ্ছেদ

"বুনা!"

"কি প্রভু?"

"আমার দোকানপাট উঠিল।"

"এখানকার?"

"এখানকার শুধু নয়—দুনিয়ার দোকানপাট উঠিল বুনা।"

বুনা এইবার কথাটা বুঝিল। সে জানিত, কালাচাঁদ রহস্য করিয়াও কখন মিথ্যা কথা বলিবেন না। তাহার বড় বড় চক্ষু দুইটি জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সে সেই নয়ন দুইটি কালাচাঁদের মুখের উপর স্থাপন করিয়া নীরব রহিল। কালাচাঁদ বলিলেন, "বুনা, আমার বিশ্বাস, তুমি আমার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী। এত বড় পৃথিবীতে তুমি ও মা ছাড়া আমার জন্য কেহ কাঁদিবে না। বুনা, নবাব আমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

বুনা শিহরিয়া উঠিল। প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "অপরাধ?"

কালাচাঁদ। অপরাধ গুরুতর। তিনি তাঁহার কন্যাকে আমার হস্তে

সমর্পণ করিতে সমৎসুক, আমি গ্রহণ করিতে অসম্মত। তিনি ধৃষ্টতার দণ্ডবিধান করিয়াছেন।

বুনা সহসা কোন উত্তর করিল না। কথাটা তলাইয়া বুঝিল। বুঝিয়া অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিল। তারপর নয়নদ্বয় অবনত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আপনি কেন সম্মত হ'লেন না?"

কালা। পারলুম না বুনা।

বুনা। শুনেছি আপনার দুই বিবাহ।

কালা। তাই ব'লে কি যবনী বিবাহ করব?

বুনা। সে যদি হিন্দু হয়?

কালা। হিন্দুসমাজ সম্ভবতঃ তা'কে গ্রহণ করবে না।

বুনা। আর যদি করে?

কালা। তা'হলেও পারব না।

বুনা। ক্ষমা করবেন,—কারণটা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

কালা। যে রমণী উপযাচিকা হয়ে আমায় বিবাহ করতে চায়, তা'কে আমি বিবাহ করতে পারি না,—তা' রাজ্যের জন্যে নয়—জীবন রক্ষার্থেও নয়।

বুনা নিরুত্তর রহিল। কথাটা নিতান্ত অন্যায় বলিয়া বুনার মনে হইল না। কিন্তু এখন ন্যায় অন্যায়ের দিকে চাহিলে চলিবে না—প্রভুর জীবন রক্ষা করিতে হইবে। তার উপায় কি? বুনা চিন্তাসাগরে নিমজ্জিত হইল।

কালাচাঁদ তখন দুইখানা পত্র লিখিতে বসিলেন। একখানা মাকে লিখিলেন, অপরখানা গদাধরকে লিখিলেন। শেষোক্ত পত্রে লিখিলেন,—"ভাই গদাধর, আমার ভ্রম ঘুচেছে—আমাকে ক্ষমা কর। জীবনে সম্ভবতঃ আর সাক্ষাৎ ঘটবে না—আমি পৃথিবী ছেড়ে চল্‌লাম। আমার স্থান

নিয়ে মাকে মা বলে ডেকো, আর—যদি পার—অভাগিনী ভূপবালাকে দেখো।"

পত্র দুইখানা শেষ করিয়া একজন বাহকের দ্বারা তাহা পাঠাইয়া দিলেন। বুনা শুনিল, কোথায় পত্র যাইতেছে। সে একটু চমৎকৃত হইল। এমন সময় সহসা সিঁড়িতে পাদুকাধ্বনি হইল। বুনা বিস্মিত হইয়া কালাচাঁদের মুখপানে চাহিল। অট্টালিকার দ্বিতলে কাহারও আসিবার অধিকার নাই। যদি কেহ হুকুম লইয়া আসে, সে ব্যক্তি পাদুকা পরিয়া আসিতে সাহস পায় না। বুনা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং দুই এক পা অগ্রসর হইতে না হইতেই সম্মুখে দেখিল, একটি রূপযৌবনোৎফুল্লা যবনী চঞ্চল চরণে আসিতেছে। বুনা পূর্ব্বে এ রমণীকে দেখে নাই। বিস্মিত হইয়া একটু পিছাইয়া দাঁড়াইল। যবনী তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কালাচাঁদকে বলিল, "আদাব ফৌজদার সাহেব, মেজাজ সরিফ?"

কালাচাঁদ যবনীকে চিনিলেন। এই সে বাঁদী ময়না—কালাচাঁদের নিকট ঔদ্ধত্য হেতু একদিন তিরস্কৃত হইয়াছিল। কালাচাঁদ, ময়নাকে দেখিয়া বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "কি জন্যে এখানে এসেছ?"

"এ কি ফৌজদার সাহেব, আপনার কোমরে তরওয়াল নেই কেন?"

"আমি নক্‌রিতে ইস্তফা দিয়েছি।"

"কেন?"

"সে কথা তোমার শুন্‌বার দরকার নেই।"

ময়না ঘা খাইয়াও দমিল না। সে বলিল, "আমি এখনি সাহ্জাদীর নিকট চল্‌লাম। আমি তাঁকে বল্‌ব, আপনার নক্‌রি ছুটেছে; তিনি আজই আপনাকে মন্ত্রী ক'রে দেবেন।"

কালাচাঁদ উত্তর করিলেন, "তাহা হইলে ইহাও তাঁহাকে জানাইও যে, কালাচাঁদ কাহারও কৃপাপ্রার্থী নয়।"

ময়না কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহা না বলিয়া মুখ ফিরাইয়া কণ্ঠের একটু শব্দ করিল; অবশেষে বলিল, "আমার সে সব কথায় প্রয়োজন নেই। সুলতানা যা' বল্‌তে বলেছেন, আমি তাই বলি। তিনি শুনেছেন, আপনি প্রত্যহ পূজাহ্নিক করেন। শুনে আপনার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা বেড়েছে। বেগম সাহেবা বলেছেন যে, রাজোদ্যানে প্রত্যহ অনেক ফুল ফুটে বৃথা নষ্ট হয়ে যায়; ফৌজদার সাহেব যদি রোজ রোজ ফুল তুলে নিয়ে দেবতার চরণে অর্পণ করেন, তা'হলে ফুলের জন্ম সার্থক হয়, বেগম সাহেবাও কৃতার্থ হ'ন।"

কালাচাঁদ এ লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কেহ যদি মণি-মাণিক্য সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে আহ্বান করিত, তাহা হইলে তিনি সে আহ্বান, সে প্রস্তাব ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিতেন; কিন্তু দেবপূজার্থে পুষ্প-সংগ্রহ! কালাচাঁদ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বেগম সাহেবার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

পরদিন কালাচাঁদ ফুল তুলিতে গিয়া দেখিলেন, দ্বারে প্রতিহারী নাই—কবাট মুক্ত—উদ্যানেও জনপ্রাণী নাই। তিনি হৃষ্টচিত্তে রাশি রাশি ফুল সংগ্রহ করিয়া নদীতীরে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া দেবপূজা করিলেন দ্বিতীয় দিবসেও কালাচাঁদ উদ্যানে কাহাকেও দেখিলেন না। তৃতীয় দিবসে তিনি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলেন। দেখিলেন, ফুল্লকুসুমিত পদ্ম-বৃক্ষতলে একটি কুসুমাধিক কোমলা নবযৌবনোদ্ভাসিতা কিশোরী দাঁড়াইয়া উদয়োন্মুখ ভানুপানে চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার ললাটে, অঙ্গে পুষ্পরাশি ছড়াইয়া পড়িয়াছে—স্নেহাধিক কোমল বালারুণ তাহার দেহ জড়াইয়া

ধরিয়াছে। কালাচাঁদ মুহূর্ত্তেকের জন্য তাহার পানে চাহিলেন; তারপর নিঃশব্দপদসঞ্চারে উদ্যান ত্যাগ করিলেন।

চতুর্থ দিবস কালাচাঁদ আসিলেন না। পঞ্চম দিবসে উদ্যানে আবার আসিলেন। ভাবিয়াছিলেন সে দিন উদ্যানে হয়ত কেহ থাকিবে না। ছিলও না। কিন্তু যখন তিনি পুষ্প সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, তখন তিনি শুনিলেন সন্নিকটস্থ লতাকুঞ্জান্তরাল হইতে কে যেন বলিতেছে,—"আপনিই কি ফৌজদার সাহেব?"

ফৌজদার দাঁড়াইলেন; চারিদিক্ পানে চাহিয়া দেখিলেন। কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না; তখন তিনি আবার অগ্রসর হইলেন। পিছনে আবার কে কি বলিল। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন; দেখিলেন, লতাকুঞ্জের দ্বারপথে সেই ভুবনমোহিনী কিশোরী দণ্ডায়মানা। কালাচাঁদ বুঝিলেন, এ রমণী সুলতান-তনয়া। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি আদেশ নবাবপুত্রি?"

"আপনি আমায় কিরূপে চিনিলেন, ফৌজদার সাহেব?"

"অনুমানে বুঝেছি।"

"আমার রূপ দেখে?"

"আপনার যে রূপ আছে তাহা আমি লক্ষ্য করিনি।"

বলিয়া কালাচাঁদ উদ্যান পরিত্যাগ করিলেন।

নবাব-কন্যা একখানি চিত্রের ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কালাচাঁদের রূঢ় কথা, রূঢ় ব্যবহার তাঁহার হৃদয়ে বড়ই লাগিয়াছিল।

তারপর কালাচাঁদ উদ্যানে আর চার পাঁচ দিন আসিলেন না। চার পাঁচ দিন পরে একদিন অতি প্রত্যূষে আসিয়া দেখিলেন, উদ্যানের দ্বার রুদ্ধ—দ্বারেও প্রহরা বসিয়াছে। কিন্তু কালাচাঁদ আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র প্রহরী সসম্ভ্রমে দ্বার খুলিয়া দিল। কালাচাঁদ উদ্যানে প্রবেশান্তে কিয়দ্দূর

অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, লতাকুঞ্জের সন্নিকটে নবাব-পুত্রী ভূপৃষ্ঠে কঠিন মৃত্তিকার উপর শয়ান রহিয়াছেন। কালাচাঁদ চমকিয়া দাঁড়াইলেন। একবার সেই ছিন্ন বল্লরী, সেই ছিন্ন বিদ্যুল্লতা পানে চাহিলেন; কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য,—পরমুহূর্ত্তেই তিনি উদ্যান ত্যাগ করিলেন। তারপর আর তিনি উদ্যানে আসিলেন না।

পঞ্চদশ দিবসে কালাচাঁদ নবাবের সমক্ষে আহূত হইলেন। সেই ক্ষুদ্র কক্ষ—সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নবাব। নবাব স্থিরদৃষ্টে কালাচাঁদের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফৌজদার সাহেবের অভিপ্রায় কি?"

কালাচাঁদ। অভিপ্রায় শতবর্ষেও পরিবর্ত্তিত হইবার নয়, সুলতান!

নবাব। তবে দণ্ড গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছ?

কালা। সকল সময়ে প্রস্তুত, রক্তপিপাসু সুলতান!

নবাব। রক্তপিপাসু?

কালা। সহস্রবার রক্তপিপাসু।

নবাব। ফৌজদার—

কালা। যে মরিতে যাইতেছে, তা'কে কি ভয় দেখাইতেছ সুলতান!

নবাব। শূল-দণ্ডে তোমার মৃত্যু—

কালা। আমি তোমার কি করিয়াছি সুলতান, তুমি আমার যৌবন-প্রভাতে, আমার জীবন-প্রারম্ভে আমাকে হত্যা করিতে মানস করিয়াছ? আমি তোমার কি করিয়াছি সুলতান, আমাকে না মারিলে তোমার রাজ্য চলে না, সংসার চলে না, তোমার ধর্ম্ম থাকে না? আমি কবে তোমার কি অপকার করিয়াছি, তোমার কোন্ কার্য্যে কবে শৈথিল্য দেখাইয়াছি, কবে তোমার কোন্ আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি যে, আমাকে পৃথিবী হইতে অপসারিত না করিলে তোমার রাজধর্ম্ম, মনুষ্যধর্ম্ম সংরক্ষিত হয় না?

সুলতানের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি নিরুত্তর রহিলেন।

বাতায়ন-পথে সুদূর আকাশ দেখা যাইতেছিল; তিনি তৎপ্রতি চাহিয়া নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মরিতে ভয় পাইতেছ, ফৌজদার?"

কালাচাঁদ। ভয় কাহাকে বলে কালাচাঁদ জন্মাবধি জানে না। সংসারে আমার কোনও বন্ধন নাই—আমার জন্য কাঁদিবার কেহ নাই। আমি কি জন্যে বাঁচিতে চাহিব? বাঁচিয়া তোমার মত অবিবেচক অত্যাচারী সুলতানের দাসত্ব করা অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেষ্ঠ। তোমার জল্লাদকে ডাক—আমি প্রস্তুত আছি।

সুলতানের মাথা নামিয়া পড়িল। তিনি অবনতবদনে বলিলেন, "এখনও বিবেচনা করিয়া দেখ ফৌজদার! রাজাজ্ঞা ফিরিবার নয়।"

কালাচাঁদ। আমারও অভিপ্রায় পরিবর্ত্তিত হইবার নয়।

এমন সময় নবাবকন্যা দ্বারান্তরাল হইতে ছুটিয়া আসিয়া পিতার চরণোপরি আছাড় খাইয়া পড়িলেন; এবং প্রায়াবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "পিতা ফৌজদারকে ছেড়ে দেও—আমি আর তাঁকে বিবাহ করতে চাই নে।"

সুলতান অপ্রসন্ন হইলেন। ক্ষণপূর্ব্বে তাঁহার হৃদয়ে যে করুণাটুকু যে দুর্ব্বলতাটুকু সমুদিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা অন্তর্হিত হইল। তিনি মাথা নাড়িয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি বিবাহ কর বা না কর, অবাধ্য প্রজা, অবাধ্য কর্ম্মচারীকে শাস্তি দিতে হবে।"

সুলতান-তনয়া পা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "তবে সেই সঙ্গে আমাকেও বিদায় দাও।"

নবাব এবার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ক্রোধটা শুধু কালাচাঁদের বা দুলারীর উপর নয়; কতক কতক ঘটনার উপর। তিনি একটু তেজের সহিত উত্তর করিলেন, "তা'ও দিতে পারি, কিন্তু নিজের আদেশ প্রত্যাহার করিতে পারি না।"

দুলারী বিবি বলিলেন, "বেশ পিতা, বেশ সুলতান! আমারও আর ঐশ্বর্য্য আভরণে প্রয়োজন নাই, তোমার জিনিষ তুমি লও।"

বলিয়া তিনি অঙ্গ হইতে সমস্ত অলঙ্কারগুলি একে একে খুলিয়া পিতার চরণ-সমীপে রক্ষা করিলেন। তারপর কোনও দিকে না চাহিয়া ধীরপাদবিক্ষেপে কক্ষত্যাগ করিলেন।

সুলতানের মাথা আবার নামিয়া পড়িল; করুণাটুকু আসিয়া পুনরায় তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি মাথা না তুলিয়া বলিলেন, "ফৌজদার সাহেব, যে ব্যক্তি আমার কন্যাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আমার আদেশ অমান্য করেছে, সে ব্যক্তি কোন মতেই জীবিত থাক্‌তে পারে না, সে বেঁচে থাক্‌লে আমি আর মাথা তুল্‌তে পারব না—আমার সিংহাসনও কণ্টকময় হবে। কিন্তু—কিন্তু কালাচাঁদ, আমি তোমাকে প্রকৃতই একটু স্নেহ—"

কালাচাঁদ বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনি ঠিক করিতেছেন সুলতান্, আমিই ভুল বুঝিয়াছিলাম; আমি আপনাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিতেছি।"

এবার দুর্ব্বলতা আসিয়া সুলতানের হৃদয়-কবাটে আঘাত করিতে লাগিল। সুলতান বলিলেন, "কালাচাঁদ, আমার অনুরোধ—আমার প্রার্থনা—"

"ক্ষমা করিবেন সুলতান।"

"আমার ভিক্ষা—"

"আর আমায় লজ্জা দিবেন না।"

দুর্ব্বলতা পুঁটুলি বাঁধিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। স্ত্রী করুণাও অনুবর্ত্তিনী হইবার অভিলাষ জানাইল। নবাব বলিলেন, "তুমি যা চাহিবে, তাহা দিব। বল, বল কালাচাঁদ—"

"বঙ্গরাজ্য বিনিময়েও যে তা' পার্‌ব না সুলতান।"

দুর্ব্বলতা ও করুণা—স্বামী স্ত্রী—পুঁটলি ঘাড়ে করিল। নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য বল দেখি ফৌজদার, কেন তুমি নবাবজাদীকে গ্রহণ কর্‌তে অসম্মত ?"

কালাচাঁদ। বলেছি ত নবাব, যে রমণীকে আমি অভিলাষ করি না, তাহাকে আমি গ্রহণ কর্‌তে পারি না।

দুর্ব্বলতা ও করুণা সবেগে প্রস্থান করিল। নবাব, জল্লাদকে তলব দিলেন।

যেখানে সচরাচর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বধ করা হয়, সেখানে কালাচাঁদকে লইয়া যাওয়া হইল না। কেননা, কালাচাঁদকে গোপনে বধ করিতে হইবে; লোক জানাজানি হইলে রাজ-নন্দিনীর কলঙ্ক। অতএব বিস্তীর্ণ রাজপ্রাসাদের একাংশে—উন্মুক্ত স্থানে—কালাচাঁদের জন্য বধমঞ্চ ক্ষণকাল মধ্যে নির্ম্মিত হইল। সুলতান তথায় আর আসিলেন না; একজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী ও দুইজন ঘাতক মাত্র তথায় উপস্থিত রহিল। কালাচাঁদ বধ্যভূমিতে সহাস্যবদনে আসিলেন; এবং একবার আকাশের দিকে চাহিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, "আমার কোনও দুঃখ নেই প্রভু—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

ঘাতক বলিল, "প্রস্তুত হও।"

কালাচাঁদ। ঘাতক, আমাকে বাঁধিবার প্রয়োজন নাই, আমি অবনতমস্তকে রাজাজ্ঞা গ্রহণ করিব।

ঘাতক। সে ত ভাল কথাই; এখন হাঁটু গেড়ে বসো।

কালাচাঁদ স্থির হইয়া আদেশমত বসিলেন। ঘাতক খড়্গ উঠাইল, কিন্তু কর্ম্মচারীর হুকুম না পাইলে খড়্গ নামাইতে পারে না। এমন সময় এক উন্মাদিনী ছুটিয়া আসিয়া কালাচাঁদ ও খড়্গের

মধ্যে পড়িল। ঘাতক স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল; জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

উন্মাদিনী উত্তর করিল, "আমি কে পরে জানিবে। ঘাতক, আগে আমাকে বধ কর, পরে ফৌজদারকে মারিও।"

ঘাতক। সরে দাঁড়াও, আগে এই লোকটাকে কোতল করে নি।

উন্মাদিনী। আমি বেঁচে থাক্‌তে ফৌজদারকে কেহ মার্‌তে পার্‌বে না।

ঘাতক। তবে তুমিও ওর পাশে বসো, একসঙ্গেই সেরে নি।

কালাচাঁদ এ উন্মাদিনীকে চিনিলেন। যাহাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, সেই এক্ষণে জল্লাদের খড়্গ বক্ষ পাতিয়া লইতে আসিয়াছে। কালাচাঁদ দেখিলেন, দুলারী বিবির অঙ্গে কোথাও একখানি অলঙ্কার নাই, পরিধানে সে মূল্যবান্ বসন বা কোর্ত্তা নাই। কালাচাঁদ ক্ষণকালের জন্য দুলারীর মুখপ্রতি একটু যেন মুগ্ধনয়নে চাহিয়া রহিলেন। তিনি দেখিলেন, শুভ্র ছিন্ন বসন মধ্য হইতে নবাব-নন্দিনীর রূপ যেন উছলিয়া উঠিতেছে। এত রূপ, অলঙ্কারের আবরণে এতদিন ঢাকা ছিল। কালাচাঁদ বলিলেন, "নবাব-পুত্রি, সরিয়া দাঁড়াও।"

রাজকর্ম্মচারী ও ঘাতকদ্বয় কুর্ণিশ করিতে করিতে বিশ হাত পিছাইয়া গেল। কালাচাঁদ বলিলেন, "নবাব-পুত্রি, আমার মৃত্যু ত অনেক পূর্ব্বেই হয়েছে; সে যন্ত্রণাকে তীব্র কর্‌বার জন্যে আর কেন আমার জীবন রক্ষার প্রয়াস পাচ্ছ?"

নবাব-নন্দিনী। আপনার জীবন রক্ষা কর্‌তে আসি নি, ফৌজদার সাহেব! আপনাকে আমি চিনেছি। আমার অভিপ্রায়, যে এই সর্ব্বনাশের মূল তার জীবন অগ্রে গৃহীত হউক।

সুলতান অন্তরালে দণ্ডায়মান ছিলেন। কর্ম্মচারী সম্ভবতঃ তাহা

জানিত। সে আদেশ প্রত্যাশায় সুলতানের দিকে ফিরিল। সুলতান তাহাকে কি ইঙ্গিত করিলেন। সে ঘাতকদ্বয় লইয়া প্রস্থান করিল।

কালাচাঁদ বা দুলারী কেহ তাহা লক্ষ্য করিলেন না। কালাচাঁদ তখন বলিতেছিলেন, "কেন জীবন দিবে, দুলারী বিবি? তোমার এই বয়স, এত রূপ—"

দুলারী। রূপ যৌবন নিয়ে কি জীবন?

কালা। ঐশ্বর্য্য, পদ—?

দুলারী। ছি!

কালা। তবে কি নিয়ে?

দুলারী। আত্মসমর্পণ।

কালা। দুলারী বিবি, এতদিন তোমাকে আমি চিন্‌তে পারি নি; আমাকে গ্রহণ কর্‌বে কি?

দুলারী ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; তারপর কালাচাঁদের চরণের উপর মাথা লুটাইয়া পড়িয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "এতদিনে আমার পূজা গ্রহণ করিলে প্রভু?"

কালাচাঁদের চরণদ্বয় শতবার চুম্বিত হইল।

---

# দশম পরিচ্ছেদ

নবাব-নন্দিনীর সহিত কালাচাঁদের মহাসমারোহে বিবাহ হইয়া গেল। পূর্ব্বে এ বিবাহে সুলতানের একটু অনিচ্ছা ছিল; ক্রমে অনিচ্ছার স্থান আকাঙ্ক্ষা অধিকার করিয়াছিল; পরে আকাঙ্ক্ষা জিদে পরিণত হইয়াছিল। হৃত রত্ন লাভ করিয়া লোকে যেরূপ আনন্দে তাহা বক্ষে ধারণ করে, সুলতানও সেইরূপ মহোল্লাসে কালাচাঁদকে বক্ষে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কালাচাঁদ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেন না। দুলারী তাঁহাকে মুসলমান হইতে দিল না—সে নিজে হিন্দু হইল।

নবাব তাঁহার জামাতার বাসের জন্য এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা প্রদান করিলেন। হিন্দু দাসদাসী নিযুক্ত হইল। কিন্তু কালাচাঁদ তথায় আহারাদি করিতেন না; তিনি বুনার কাছে আহারের জন্য আসিতেন। গঙ্গাস্নান, পূজাহ্নিক, ত্রিপুণ্ড্রকের কোনই ত্রুটি হইল না। তথাপি হিন্দুসমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করিল না। দুলারীর কথা ত হিন্দুসমাজ বিবেচনার যোগ্যই মনে করিল না। নবাব, কন্যার খাতিরে একটু চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সমাজ তাঁহার অনুরোধ গ্রাহ্য করিল না। কালাচাঁদ স্বয়ং অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু বিফলমনোরথ হইলেন। শুশং অধিপতির নিকট গমন করিয়া সমাজে স্থান ভিক্ষা করিলেন; তিনি বিদ্রূপ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। জননীকে পত্র লিখিলেন। জননী হরসুন্দরী প্রত্যুত্তরে লিখিলেন,—"তোমাকে ও নব-বধূকে বুকে লইবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়াছি। আমার বাসের জন্য উদ্যানের একপ্রান্তে

গৃহ নির্ম্মাণ হইতেছে। তথায় আমি পুরমহিলাদের লইয়া সত্বর স্থানান্তরিত হইব। তুমি সত্বর আসিবে।"

সকল দিকে হতাশ হইয়া অবশেষে কালাচাঁদ, গদাধরের শরণাপন্ন হইলেন। গদাধর তখন সাঁতোড়ে—শ্বেতায়। বহুকাল পরে উভয়ের সাক্ষাৎ। কালাচাঁদ বলিলেন, "ভাই, আমায় ক্ষমা কর; আমি পাপিষ্ঠার জন্য অমূল্য রত্ন হারাতে বসেছিলাম।"

উত্তর না দিয়া গদাধর হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক কালাচাঁদকে স্কন্ধে ধারণ করিলেন। কালাচাঁদ চমৎকৃত হইলেন। আশা হইল, গদাধর তাঁহাকে বিমুখ করিবেন না। ক্ষণপরে বলিলেন, "গদাধর, তুমি আমায় গ্রহণ করবে কি?"

গদা। আমি কবে তোমায় ত্যাগ করেছি ভাই?

কালা। আজ আমি তোমার গৃহে অতিথি।

গদা। সাধ্যমত অতিথি-সৎকার করব।

কালা। বাল্যকালে দুইজনে যেমন এক পাত্রে আহার করতুম, তেমনি করে আহার করবে ভাই?

গদা। তেমনটা ত আর হ'তে পারে না, কালাচাঁদ।

কালা। বুঝেছি, তুমিও আমায় ত্যাগ কর্‌লে।

গদা। ত্যাগ করি নি ভাই—বুকের ভিতর আরও জড়িয়ে ধরেছি; তুমি যে এখন দায়ে পড়েছ।

কালা। আমি দয়া চাই না—সমাজে স্থান চাই।

গদা। যবনীকে ত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত আছ?

কালা। না—শতবার না।

গদা। প্রায়শ্চিত্ত?

কালা। না। আমি এমন কোনও কাজ করি নাই, যে জন্য আমার অনুতাপ, প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন।

গদা। তবে আমি কিছু করতে পারব না ভাই।

কালা। আগে জানতাম না, সমাজ এত ভ্রান্ত, এত নিষ্ঠুর।

গদা। মানুষ নিয়ে যে সমাজ ভাই! মানুষের ধর্ম্মই ভ্রম, প্রকৃতিই নিষ্ঠুরতা।

কালা। এমন সমাজ ধ্বংস হউক।

বলিয়া কালাচাঁদ অনাহারে প্রস্থান করিলেন।

তা'রপর একদিন তিনি পূজামানসে পাটলাদেবীর মন্দিরে গমন করিলেন। পূজকেরা তাঁহাকে মন্দিরে উঠিতে দিল না। কালাচাঁদ ক্ষুব্ধহৃদয়ে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

নবাব, কালাচাঁদের ক্ষত হৃদয়ের ব্যথা বুঝিলেন। তাঁহার সাধ্যমত ঔষধি লেপনের ব্যবস্থা করিলেন,—বিপুল জায়গীর, ধন, পদ, সম্মান অর্পণ করিলেন। কিন্তু ব্যথা মরিল না; উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল।

অবশেষে কালাচাঁদ পুণ্যময় শ্রীক্ষেত্রে যাইবার মানস করিলেন।

---

# রাণী-ব্রজসুন্দরী

## তৃতীয় খণ্ড

তেজ

(আত্মাভিমান)

কালাচাঁদ ও ব্রজবালা

# প্রথম পরিচ্ছেদ

এই কি সে উড়িষ্যা-ক্ষেত্র? এই কি সে 'সর্ব্বপাপহরণ' * পবিত্র ভূমি —যা'র নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, শৈলে শৈলে অগণ্য দেব-মন্দির?— যা'র নদীতে নদীতে ভক্তির কল্লোল, তৃণে তৃণে পবিত্র স্মৃতি, বায়ুতে আকাশে চির মন্ত্রিত স্তোত্র-ধ্বনি, এই কি সেই পুণ্যময় দেবলোক? †

এই কি সে আগ্রাহাট ‡ যেখানে পুণ্যশ্লোক পাণ্ডুবংশধর জন্মেজয় সর্পযজ্ঞ করিয়াছিলেন? এই কি সে যযাতিকেশরীর যজ্ঞপুর? § এই কি সে উত্তালতরঙ্গময়ী পাপহরা বৈতরণী? এই কি সে ললাট ইন্দ্রের নগরীশ্রেষ্ঠ মহাতীর্থ ভুবনেশ্বর? এই কি সে পঞ্চক্রোশী দেব-ক্ষেত্র, যাহার ললাটে উদয়গিরি, দেবলগিরি, নীলগিরি, খণ্ডগিরি?—যার হৃদয়ে পঞ্চ-সহস্র দেবমন্দির?

এই কি জগন্নাথ, তোমার লীলাভূমি? এই কি সে সমুদ্রকূল, যেখানে বসুশবর তোমার দারু ব্রহ্মমূর্ত্তির দর্শন পাইয়াছিল? এই কি সে স্বপ্নময় রাজ্য, যেখানে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সুখময় স্বপ্নে তোমার প্রেমময় সনাতন মূর্ত্তির দর্শন লাভ করিয়াছিলেন?

* কপিলা সংহিতা।

† "This country belongs to the gods, and from end to end is one region of pilgrimage."—Stirling's Orissa.

‡ কটকের চারিক্রোশ উত্তরে।

§ বর্ত্তমান যাজপুর।

এই পুণ্যময় দেশে, এই পবিত্র ক্ষেত্রেও কি আমার অপরাধ বিধৌত হইবে না? আমি যে জগন্নাথ, শান্তির আশায় তোমার কাছে ছুটে এসেছি। আমায় যে কেউ ঠাঁই দিলে না, প্রভু! তাই যে নাথ, তোমার কাছে এসেছি। যার কোনও আশ্রয় নেই, ভরসা নেই, তা'র তুমিই যে আশ্রয়, তুমিই যে গতি!

একজন পথিক একাগ্রচিত্তে জগন্নাথদেবকে ডাকিতে ডাকিতে শ্রীক্ষেত্র অভিমুখে পদব্রজে চলিয়াছে। পথিক একাকী। তাহার সম্বলের মধ্যে একটা ঝোলা ও একগাছা যষ্টি; তাহার পরিধানে একখানি বস্ত্র, স্কন্ধে উত্তরীয়, কণ্ঠবক্ষে যজ্ঞোপবীত, চরণ পাদুকাবিহীন। পথিক আমাদের অপরিচিত নহেন। তিনি সমাজচ্যুত নবাব-জামাতা কালাচাঁদ।

অদূরে শ্রীক্ষেত্র ধাম দর্শন করিয়া কালাচাঁদ শ্রান্ত চরণকে বিশ্রাম দিবার অভিপ্রায়ে পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। অস্পষ্টদৃষ্ট মন্দির-চূড়া পানে চাহিয়া কালাচাঁদ বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর, যবনী বিবাহে কি এত অপরাধ? বিবাহ করেছি বটে, কিন্তু আমি ত যবন হই নি! অন্তর্যামী ভগবান্, তুমি ত জান, আমার হৃদয় তোমার চরণে লুণ্ঠিত। তবে কেন কোনও হিন্দু আমায় ঠাঁই দিলে না?—হিন্দুসমাজ আমায় আশ্রয় দিলে না? আমি ত প্রাণরক্ষার্থে তা'কে বিবাহ করি নি—আমি যে আমার হৃদয় অর্পণ করে তা'কে বিবাহ করেছি। ভগবান্, তবে আমার অপরাধ কি? তুমি যেমন আমাকে গড়েছ, তেমন কি যবনীকে গড় নি? সে কি তোমার সন্তান নয়? তবে তোমার রাজ্যে এ অবিচার কেন?"

কালাচাঁদের চক্ষু ক্রমে জলভারাকুল হইয়া উঠিল। তিনি সুদূর মন্দির-চূড়া পানে চাহিয়া উদ্দেশে জগন্নাথদেবকে শত শত প্রণাম করিতে লাগিলেন। এমন সময় একজন পথিক আসিয়া কালাচাঁদের নিকটে

দাঁড়াইল। সে ব্যক্তি কালাচাঁদের নয়ন অশ্রুভারাকুল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পথিক, কাঁদিতেছ কেন?"

কালাচাঁদ, পথিকের পানে চাহিয়া দেখিলেন; কিন্তু কোনও উত্তর করিলেন না। পথিক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ক্ষুধার্ত্ত?"

কালাচাঁদ উত্তর না দিয়া উঠিবার উদ্‌যোগ করিলেন। পথিক তদ্দৃষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাবে?"

কালাচাঁদ শ্রীক্ষেত্র পানে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিলেন।

"উদ্দেশ্য?—দেবদর্শন? না, রাজদর্শন?"

কালাচাঁদ পথিকের পানে ফিরিয়া তীক্ষ্ণনয়নে তাহাকে লক্ষ্য করিলেন। দেখিলেন, পথিকের বয়স তত বেশী নয়—ত্রিশ হইতে পারে। পথিক হিন্দু, তবে কোন্ দেশবাসী তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। পথিকের মাথায় জটা বা পরিধানে গৈরিক বস্ত্র না থাকিলেও তাঁহাকে সহসা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বলিয়া মনে হয়। হস্তে একটী দণ্ড, এবং পরিধানে একখানি বস্ত্র ছাড়া আর কিছু তাঁহার সঙ্গে নাই। কালাচাঁদ যত তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন ততই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন, জ্যোতিষ্মান্ পুরুষের প্রতি চাহিতে চাহিতে কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

"সামান্য পথিক।"

"আপনি ত সামান্য ন'ন।"

"আমার কি আছে বাবা?"

"আপনার শান্তি আছে।"

"তোমার কি তা' নেই?"

"না; শান্তি প্রার্থনায় ঠাকুরের কাছে যাচ্ছি।"

"তবে ফিরে যাও।"

"কেন?"

"ঠাকুরের হাত নেই, কাণ নেই।"

"চোখ্ ত আছে।"

"চো'খ দিয়ে তোমার দুঃখ দেখেন—মোচন করেন না।"

"তা' কি হ'তে পারে? তিনি যে জগতের নাথ।"

"তিনি জগতের নাথ বটে, কিন্তু তিনি কর্ম্মময় ন'ন।"

"তবে তিনি কি?"

"তিনি প্রেমময়। যে ব্যক্তি কামনা পরিশূন্য হয়ে তাঁর কাছে আস্তে পারে, তা'কে তিনি প্রেমদান করেন।"

কালাচাঁদ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তবু আমি তাঁর কাছে যাব।"

"যেও না, ফের।"

"সে কি! আপনি হিন্দু হ'য়ে জগন্নাথদেব দর্শনে নিষেধ করছেন?"

"তুমি শ্রীক্ষেত্রে গেলে হিন্দুর সর্ব্বনাশ হবে।"

কালাচাঁদ সাতিশয় বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন, "আপনার কথা অতি বিচিত্র! আমি একজন সামান্য হিন্দু, জগন্নাথ-দর্শনে চলেছি, আমার আগমনে বিশাল হিন্দুসমাজের—হিন্দুধর্ম্মের কি ক্ষতি হ'তে পারে?"

"অত কথা আমি জানি না; গুরুদেব যা' বলেছেন তাই বলছি।"

"আপনার গুরুদেব কোথায়?"

"অনেক দূরে। তুমি আজ এখানে আসবে ধ্যানে জেনে তিনি আমায় পাঠিয়েছেন।"

"তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় না?"

"একবার হয়েছিল, আর একদিন হবে।"

কালাচাঁদ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আপনি বল্তে পারেন আমি কখন শান্তি পাব কি না?"

"না—কখন পাবে না—চিরদিন অশান্ত হৃদয় নিয়ে জগৎময় ছুটে বেড়াবে।"

"তুমি যাও সন্ন্যাসি, তোমার কাজে যাও।"

কালাচাঁদ শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফিরিবে না?"

"কিছুতেই না।"

"তবে যাও—নিয়তি অলঙ্ঘনীয়।"

কালাচাঁদ দ্রুতপদে শ্রীক্ষেত্র অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। নগরমধ্যে যখন প্রবেশ করিলেন, তখন প্রায় মধ্যাহ্ন। আকাশ নির্ম্মল—মেঘশূন্য; পৃথিবী স্থিরা, বায়ুর গর্জ্জন বিরহিতা। কালাচাঁদ নগরে প্রবেশ করিতে না করিতেই একটা বিরাট অন্ধকার কোন্ নিভৃত প্রদেশ হইতে ছুটিয়া আসিয়া সমস্ত আকাশ পৃথিবী সমাচ্ছন্ন করিল। সূর্য্যদেব রাহুকবলিত হইলে পৃথিবী যেমন একটা স্পষ্ট অন্ধকারে আবৃত হয়, সেইরূপ একটা অন্ধকারে চতুর্দ্দিক অভিভূত হইল। আকাশ ধূম্রময়, পৃথিবী ধূম্রময়। কালাচাঁদ বিস্মিতনয়নে চারিদিকে নেত্রপাত করিতে লাগিলেন। পথে অনেক লোক চলিতেছিল। কালাচাঁদ যেমন বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাহারাও তেমনি বিস্মিত হইয়া চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিতেছিল। অচিরে কালাচাঁদ শুনিলেন, চতুর্দ্দিকে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কালাচাঁদ মন্দির-অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

কালাচাঁদ গরুড়স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া জগন্নাথদেবকে প্রণাম করিলেন। অন্ধকার যেন আরও গাঢ় হইয়া আসিল—ক্ষেত্রধাম যেন কালিমা-বেষ্টিত হইল। কালাচাঁদ স্তব্ধহৃদয়ে শুনিলেন, পশ্চাতে একটা কি ভয়ঙ্কর শব্দ হইতেছে। তিনি কখন সমুদ্র দেখেন নাই, সমুদ্রের গর্জ্জনও শুনেন নাই। তিনি শুনিলেন, পশ্চাতে যেন লক্ষকণ্ঠে চীৎকার

হইতেছে—যেন সেই উত্থিত চীৎকার তাঁহাকে মন্দির-প্রবেশে নিষেধ করিতেছে, সেই চীৎকারকে বহিয়া আনিতে দুরন্ত বায়ু পর্ব্বতগহ্বর হইতে ছুটিয়া আসিল, ধূলিকণায় গগন সমাচ্ছন্ন হইল—অন্ধকারের গায় কালিমা ব্যাপ্ত হইল—নীল মহাশূন্য, নীল বারিধি হৃদয়ে অঙ্গ ঢালিল। সব একাকার হইল। কালাচাঁদ গরুড়স্তম্ভ অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইলেন।

তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, অসংখ্য মনুষ্য মন্দিরের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে; অসংখ্য নরনারী উচ্ছৃঙ্খলপদে সুদীর্ঘ সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া মন্দিরের ভিতর আশ্রয় লইতে ছুটিয়াছে। ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া কালাচাঁদ ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে জনস্রোতে গা ভাসাইয়া সোপানাবলী অতিক্রম করতঃ মন্দির-প্রাঙ্গণে সমুপস্থিত হইলেন।

তখন সহসা এক অভিনব ব্যাপার সংঘটিত হইল। মন্দিরের চূড়া-সানুদেশ হইতে একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর স্থানচ্যুত হইয়া ভীষণ শব্দ সহকারে প্রাঙ্গণে পড়িল। সে শব্দে সমস্ত পুরীধাম কম্পিত হইয়া উঠিল। সেই বিপুল জনসঙ্ঘ স্তব্ধ, শঙ্কিতচিত্তে ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর সেই অগণ্য নরনারী কণ্ঠ হইতে এক ভীষণ কোলাহল উঠিল। সে চীৎকার রাজার কাণে পঁহুছিল।

---

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজার নাম মুকুন্দদেব। লক্ষ্মণসেন যেমন বাঙ্গালার শেষ হিন্দুরাজা, মুকুন্দদেবও তেমনই উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নৃপতি। তবে মুকুন্দদেব, লক্ষ্মণ-সেনের ন্যায় বৃদ্ধ ও শক্তিহীন ছিলেন না। তাঁহার সাহস ও শক্তি ছিল।

উড়িষ্যা তখনও শক্তি হারায় নাই। উড়িষ্যার প্রত্যেক অধিবাসী দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা। একদিন উড়িষ্যা তাহার শক্তিপ্রভাবে বাঙ্গালার পাঠান-নৃপতিকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল—সম্রাটকুলতিলক আকবরও তাহার শক্তিকে বরণ করিয়া তাহার সখ্য কামনা করিয়াছিলেন। সেটা কিছু বেশী কথা নয়। যে জাতির রাজ্য উত্তরে ত্রিবেণী হইতে দক্ষিণে গোদাবরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল—যে জাতির পাইক তিন লক্ষ, অশ্বসাদী বিশ সহস্র, গজারোহী প্রায় ত্রি সহস্র ছিল, সে জাতি বড় সামান্য ছিল না। সামান্য হইবার ত কথা নয়,—উড়িষ্যাবাসী যে আর্য্যবংশ-সম্ভূত। যে প্রবল জাতি একদিন মধ্য এসিয়া হইতে বন্যার ন্যায় আসিয়া ইউরোপ ও ভারতভূমি সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল, উড়িষ্যাবাসীরা সেই জাতিরই বংশধর। আর্য্যেরা কেহ ইউরোপে গেলেন, কেহ ভারতে আসিলেন। যাঁহারা ভারতে আসিলেন, তাঁহারা উত্তরভারতে কিছুকাল অবস্থান করিলেন; পরে দক্ষিণভারতে যাইবার পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সমুন্নত বিন্ধ্যাচল মানদণ্ডস্বরূপ ভারতবর্ষকে বিভাগ করিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে দণ্ডায়-মান। দক্ষিণে প্রবেশ করিবার দুইটি পথ; এক সুরাষ্ট্র, অপর বঙ্গদেশ। অগস্ত্য বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করিয়া সুরাষ্ট্রপথে দক্ষিণে গেলেন। যাঁহারা

সে পথ অবলম্বন করিতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হইলেন, তাঁহারা বাঙ্গালার পথ অবলম্বন করিয়া উড়িষ্যায় আসিলেন। উড়িষ্যায় যাঁহারা অবস্থান করিলেন, তাঁহারা উড্র প্রভৃতি আদিমবাসীদের দূরীভূত করিয়া নিজেরা রাজা হইলেন। বর্ত্তমান উড়িষ্যাবাসীরা তাঁহাদেরই বংশসম্ভূত। সুতরাং বীর্য্যে ও আভিজাত্যে তাঁহারা পৃথিবীর কোন জাতি অপেক্ষা হীন নহেন।

সেই মহাগৌরবান্বিত জাতির বর্ত্তমান অধিপতি, রাজা মুকুন্দদেব। তিনি সম্প্রতি গোলকন্দ-নরপতি ইব্রাহিম খাঁকে রাজমাহেন্দ্রীর মহাযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া জগন্নাথদেবের পূজামানসে শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলিয়া গিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, তিনি বৎসরের অর্দ্ধাংশ রাজকার্য্যে ক্ষেপণ করিতেন, অপরার্দ্ধ নিদ্রায় যাপন করিতেন। * ঠিক কুম্ভকর্ণ না হইলেও তদ্বৎ একটা কিছু ছিলেন বলিয়া মনে হয়। আবার কেহ বলিয়াছেন, মুকুন্দদেবের চারিশত রাণী ছিল। † তিনি কি ছিলেন এবং তাঁহার কি ছিল, তাহা জানিবার এক্ষণে বিশেষ কোন উপায় নাই। তবে তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ দেখিলে—তাঁহার ত্রিবেণীর ঘাট ও মন্দির নিচয়—তাঁহার বারোবাটী দুর্গ—তাঁহার সৈন্য ও প্রতাপ দেখিলে মনে হয়, তিনি শক্তিমান্ ও কীর্ত্তিমান্ রাজা ছিলেন। মানুষের সকল গুণ থাকে না,—মুকুন্দদেবেরও ছিল না। তিনি বিলাসী ও রমণী অভিলাষী ছিলেন।

প্রজার বিপদ-আপদে রাজা অবলম্বন। যখন মন্দির-চূড়ার পাথর ভাঙ্গিয়া পড়িল, তখন ভীত জনসঙ্ঘ ত্রস্তপদে রাজদ্বারে ছুটিয়া আসিল। মন্দির হইতে প্রাসাদ বড় বেশী দূর নয়। রাজা সে সময় মধ্যাহ্ন আহারের

* Riyazu—S—Salatin.

† Jesuit Tieffenthaler.

র শয্যায় শুইয়া বিশ্রামলাভ করিতেছিলেন। প্রস্তর পতনের ব্দে তিনি চমকিত হইয়া দ্বারের প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের শব্দ?"

প্রহরী জাতিতে পাহাড়ী। তাহার বাম বাহুতে কাষ্ঠের ঢাল, দক্ষিণ স্তে সুদীর্ঘ তরবারি। রাজার প্রশ্ন শুনিয়া সে ঢাল আঁটিয়া ধরিল এবং রবারি আস্ফালন করিতে লাগিল। একটা মার্জ্জারী তাহার নয়ন থবর্ত্তী হইবামাত্র প্রহরী তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল; এমন সময় মন্দির ান্নিধ্য হইতে একটা ভীষণ কোলাহল উঠিল। রাজা অবিলম্বে শয্যাত্যাগ রিলেন; এবং কক্ষ বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, সমস্ত প্রাসাদ একটা ালিমায় সমাচ্ছন্ন। নিশাচর পক্ষীরা চীৎকার করিতে করিতে রাজার াথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। দূরে শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। রাজার রহৃদয়ে একটা অব্যক্ত আতঙ্কের সঞ্চার হইল। তিনি করযোড়ে গন্নাথদেবকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন।

আসিয়া দেখিলেন, মন্ত্রী দনার্দ্দন বিদ্যাধর তাঁহার প্রতীক্ষা রিতেছেন। রাজা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ নার্দ্দন?"

দনার্দ্দন। প্রজারা মহারাজের নিকট এসেছে।

রাজা। কেন? কি হয়েছে? শব্দ কিসের?

দনা। মন্দিরের চূড়া ভেঙ্গে পড়েছে।

রাজা। মন্দিরের? কোন্ মন্দিরের?

দনা। জগন্নাথদেবের।

রাজা। সে কি? আজ সাড়ে তিনশত বৎসরের উপর * এ মন্দির

---

* বর্ত্তমান মন্দির ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে।

দাঁড়িয়ে আছে, তার চূড়া আমার রাজত্বকালে সহসা পড়ে গেল? কি সর্ব্বনাশ!

দনা। মহারাজ, একটা অন্ধকার লক্ষ্য করেছেন কি?

রাজা। হাঁ, হাঁ; চারিদিকে কেমন একটা কালিমা—কেমন একটা ধূম্রবরণ অস্পষ্ট অন্ধকার। কোথাও ত মেঘ নাই—সূর্য্যগ্রহণের সম্ভাবনা নাই, অথচ এত অন্ধকার! দেখ, দেখ মন্ত্রী, সূর্য্য যেন নিবে যাচ্ছে, আকাশ যেন পৃথিবীর উপর ঝুঁকে পড়ছে, সমুদ্র যেন গর্জ্জে উঠে ক্ষেত্রধাম গ্রাস করতে আসছে। ওই শোন মন্ত্রী, চারিদিকে ক্রন্দনের রোল, মাথার উপর পেচকের চীৎকার, দূরে শৃগালের কলরব। জানি না জগন্নাথদেব, উড়িষ্যার অদৃষ্টে কি লিখেছ।

দনা। মহারাজ, বেসর মহান্তিকে ডাক্‌ব কি?

বেসর মহান্তিকে ডাকিতে হইল না, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রাজ-দর্শনে আসিলেন। তাঁহার পরিধানে একখানা মোটা পশমি কাপড়, কাঁধের উপর একটা মোটা গামছা, নগ্নদেহের উপর শুভ্র যজ্ঞোপবীত। তা' ছাড়া অঙ্গে আর কোথাও কিছু নাই। নামাবলী সকল সময়ে তাঁহার অঙ্গে থাকে, কিন্তু এখন ছিল না। এই পুণ্যময়, প্রেমময় জ্যোতিষ্মান্ মহাপুরুষকে দেখিয়া রাজা প্রণত হইলেন। মহাপুরুষ আশীর্ব্বাদ করিলেন, "রাজ্যের মঙ্গল হউক।"

রাজা। মঙ্গল কোথায় মহান্তি, দেখ্‌ছ ত?

মহান্তি। দেখ্‌ছি মহারাজ। আর তুমি যা দেখনি, শুননি, তাও দেখ্‌ছি।

রাজা। আবার কি হয়েছে?

মহান্তি। আমি মহাপ্রভুকে কাঁপতে দেখিছি—তাঁর অঙ্গ হ'তে বস্ত্র খ'সে পড়তে দেখিছি।

রাজা আর দাঁড়াইতে পারিলেন না—ভূপৃষ্ঠে বসিয়া পড়িলেন।

মহান্তি বলিলেন, "মহারাজ, এই বস্ত্র ষাট বৎসর পূর্ব্বে রাজা প্রতাপরুদ্র জগন্নাথদেবের জন্য প্রস্তুত করিয়েছিলেন, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ঠাকুরের অঙ্গে পরিয়ে দিয়েছিলেন।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাপ্রভু নয়।"

মহান্তি। না, নামাবলী তাঁকে পরিয়ে দিয়েছি।

রাজা ক্ষণকাল নীরবতার পর ভূপৃষ্ঠে নয়ন স্থাপন করিয়া প্রায়াবরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কেউ বল্‌তে পার, কেন এমনটা হ'ল?"

মহান্তি। তা'ও পারি মহারাজ, আমি ধ্যানে কিছু কিছু জেনেছি।

রাজা। জেনেছ? বল বল, কি জেনেছ?

মহান্তি। আমি মনশ্চক্ষে দেখছি, বাঙ্গালা থেকে এক ব্যক্তি পথ হেঁটে শ্রীক্ষেত্রে আসছে। সে ক্ষেত্রভূমে পদার্পণ করতে না করতে সমস্ত ধাম অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হ'ল। লোকটা মন্দির-প্রাঙ্গণে যেমন প্রবেশ করেছে, আর মন্দিরগাত্র হ'তে পাথর খসে পড়্‌ল। তারপর শ্রীমন্দিরে প্রবেশ—

রাজা। আর বল্‌তে হবে না মহান্তি, আমি এখনই তা'র মাথা নিচ্ছি। মন্ত্রি, তুমি যাও—তা'কে ধরে নিয়ে এস।

মন্ত্রী। আমি কি করে তাকে চিন্‌ব মহারাজ?

রাজা, মহান্তির মুখ-প্রতি চাহিলেন। মহান্তি বলিলেন, "কি করে চিন্‌বে? আচ্ছা, বলছি।" বলিয়া তিনি একটু অন্যমনস্ক হইলেন। তাঁহার প্রশান্ত নয়ন যেন একটু সঙ্কুচিত হইল। দৃষ্টি যেন কোনও অদৃশ্য বস্তুতে নিবদ্ধ হইল। ক্ষণপরেই দৃষ্টি ফিরিয়া পার্থিব বস্তুতে সন্নিকটে নিহিত হইল। মন্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তাঁহাকে এখনও শ্রীমন্দিরে পাবে।"

মন্ত্রী। লোকটা দেখ্‌তে কেমন?

মহান্তি। পরমরূপবান্।

মন্ত্রী। লোকটা বাঙ্গালী?

মহান্তি। হাঁ।

মন্ত্রী। কোন্ বর্ণ?

মহান্তি। বক্ষের উপর যজ্ঞোপবীত দেখেছি।

মন্ত্রী প্রস্থান করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহান্তি, লোকটা কি দুর্জ্জন?"

মহান্তি। না মহারাজ, তার মত ধার্ম্মিক এই পুণ্যময় দেশেও কম আছে।

রাজা। তোমার কথায় আমার অশ্রদ্ধা জন্মাল।

মহান্তি। কি করব মহারাজ, মহাপ্রভু যদি আমার দৃষ্টিভ্রম ঘটিয়ে থাকেন? কিন্তু আমার মনে হয়, এই ব্যক্তি দেবদ্বিজের মহাশত্রু।

রাজা। যাই হো'ক, চল আমরা বিচার-গৃহে যাই।

---

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিচারালয়ে সিংহাসনোপরি বসিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি ?"

"কালাচাঁদ রায়।"

"কোন্ দেশবাসী ?"

"বঙ্গদেশ।"

"কোন্ বর্ণ ?"

"শ্রেষ্ঠ বর্ণ।"

"এখানে কি জন্যে এসেছ ?"

"দেবদর্শনে।"

"আর কোন অভিপ্রায় নাই ?"

কালাচাঁদ উত্তর দিতে একটু ইতস্ততঃ করিলেন। তদ্দৃষ্টে রাজা বলিলেন, "বন্দি, তুমি উত্তর দিতে—"

কালাচাঁদ বাধা দিয়া একটু তেজের সহিত বলিলেন, "বন্দী ! আমায় বন্দী করে কে ?"

রাজা। আমি করি—আমি উড়িষ্যাধিপতি ; আমার ইচ্ছা ব্যতীত তুমি এ স্থান ত্যাগ করতে পারবে না।

কালাচাঁদ শ্লেষের সহিত উত্তর করিলেন, "তুমি প্রকৃত রাজা বটে, নইলে যে দেব-দর্শনে এসেছে, তাকে বন্দী করবে কেন ? শুনেছিলাম, এটা হিন্দু-রাজ্য, এখানকার নরপতি হিন্দু। তা' বেশ পরিচয় দিলে।

বলিয়া কালাচাঁদ একবার কক্ষের চারিদিকে চাহিলেন। দেখিলেন, অনেক নরনারী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। যখন সেই বিস্তীর্ণ কক্ষ পরিপূর্ণ হইয়া গেল, তখন জনতার গতি রুদ্ধ হইল। রাজা বলিলেন, "বন্দি, তোমার শ্লেষের কথা, তোমার তেজের কথা শুন্‌তে আমরা এখানে সমবেত হই নি—তোমার বিচার কর্‌তে আমরা এখানে এসেছি।"

কালা। কি বিচার করবে কর; পথমধ্যে দুইবার দস্যুহস্তে পড়েছিলাম, সেখানেও এইরূপ পরীক্ষা দিতে হয়েছে। এবার তোমাদের হাতে—বেশ, বিচার কর।

রাজা। কোন্ অভিপ্রায়ে এখানে এসেছ?

কালা। তা' বল্‌তে বাধ্য নই।

রাজা। না বল, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে।

কালা। বৃথা ভয় দেখাচ্ছ রাজা, কালাচাঁদ রায় সংসারে কাউকে ভয় করে না।

রাজা। যে নির্ভীক, সে সত্যাশ্রয়ী।

কালা। মিথ্যা আজিও জীবনে বলি নি। কি জান্‌তে চাও বল।

রাজা। তুমি কি সত্যই হিন্দু? সদাচারী?

কালা। হাঁ।

কক্ষের একপ্রান্ত হইতে কে বলিল, "মিথ্যা কথা।"

সকলে বক্তার পানে চাহিয়া দেখিল। ঘরের ভিতর আলো তত উজ্জ্বল নয়; তবু মুখাবয়ব বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। সকলে দেখিল, ঘরের একপ্রান্তে—বাতায়নের সন্নিকটে দুইটি বাঙ্গালী মেয়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দুই জনের মধ্যে একজন একটু অগ্রবর্ত্তিনী। যে অগ্রবর্ত্তিনী, সেই বক্তা। তাহার রূপ-যৌবন উছলিয়া উঠিতেছে। রাজা

দেখিলেন, তাহার অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনাবৃত সুন্দর মুখখানি যেন সাদা মেঘ-ঢাকা চাঁদের ন্যায় শোভা পাইতেছে। রাজা যতই রমণীকে দেখিতে লাগিলেন, ততই বিমুগ্ধ হইতে লাগিলেন। রমণীর বদন হইতে নয়ন আর ফিরে না;—রাজা আত্মবিস্মৃত হইয়া উঠিলেন।

কালাচাঁদও প্রগল্‌ভা রমণীর পানে ঝটিতি ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিবামাত্রই চিনিলেন, এ সেই কুলত্যাগিনী পাপিষ্ঠা ব্রজবালা। কালাচাঁদের নয়ন জ্বলিয়া উঠিল; ক্ষণকালের জন্য তিনি অতি তীব্রদৃষ্টিতে ব্রজবালার পানে চাহিয়া রহিলেন। ব্রজবালা সে দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিল না,—গর্ব্বিতা বাঘিনীর অন্তস্তল দগ্ধ হইয়া উঠিল। সে মুখ ফিরাইয়া পিছাইয়া গেল। তবুও তাহার মনে হইতে লাগিল, কালাচাঁদের নয়ন-নিঃসৃত জ্বালাময়ী অগ্নিশিখা তাহাকে দগ্ধ করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। ব্রজবালা সঙ্কুচিতা হইয়া সঙ্গিনীর অন্তরালে দাঁড়াইল।

রাজার তখন চমক ভাঙ্গিল। তিনি ব্রজবালাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বলিতেছিলে?"

উত্তর নাই; নির্লজ্জ মুখরা নিরুত্তর। পুনরপি প্রশ্ন হইল, "তুমি বল্‌ছিলে বন্দী মিথ্যা বলছে; তা'র সম্বন্ধে তুমি কি জান?"

ব্রজবালা, সঙ্গিনীকে চুপি চুপি বলিল, "তুই বল।" সহচরী তখন এক পা অগ্রসর হইল, গলা একটু পরিষ্কার করিয়া লইল; তা'রপর রাজার দিকে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "মহারাজ, আপনার বন্দী মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, আচারভ্রষ্ট—"

কথা কয়টা রাজার কাণে পঁহুছিল না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি বলছ আমি শুনতে পাচ্ছি না; একটু বড় গলায় বল।"

সঙ্গিনী তখন আরও দুই পা অগ্রসর হইল, গলাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া লইল; কিন্তু গলা বড় বেশী উঠিল না। সে বলিতে

লাগিল, "মহারাজ, এই ব্যক্তি—এই কালাচাঁদ রায় ব্রাহ্মণকুলে জন্ম-গ্রহণ করে আপনার শত্রু, দেশের শত্রু, মুসলমান-নবাবের দাসত্ব করছেন। নক্‌রির খাতিরে এই হিন্দুকুলধুরন্ধর ধর্ম্মত্যাগ করতেও পশ্চাৎপদ হ'ন নি। পৃথিবীতে এমন কোন পাপকার্য্য নেই, যা' এই ব্যক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত হ'তে পারে না। গৃহে ধর্ম্মশীলা জননী, পতিব্রতা ভার্য্যা, অক্ষুণ্ণ বংশমর্য্যাদা, সে সব পরিত্যাগ করেছে; মুসলমানী বিবাহ করে মুসলমান হয়েছে। তাই তাহার চরণস্পর্শে পবিত্র ক্ষেত্রভূমি কালিমায় আচ্ছন্ন হয়েছে, জগন্নাথদেবের মন্দির-চূড়া খসে পড়েছে। প্রজারঞ্জক মহারাজ, ছদ্মবেশী ধর্ম্মত্যাগী কাফেরকে শাস্তি দেও—সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা কর।"

কালাচাঁদের পরিচয় পাইয়া সভাসদ্ স্তম্ভিত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্দি, এ সকল কথা সত্য?"

কালাচাঁদ কোনও উত্তর করিলেন না। বক্ষের উপর বাহুদ্বয় বিন্যস্ত করিয়া একবার শুধু রাজার পানে গর্ব্বস্ফীত নয়নে চাহিলেন। এত গর্ব্ব রাজা কখনও মানুষের নয়নে দেখেন নাই। একজন সভাসদ্ বলিয়া উঠিল, "মহারাজা, এ মানুষ নয়—রাক্ষস; অচিরে নিপাত করুন।"

রাজা, মন্ত্রীর পানে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রি, কর্ত্তব্য কি?"

"ব্রাহ্মণ অবধ্য মহারাজ!"

"এ কি ব্রাহ্মণ?"

"এখনও ত গলায় উপবীত দেখ্‌ছি।"

"তবে কি কারারুদ্ধ করতে বল?"

"না মহারাজ, এ রাজ্যে এ দুর্জ্জনকে স্থান দেওয়া হতে পারে না!"

মুকুন্দদেব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সকলের পানে বারেক চাহিয়া দেখিলেন; কেহ কোনও পরামর্শ দিল না, বা পরামর্শ দিতে সাহস করিল না। সহসা তাঁহার নয়ন বেসর মহান্তির প্রতি পড়িল। মহান্তি তখন মুদ্রিত নয়নে একপাশে উপবিষ্ট ছিলেন। রাজা ডাকিলেন, "মহান্তি"!

মহান্তি চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে কর্ত্তব্য কি?"

"নির্ব্বাসন!"

"এ ত অতি সামান্য দণ্ড, মহান্তি মহারাজ!"

রাজার বাক্য অবসান হইতে না হইতে কালাচাঁদ বলিয়া উঠিলেন, "তুমিই বেসর মহান্তি? তুমি সেই পুণ্যময় দেবতা, ভক্তিমান্ মহাপুরুষ? তবে ত তোমায় আমার মনের কথা জানাতে হবে না। তুমি ত সকলি জান্‌ছ বুঝছ—বলে দেও ঠাকুর, কিসে আমার বাসনা পূর্ণ হবে?"

মহান্তি। উপায় ত দেখছি না, যুবক!

কালাচাঁদ। উপায় নেই? আমি বিনা কারণে, বিনা অপরাধে হিন্দু সমাজ হ'তে বিতাড়িত হব?

মহা। কারণ অকারণের বিচারকর্ত্তা ত আমি নই, যুবক!

কালা। ব্রাহ্মণ, আমার স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছ?

মহা। মহাপ্রভুর প্রসাদ হ'লে পারি? তাহা ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হ'লেও দূষিত হয় না।

কালা। আমি কি ম্লেচ্ছ?

মহা। তা' জানি না; তবে যে ব্যক্তি সমাজে স্থান হারিয়ে আশ্রয়ভিক্ষায় দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে আমি হিন্দু বলতে পারি না।

কালা। তুমিও এই কথা বললে মহান্তি? আমি যে তোমার স্থান অনেক উচ্চে দিয়েছিলাম।

মহা। আমি ক্ষুদ্র মনুষ্য মাত্র; আমার বুদ্ধি বিবেচনা অতি সামান্য।

কালা। তোমার বুদ্ধি বিবেচনায় কি অনুমিত হয়, আমি সমাজে স্থান পা'বার অনুপযুক্ত?

মহা। হাঁ?

কালা। হিন্দু বলে পরিচয় দিবারও অযোগ্য?

মহা। হাঁ।

কালা। বেশ, আজ হ'তে তবে আর আমি হিন্দু নই,—আমি ম্লেচ্ছ—কাফের—আমি মুসলমান। যে যজ্ঞোপবীত আমি ধর্ম্ম, অগ্নি, নারায়ণের সমক্ষে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা আজ ত্যাগ করিলাম।

বলিয়া তিনি কণ্ঠ হইতে উপবীত উন্মোচন করতঃ মহান্তির চরণ-সমীপে নিক্ষেপ করিলেন। তখন তাঁহার নয়নের এক প্রান্তে জল, অপর প্রান্তে অনল; জল সত্বর শুষ্ক হইল। তিনি উচ্চ, বিকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু স্মরণ রাখিও মহান্তি, এ পাপ তোমার। তুমি আজ একজন ব্রাহ্মণকে হত্যা করিলে—তা'র ইহকাল পরকাল কাড়িয়া লইলে। একদিন এর জন্যে তোমায় কাঁদিতে হইবে।"

পরে রাজার পানে ফিরিয়া বলিলেন, "আর যে নৃপতি এত বড় নিষ্ঠুর, অত্যাচারী, ধর্ম্মদ্রোহী তা'র রাজ্য অচিরে ধ্বংস হইবে।"

বলিয়া কালাচাঁদ কক্ষত্যাগ করিলেন। মন্ত্রী দনার্দ্দনের আদেশে চারিজন পাইক, কালাচাঁদকে রাজ্য-বাহিরে নির্ব্বাসিত করিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

কালাচাঁদ প্রস্থান করিলে পর ক্ষণকাল সভামধ্যে কেহ বাঙ্‌নিষ্পত্তি

করিল না। দনার্দ্দন অবশেষে বলিল, "রাজ-জামাতা ভাবিয়াছেন, তাঁহার নূতন কুটুম্বের ভয়ে আমরা অস্থির হইয়া পড়িব।"

রাজা। এ ব্যক্তিকে ছেড়ে দিয়ে ভাল হয়নি।

দনা। কেন মহারাজ?

রাজা। এ ব্যক্তি পাঠান-সৈন্য দেশে এনে অত্যাচার করতে পারে।

ভৃগুরাম নামধেয় একজন সভাসদ্ বলিল, "মশক-দংশনের আশঙ্কায় এত কাতর কেন মহারাজ?"

মহাস্থি বলিলেন, "মশক-দংশন নয় ভৃগুরাম! আমি দৃষ্টিহীন, দেখিতে পাইতেছি না; কিন্তু আমার মনে হয়, এই ব্যক্তির অভিসম্পাত সত্যে পরিণত হইবে।"

কথা কয়টা রাজার কাণে গেল না; তিনি তখন ব্রজবালাকে নির্ণিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। ব্রজবালার মুখের উপর তখন অবগুণ্ঠন নাই। সে তা'র সঙ্গিনীকে লইয়া ধীরে ধীরে বিচারালয় ত্যাগ করিল।

———

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"ওহে অশ্বারোহী, ওহে ঘোড়সওয়ার, দাঁড়াও।"

অশ্বারোহী শুনিল না, অথবা শুনিতে পাইল না; বিপরীত দিক্ হইতে অশ্ব ছুটাইয়া বেগে আসিতে লাগিল। বক্তা তখন পথমধ্যে দুই হাত তুলিয়া দাঁড়াইল। অশ্বারোহী তথাপি অশ্ববেগ সংযত করিবার কোনরূপ প্রয়াস পাইল না। বক্তা পুনরায় চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ঘোড়সওয়ার, দাঁড়াও।"

এবার অশ্ববেগ শিথিল হইয়া আসিল। নিকটস্থ হইয়া অশ্বারোহী জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি পথিক, আমার পথ রোধ করিতেছ?"

পথিক উত্তর করিল, "পথরোধ করিনি, ক্ষণকাল দাঁড়াতে বলছি।"

অশ্বারোহী দাঁড়াইল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। আকাশে পূর্ণচন্দ্র, পৃথিবীতে ফুটন্ত জ্যোৎস্না। মন্দিরের মাথায়, গাছের মাথায়, তৃণের মাথায়, সকলের মাথায় জ্যোৎস্না—পৃথিবী কৌমুদীবসনা। জ্যোৎস্নালোকে পথিক দেখিল, অশ্বারোহীর অঙ্গে যাবনিক পরিচ্ছদ। মূল্যবান্ পরিচ্ছদ বলিয়াই অনুমিত হইল। অশ্বারোহী জিজ্ঞাসা করিল, "পথিক, এখান হ'তে পুরী কতটা পথ?"

পথিক। দেখছি, আপনি মুসলমান, হিন্দুর তীর্থক্ষেত্রে আপনার প্রয়োজন কি?

অশ্বারোহী। হিন্দু রাজার সহিত সাক্ষাৎ করব।

প। রাজদর্শন! সাবধান, হিন্দুকে বিশ্বাস করবেন না।

অ। বিচিত্র কথা হিন্দুর মুখে শুনলাম।

প। আমি হিন্দু নই—আমি মুসলমান।

অ। মুসলমান?

প। হাঁ; আমার উপবীত দেখ্‌তে পাচ্ছেন কি?

অ। সকল হিন্দু ত উপবীত ধারণ করে না।

প। সকলে না করুক, আমি করেছিলাম; একদিন ব্রাহ্মণ বলেও পরিচয় দিয়েছিলাম। এখন আর আমি হিন্দু নই—আমি মুসলমান।

অ। সে সব কথা যাক্; এখন বল্‌তে পার পুরী কতদূর?

প। পদব্রজে আট দশ দণ্ড লাগতে পারে।

অ। আর অশ্বারোহণে?

প। অশ্ব আপনি পাচ্ছেন না।

অ। কেন বল দেখি?

প। অশ্বে আমার প্রয়োজন আছে।

অ। তা থাক্‌তে পারে, কিন্তু প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিরাশ হও।

প। অকারণ সময় নষ্ট হচ্ছে, আমায় সত্বর তণ্ডায় পঁহুছিতে হবে।

অ। আমিও সেই দিক হ'তে আসছি। পথে তোমার মত দুই চারি জন দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলাম। কিন্তু হাতে তরবারি থাক্‌তে—

প। আমি দস্যু? হাঁ দস্যুই বটে। এক্ষণে ধ্বংসই আমার কাজ। সাবধান যবন, অশ্ব ত্যাগ কর, নতুবা তোমার নিস্তার নেই।

অ। নিরস্ত্র পথিক, বৃথা দম্ভ—

প। আমি নিরস্ত্র নহি—অস্ত্র সংগ্রহ করেছি। কেমন করে শুন্‌বে?

রাজার চারিজন পাইক রাজ্য-বাহিরে আমায় রাখতে এসেছিল। আমি তা'দের নিকট একখানা অস্ত্র চাইলাম—কেহ দিল না; তখন একজনের নিকট হ'তে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে অপর কয়েকজনকে সংহার করলাম। এই দেখ, সে রক্তমাখা তরবারি।

বলিয়া পথিক বস্ত্রমধ্য হইতে তরবারি বাহির করিয়া দেখাইল। তদ্দৃষ্টে অশ্বারোহী স্বীয় কৃপাণ কোষমুক্ত করিয়া বলিল, "তবে সাধ্য থাকে আত্মরক্ষা কর।"

পথিক মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল, "বাতুল! কালাচাঁদ রায়কে কৃপাণ দেখাইতেছ?"

সবিস্ময়ে অশ্বারোহী বলিয়া উঠিল, "আপনি কালাচাঁদ রায়?"

"লোকে সেই নামে জানে বটে।"

"নবাবের জামাতা?"

"সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।"

অশ্বারোহী তখন অশ্বপৃষ্ঠ হইতে লম্ফত্যাগে ভূতলে পড়িলেন; এবং কালাচাঁদের সমীপস্থ হইয়া সসম্মানে বলিলেন, "ফৌজদার সাহেব, একদিন আপনার বন্দী হ'য়ে আপনার গৃহে অবস্থান করেছিলাম। মনে পড়ে কি? আপনার নিকট যে আতিথ্য, শস্ত্রশিক্ষা লাভ করেছি, তাহা বাঙ্গালায় কোথাও পাই নে। আপনি আমার জীবন, মান, ইজ্জত রক্ষা করেছেন; অবশেষে আমায় মুক্তি দিয়ে এসেছেন। ফৌজদার সাহেব, আপনি যা' করেছেন, তা' আমি কখন বিস্মৃত হব না।"

কালাচাঁদ যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "অস্পষ্ট আলোকে আপনাকে আমি চিন্‌তে পারি নি—ক্ষমা করবেন।"

"ফৌজদার সাহেব, আপনার নিকট আর আমি পরিচয় গোপন করব না,—আমি অতি হতভাগ্য—আমি সুলতান ইব্রাহিমের পুত্র।"

"আপনি সেই রাজ্যভ্রষ্ট নরপতির পুত্র করিম সা? সুলতান, আমার সেলাম গ্রহণ করুন।"

"ফৌজদার সাহেব, দোস্ত, তোমার নিকট আমি সুলতান বা বাদশাহ্ নই—আমি করিম সা মাত্র। যতদিন করিম জীবিত থাক্‌বে, ততদিন সে তোমার নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ থাক্‌বে। তোমাকে দেবার আমার কিছুই নেই—রাজ্যধন সব গিয়েছে। যা' আছে তা' দিতে চাই; আমার স্নেহ-প্রীতি নেবে কি ভাই?"

"আপনার অনুগ্রহ যথেষ্ট।"

"তবে ভাই আমার প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ এই অশ্বটি গ্রহণ কর।"

কালাচাঁদ এক পা পিছাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি হয়, আপনি কিরূপে যাবেন?"

করিম সা। পদব্রজে।

কালাচাঁদ। কোথায় যাবেন?

করি। রাজ-সন্নিধানে।

কালা। কেন জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি?

করি। আমার তরবারি তাঁকে দিতে।

কালা। বাঙ্গালায় আসুন না কেন?

করি। আবার বাঙ্গালায়?

কালা। পূর্ব্বে আপনার পরিচয় আমরা জান্‌তুম না।

করি। এখন পরিচয় পেলে আপনার নবাব আমায় কোতল কর্‌বেন।

কালা। আমি থাক্‌তে আপনার কোনও ভয় নেই।

করি। নিশ্চিন্ততাও নেই; সলিমন যে আমার পিতৃবৈরী।

কালাচাঁদ ভাবিয়া দেখিলেন, কথাটা ঠিক। সুতরাং নিরুত্তর

রহিলেন। করিম সা বলিলেন, "তবে এখন চলিলাম, ফৌজদার সাহেব! জীবনে হয়ত আর সাক্ষাৎ ঘটিবে না।"

বলিয়া তিনি পদব্রজে পুরীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কালাচাঁদও আর কালক্ষেপ না করিয়া অশ্বারোহণ করিলেন।

---

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

---

সমুদ্র-সৈকতে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর। অনন্তের ভালে বিন্দুমাত্র। সেই কুটীর-সম্মুখে ব্রজবালা বালুকার উপর উপবিষ্টা। তখন অপরাহ্ণ। পার্শ্বে সঙ্গিনী নির্ম্মলা। নির্ম্মলার একটু পরিচয় প্রয়োজন। নির্ম্মলা গৃহস্থকন্যা—মাতৃহীনা—বালবিধবা। বৃদ্ধ পিতা পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন; কিন্তু বালিকা কন্যার আর বিবাহ হইল না। পিতৃগৃহে সে দাসী হইয়া রহিল। বয়সের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা বাড়িতে লাগিল; তখন তৃপ্তির আশায় চারিদিকে চাহিতে লাগিল। এমন সময় ব্রজবালাকে সে অতিথিরূপে তাহাদের শান্তিশূন্য গৃহে পাইল। ব্রজবালা তখন বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া উড়িষ্যার পথ ধরিয়াছে। নির্ম্মলার গৃহত্যাগ করিয়া ব্রজবালা আবার যখন পথ চলিতে লাগিল, তখন নির্ম্মলাও তাহার অনুবর্ত্তিনী হইল। নির্ম্মলা দুশ্চারিণী না হইলেও ব্রজবালার ন্যায় কুলত্যাগিনী।

নির্ম্মলা বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা; সুশ্রী ও যুবতী। তবে ব্রজবালার

রূপের কাছে—ভানুপার্শ্বে খদ্যোৎপ্রায়। বুদ্ধি বা শিক্ষাতেও ব্রজবালার সহিত কোন অংশে উপমিত হইতে পারে না।

সমুদ্র-সৈকতে পাশাপাশি বসিয়া নির্ম্মলা, ব্রজবালাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এইবার ত তোমার উড়িষ্যার কাজ ফুরাল ?"

"আরম্ভ হ'ল বল।"

"সে কি ?"

"মুসলমান কালাচাঁদ এবার প্রতিশোধ নিতে উড়িষ্যায় আস্‌বে।"

"কি রকমে ?"

"সৈন্য-সামন্ত নিয়ে।"

নির্ম্মলা ভীত হইয়া পড়িল। সে একটু ভীরু-স্বভাবাপন্না। রক্ত দেখিলেই তার সাহস তরসিত হয়। তবে মাছ কুটিবার সময় অজস্র রক্তপাত দৃষ্টেও তা'র চিত্তবিকার ঘটিত না। মশকের রক্ত দৃষ্টেও সে ভীত হইত না। কিন্তু মানুষের রক্ত দর্শন সে কখন করে নাই; তবে রক্তারক্তি, যুদ্ধবিগ্রহের গল্প অনেক শুনিয়াছে। সে ক্ষণকাল মৌনী থাকিয়া বলিল, "আগুন ত জ্বেলেছ, এখন সরে পড়া ভাল।"

"আর আগুন যদি নিবে যায় ?"

নির্ম্মলা কথাটা ঠিক বুঝিল না; জিজ্ঞাসা করিল, "নিব্‌বে কিরূপে ?"

ব্রজবালা। উভয় দলে সন্ধি হ'তে পারে।

নির্ম্মলা। তা' তুমি থেকে কি কর্‌বে ?

ব্র। আমি সন্ধি হ'তে দেব না।

নি। তুমি ? তুমি সন্ধি রোধ কর্‌বে ?

ব্র। হাঁ, আমিই কর্‌ব।

নির্ম্মলা একটু হাসিল। ব্রজবালা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "নির্ম্মলা,

তুমি আমায় অল্পদিন দেখেছ, আমার শক্তির পরিচয় পাওনি। ক্ষেত্র অভাবে আমার শক্তি সুপ্ত রয়েছে।”

নি। তোমার শক্তির বেশ পরিচয় পেয়েছি ; তুমি না সেদিন বিচার-গৃহে ঘোম্‌টা টেনে আমার পিছনে লুকিয়েছিলে ?

ব্র। কি জানি কেন সেদিন আমার ক্ষণিক দুর্ব্বলতা এসেছিল—

নি। দুর্ব্বলতাই স্ত্রী-সুলভ—তোমার প্রকৃতিগত।

ব্র। না, তা নয়। একদিন দেখ্‌বে উড়িষ্যার রাজা, রাজ্য আমার পদতলে লুণ্ঠিত হচ্ছে।

নি। তোমার বাসনা কি উড়িষ্যা-ঈশ্বরি ? ভেবেছ কি উড়িষ্যায় রূপের অভাব ?

ব্র। নির্ম্মলা, তুমি মূর্খ।

নি। নিশ্চয়।

ব্র। পৃথিবীতে একটা বই দু'টা ব্রজবালা নেই। যার বুদ্ধির শক্তি আছে, রূপের যৌবন আছে, সে কোনও কালে সম্বলশূন্যা নয়, নির্ম্মলা সুন্দরি !

নি। তুমি কতদিন গৃহত্যাগ করেছ ব্রজবালা ?

ব্র। তিন চার বৎসর হবে।

নি। এর মধ্যে অনেক শিখেছ।

ব্র। গৃহেই শিক্ষা হয় ; কোমল হৃদয়ে যে অঙ্কপাত হয়, তাহা সহজে মুছে না। আমার জীবন-কাহিনী শুন্‌বে ?

ব্রজবালার চিন্তাস্রোত ফিরিল। একটা তরঙ্গ ফেনমালা মাথায় বাঁধিয়া নাচিতে নাচিতে ব্রজবালার চরণ চুম্বন করিতে আসিতেছিল। সহসা অপর একটা বিপুলকায় তরঙ্গ তাহার উপর পড়িয়া তাহাকে দলিয়া মারিল। ব্রজবালা দেখিল, প্রথম তরঙ্গের চিহ্নমাত্র নাই। বলিল,

"নির্ম্মলা, তুমি কুরূপা নও, আমার চেয়ে বয়সে ছোট নও—তুমি আমার মনের ভাব কতকটা বুঝতে পারবে। বাল্যকালে আমার জ্ঞান হ'তে না হ'তেই আমি শুনতে লাগলাম, আমি পরম রূপসী। যে দেখ্‌ত, সেই বল্‌ত, 'কি সুন্দর মেয়ে।' কেউ বল্‌ত, 'ডানাকাটা পরী।' আমার বয়স যত বাড়্‌তে লাগল, ততই আমি চারিদিক্ হ'তে আমার রূপের পূজা পেতে লাগ্‌লাম। আমি যা' চাহিতাম, তাই পেতাম; আমার ইচ্ছার গতি কেহ রোধ করত না—"

এমন সময় একটা তরঙ্গ আছাড় খাইয়া ব্রজবালার চরণসমীপে পড়িল। বারিকণা ব্রজবালা ও নির্ম্মলার দেহ সিক্ত করিল। ব্রজবালা গ্রাহ্য করিল না; নির্ম্মলা সমুদ্রকে গালি দিতে দিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। সমুদ্র শুনিল কিনা জানি না, কিন্তু সে আবার একটা তরঙ্গ পাঠাইয়া ব্রজবালার চরণ সিক্ত করিল। এবার ব্রজবালা উঠিল। নির্ম্মলা বলিল, "দেখ্‌লে? যে উচ্ছৃঙ্খল তা'র উপর আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা বৃথা।"

ব্রজবালা মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল, "কেন, বল না কেন, রূপের পদ-চুম্বন করিতে অনন্ত বারিধিও ছুটে আসছে।"

আবার একটা তরঙ্গ ঘোর গর্জ্জনে ছুটিয়া আসিয়া ব্রজবালার চরণতলে আছাড় খাইয়া পড়িল। ফেনময় তরঙ্গ সরিয়া গেল; কিন্তু বালুকার উপর একটা ক্ষুদ্র মৎস্য রাখিয়া গেল। ব্রজবালা ছুটিয়া গিয়া মাছটাকে ধরিল। নির্ম্মলা বলিল, "ছেড়ে দেও।"

ব্রজ। সমুদ্রের দান ফিরাতে পারি না।

নির্ম্ম। মাছ খাবে নাকি?

ব্রজ। না; ফলের আশায় বীজ পুঁতব।

বলিয়া ব্রজবালা সেই জীবন্ত মৎস্যকে বালুকার মধ্যে প্রোথিত করিল। নির্ম্মলা শিহরিয়া উঠিল।

এমন সময়ে একজন রাজকর্ম্মচারী সমীপস্থ হইয়া ব্রজবালাকে নমস্কার করিল। ব্রজবালা বা নির্ম্মলা পূর্ব্বে তাহাকে লক্ষ্য করে নাই। এক্ষণে সহসা তাহাকে পার্শ্বে দেখিয়া উভয়ে একটু অপ্রতিভ হইল এবং মাথার কাপড় লইয়া নাড়াচাড়া করিল। কর্ম্মচারী বলিল, "মা ঠাক্‌রুণ, মহারাজ আপনাকে স্মরণ করেছেন।"

ব্রজবালা সহসা কোন উত্তর করিল না। সমুদ্র-পানে চাহিয়া কি ভাবিল; অধরপ্রান্তে একটু হাসিও ভাসিয়া গেল। তা'রপর কর্ম্মচারীর দিকে না ফিরিয়া উত্তর করিল, "মহারাজকে আমার সম্মান জানিয়ে বল্‌বেন, আমি কুলকামিনী,--তাঁহার সহিত সাক্ষাতে অসমর্থ।"

কর্ম্মচারী প্রস্থান করিল। ব্রজবালা ও নির্ম্মলা আবার সৈকতভূমে উপবেশন করিল। নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো উড়িষ্যার রাণি, আমার সঙ্গে আর কথা টথা কবে কি?"

"নির্ম্মলা!"

"তবে বাল্য-কাহিনীটা বল্‌তে থাক।"

"আজ আর নয়।"

"তবে আমি গান গাই?"

"গাও।"

নির্ম্মলা গান ধরিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সূর্য্যদেব অস্তমিত। চন্দ্রদেব উদিত-প্রায়। তারকাসুন্দরী গৃহ-দ্বার খুলিয়া নিস্ক্রান্ত হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। বারিধি সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছেন। সন্ধ্যারাণী অবসাদের সুর ধরিলেন। সেই সুরে সুর মিশাইয়া নির্ম্মলা গান ধরিল,—

বহুদূর হতে, সলিল বহিয়া, আনিনু যতনে কলসী কলসী করি।
মরুতে ছিটাব, পল্লব রোপিব, কুসুম ফোটাব প্রাণে কত আশা ধরি॥

সাগর শুকাল, মরু না তিতল, সকলি বিফল হল গো সাধ।
যাহারে তুষিতে, এতই যতন, সেই অবশেষে সাধিল বাদ।

গান শেষ করিয়া নির্ম্মলা বলিল, "এবার তুমি একটা গাও।"

ব্রজবালা গান ধরিল। তখন চাঁদ আকাশে উঠিয়া অস্তগত ভানুর পানে উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। ব্রজবালা পণ্ডিতা, তিনি সহজ গান ধরিলেন না। বিদ্যাপতি কিছুদিন পূর্ব্বে যাহা গাহিয়াছিলেন, ব্রজবালা সুরলয় সংযোজন করিয়া তাহাই গাহিলেন,—

"সখি হে কাহে কহসি কটুভাষা।
ঐছন বহুগুণ, একদোষ নাশই,
এক গুণে বহু দোষ নাশা॥
কি করব জপ-তপ, দান ব্রত নৈষ্ঠিক,
যদি করুণা নহি দীনে।
সুন্দর, কুল, শীল, ধন, জন, যৌবন,
কি করব লোচন হীনে॥
গরল সহোদর, গুরুপত্নীহর,
রাহুবমন তনুকারা।
বিরহ হুতাশন, বারিদ নাশন,
শীলগুণে শশী উজিয়ারা॥

গীত শেষ হইতে না হইতে অদূরে রাজকর্ম্মচারী পুনরায় দর্শন দিল। তবে এবার একা নয়,—সঙ্গে দুইজন স্ত্রীলোক, পশ্চাতে একখানি শিবিকা। কর্ম্মচারী অগ্রসর হইয়া বলিল, "রাণি-মা, আপনার জন্যে মহারাজ দোলা প্রেরণ করেছেন।"

ব্রজবালা ধীরভাবে, মৃদুকণ্ঠে উত্তর করিল, "আমি রাজদর্শনে আসিনি —দেবদর্শনে এসেছি।"

কর্ম্মচারী ফিরিয়া গেল। পরদিন প্রাতে একজন ব্রাহ্মণ সঙ্গে লইয়া আবার আসিল। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মা, দেবদর্শনে চলুন।"

ব্রজবালা এবার বিনাবাক্যব্যয়ে নির্ম্মলাকে সঙ্গে লইয়া চলিল; এবং ক্ষেত্রধামের সমস্ত দেব-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া অপরাহ্ণে ফিরিল। পথে ও মন্দিরে রাজাকে দুইবার দেখিয়াছিল। রাজা প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছিলেন; ব্রজবালা তাঁহাকে দেখিয়াও দেখে নাই।

পরদিন সন্ধ্যাকালে কর্ম্মচারী পুনরায় শিবিকা লইয়া আসিল; বলিল, "রাণি-মা, মহারাজ আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী।"

ব্রজবালা উত্তর করিল, "কিন্তু আমি তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী নই। যাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী ছিলাম, তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছি।"

কর্ম্মচারী ফিরিয়া গেল—আর আসিল না। কিন্তু এবার রাজা মুকুন্দদেব স্বয়ং আসিলেন। তদ্দৃষ্টে ব্রজবালা গৃহত্যাগ করিয়া দূরে সৈকত-ভূমে বসিল। রাজা অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তিনি নিরস্ত বা নিবৃত্ত হইলেন না।

---

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"বাঙ্‌লার নবাব, শাহন সাহ্‌ বাদশা!"

"কি পুত্র কালাচাঁদ?"

"আমি ইস্‌লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করে আপনার চরণ-বন্দনা করতে এসেছি।"

"বহুত খোব, বহুত খোব, আমি বড় খুসী হলাম। আমি তোমাকে বহুৎ এমাম ও জায়গীর দেব।"

"বাদশা, আপনার অনুগ্রহ যথেষ্ট!"

"আমি তোমাকে পাঁচ হাজার সেনার অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিলাম।"

কালাচাঁদ ভূমি স্পর্শ করিয়া সেলাম করিতে করিতে বলিলেন, "পুত্রের প্রতি বাদশার অসীম দয়া। কিন্তু সেনা লইয়া কি করিব, যদি কার্য্যক্ষেত্র না পাই?"

নবাব। উপযুক্ত ক্ষেত্র খুঁজে লও।

কালাচাঁদ। বহুৎ খোব। আমি বাসনা করছি, উড়িষ্যা জয় করব।

ন। উড়িষ্যা-জয়?

কা। হাঁ, জাঁহাপনা।

ন। তা' ত সম্ভব নয়, বাচ্ছা!

কা। কেন জনাব?

ন। কেন শুনবে? আমার বিশ্বাস উড়িষ্যা অপরাজেয়। তবে যদি তা'দের মধ্যে গৃহ-বিচ্ছেদ ঘটে, তবে আমি উড়িষ্যা-জয়ের ভরসা করতে পারি। নতুবা নয়—কিছুতেই নয়—এমন কি দিল্লীশ্বরের সেনা নিয়েও নয়।

কা। জাঁহাপনা অবশ্য আমার চেয়ে ভাল জানেন; কিন্তু কৃষ্ণ রায় কি ইসমাইল গাজির হস্তে পরাস্ত হ'ন নাই?

ন। না হ'ন নাই। কৃষ্ণ রায় যখন উড়িষ্যায় ছিলেন না, তখন ইসমাইল গাজি তস্করের ন্যায় চুপি চুপি আসিয়া কটক, পুরী লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। তা'রপর কৃষ্ণ রায় উড়িষ্যায় ফিরিয়া আসিয়া ইসমাইলকে গলা টিপিয়া বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তুমি সে সকল কথা জান না, কালাচাঁদ; উড়িয়াদের মত দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা বাঙ্গালায় দেখি নাই। আজ তিন শত বর্ষ ধরিয়া কত বড় বড় তাতার যোদ্ধা, কত সুলতান বাদশা তাহাদের দেশ জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তা' কেহ কিছু করিতে পারেন নাই। তা'রাই বরং আমাদের রাজ্য, রাজধানী লুণ্ঠন করিয়াছে। তাই বলি, উড়িষ্যা-বিজয় অসম্ভব।

কা। চেষ্টা করিতে আপত্তি কি?

ন। পরাজয়ের অপমান আমি সহ্য করিতে পারিব না।

কা। আপনি কি অবগত আছেন যে, আপনাকে ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে সম্রাট আকবর সাহ, উড়িষ্যাধিপতির সহিত সন্ধি স্থাপন করিতেছেন?

ন। কই, এমন কথা ত আমি শুনি নাই।

এমন সময় নবাব-পুত্র দাউদ খাঁ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "কথাটা সত্য। আমি উজীর খাঁ জাহানের নিকট শুনেছি, আকবর সাহ একজন দূত মুকুন্দদেবের নিকট প্রেরণ করেছেন; দূতের নাম হাসান খাঁ।

নবাব বলিলেন, "তবেই ত বড় চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। উজীর ও সেনাপতিকে ডাক্‌তে পাঠাও।"

অচিরে উভয়ে আসিয়া অভিবাদন করিলেন। উজীরের নিকট সকল কথা অবগত হইয়া নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে কর্ত্তব্য কি?"

সেনাপতি কতলু খাঁ উত্তর করিলেন, "আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে আক্রমণ করাই যুক্তিসঙ্গত।"

দাউদ খাঁ বলিলেন, "আমারও সেই মত; দুই দল সম্মিলিত হইলে আমাদের বিনাশ অনিবার্য্য।"

নবাব কোনও উত্তর করিলেন না। উজীর সাহেব, সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উড়িষ্যা-বিজয়ে কত সৈন্যের প্রয়োজন, সেনাপতি সাহেব?"

কতলু খাঁ উত্তর করিলেন, "উড়িষ্যাধিপতির সৈন্য অনেক; তাহারা ভীরু বা দুর্ব্বল নহে। পাঁচ লক্ষ সেনার কম উড়িষ্যা-বিজয় অসম্ভব।"

উজীর কহিলেন, "পাঁচ লক্ষ সৈন্য আমাদের নাই, অতএব যুদ্ধ বিগ্রহের কথা আর তুলিবেন না।"

সুলতান বলিলেন, "আর তুমি কালাচাঁদ, কত সেনা নিয়ে উড়িষ্যা জয় করতে পার?"

কালাচাঁদ উত্তর করিলেন, "সুলতান, আমি কখন যুদ্ধ করি নি; তবে আমার বিশ্বাস, সুলতানের একজন সেনার সমকক্ষ দশজন হিন্দু নয়।"

সুলতান, উজীরের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "উজীর সাহেবের কি অভিপ্রায়?"

উজীর। জাঁহাপনা, আমার বিবেচনায় যুদ্ধ অকর্ত্তব্য। সুপ্ত ব্যাঘ্রকে অনর্থক জাগাবার প্রয়োজন নেই।

নবাব চিন্তামগ্ন হইলেন। তদ্দৃষ্টে কালাচাঁদ একটু তেজের সহিত বলিলেন, "সুলতান, আপনি যখন মুঙ্গের-প্রান্তরে দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন ত আপনার এত দ্বিধা সঙ্কোচ ছিল না; আবার যখন মুষ্টিমেয় সৈন্যসহ বেহার হইতে শ্যেনপক্ষীর ন্যায়

আসিয়া বাঙ্গালা জয় করেন, তখন ত আপনার এ ইতস্তত ভাব ছিল না। আজ আপনার এ দুর্ব্বলতা কেন? আপনি বিস্মৃত হইতেছেন, আপনার তরবারিতে শক্তি কত। যিনি পর্ব্বত লঙ্ঘনে সমর্থ, তিনি ক্ষুদ্র বল্মীক দেখিয়া পশ্চাৎপদ হইতেছেন। সুলতান, আর দ্বিধা করিবেন না,— সম্মুখে যশঃ, রাজ্য, বিজয়লক্ষ্মী; আর নির্জীব বৃদ্ধ উজীরের পরামর্শ লইয়া নিশ্চেষ্ট থাকুন, অচিরে হিন্দু ও মোগল-সৈন্য মধ্যে পিষ্ট হইয়া ধ্বংস হইবেন।"

সুলতান উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "না, না, আর আমার দ্বিধা, সঙ্কোচ নাই—আমি কীর্ত্তিকে বরণ করিলাম। কালাচাঁদ, প্রস্তুত হও, আমি তোমাকে এই যুদ্ধের সেনাপতি-পদে বরণ করিলাম; কতলু খাঁও তোমার সঙ্গে থাকিবেন। কিন্তু তোমাকে আমি এক লক্ষের অধিক সৈন্য দিতে পারিব না।"

কালাচাঁদ। একলক্ষ সৈন্য লইয়াই সুলতানের কার্য্য সম্পন্ন করিব।

কতলু খাঁ একটু হাসিলেন। উজীর মুখ ফিরাইলেন। নবাব বলিলেন, "কালাচাঁদ, তুমি হিন্দু হইয়া হিন্দুরাজ্য ধ্বংস করিতে সমুদ্যত হইয়াছ; তাই তোমাকে আজ একটা নূতন উপাধি দিলাম,—তোমাকে আজ হ'তে লোকে ইল্লাহাবাদ কালাপাহাড় বলিয়া জানিবে। প্রার্থনা করি, তোমার এই নূতন নাম বাঙ্গ্‌লায় অক্ষয় অমর হউক।"

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

"বুনা!"

"কি প্রভু?"

"তোমাকে একটা দুঃসংবাদ দেব।"

"আজ আপনি নির্ব্বিঘ্নে দেশে ফিরে এসেছেন, আজ ত কোন সংবাদই দুঃসংবাদ হ'তে পারে না।"

কালাচাঁদ নিরুত্তর হইলেন; কি বলিতে যাইতেছিলেন তাহা আর বলিতে পারিলেন না। বাক্‌পটু মহাবীর ক্ষুদ্র বালকের সম্মুখে মূক হইলেন। তিনি দুই এক পা হটিয়া অবশেষে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

যখন কালাচাঁদ সুলতানের অনুমতি লইয়া উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন বুনা, কালাচাঁদের সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল; কিন্তু কালাচাঁদ তাহাকে সঙ্গে লয়েন নাই। বুনা একা সেই শূন্য অট্টালিকায় পড়িয়া রহিল। দিনের পর দিন গড়াইয়া চলিল। বুনা দিবসের অধিকাংশ সময় দ্বারে বসিয়া কালাচাঁদের প্রতীক্ষায় কাটাইত; নিশাকালে শয়নকক্ষের দ্বারে হর্ম্ম্যতলে শয়ন করিয়া কোন রকমে যামিনী অতিবাহিত করিত। কোন কোন দিন বুনা নানারকম আহার্য্য উৎসাহ সহকারে প্রস্তুত করিত; এবং পূর্ব্বে যেমন স্থান করিয়া পাত্রে পাত্রে অন্নব্যঞ্জন রক্ষা করিয়া দূরে বসিয়া থাকিত, সেইরূপ অন্নব্যঞ্জন সাজাইয়া যথাস্থানে রক্ষা করিয়া

নিমীলিত-নেত্রে গৃহকোণে বসিয়া থাকিত, দণ্ডের পর দণ্ড অতিবাহিত হইয়া যাইত, বুনা সেই একই ভাবে বসিয়া থাকিত। অবশেষে সন্ধ্যা-সমাগমে সেই অন্নব্যঞ্জন নদীতে ফেলিয়া দিয়া নিজে অনশনে নিশি কাটাইত।

বুনা কোন কোন দিন সায়ংকালে কালাচাঁদের জন্য শয্যা রচনা করিত; এবং দীপ জ্বালিয়া হর্ম্ম্যতলে বসিয়া পুরাণ পাঠ করিত, পাঠ করিতে করিতে কোন কোন দিন ঘুমাইয়া পড়িত। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া পুঁথি তুলিত, শয্যা গুটাইত।

একদিন বুনা নিশিশেষে স্বপ্ন দেখিল, কালাচাঁদ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, আবার তাহাকে আদর করিয়া মাথায় হাত বুলাইতেছেন, বুনার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বুনা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং নগরের দক্ষিণ দ্বার-পথে গিয়া বসিল। বেলা এক প্রহরের সময় বুনা দেখিল, কালাচাঁদ অশ্ব ছুটাইয়া নগরে প্রবেশ করিতেছেন। জনাকীর্ণ নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া কালাচাঁদ অশ্ববেগ সংযত করিলেন। বুনা তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া দেখিল, কালাচাঁদ এক মোল্লার গৃহে প্রবেশ করিলেন। বুনা দ্বার-সন্নিকটে অপেক্ষা করিতে লাগিল। কালাচাঁদ যখন গৃহনিষ্ক্রান্ত হইলেন, তখন তাঁহার মুখের ভাব অতি ভয়ঙ্কর,—মেঘ ও ঝড়ে মুখখানি ভরা। তদ্দৃষ্টে বুনা তাঁহার সম্মুখীন হইতে আর সাহস করিল না। কালাচাঁদ কোনও দিকে না চাহিয়া প্রস্থান করিলেন। বুনা মোল্লার গৃহে প্রবেশ করিল।

সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া বুনা, কালাচাঁদের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। কালাচাঁদের আসিতে মধ্যাহ্ন অতীত হইল। প্রাঙ্গণে অশ্বপদশব্দ শুনিয়া বুনা বুঝিল, কালাচাঁদ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তখন সে ঝটিতি উঠিয়া গিয়া কালাচাঁদের চরণমূলে প্রণত হইল।

কালাচাঁদ, বুনার মস্তকে হস্তবিমর্ষণ করিয়া আদর করিলেন। বুনা সকল দুঃখ বিস্মৃত হইল।

কালাচাঁদ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, দ্রব্য সম্ভার যথাযথ স্থানে বিন্যস্ত রহিয়াছে। শয্যা পূর্ব্ববৎ রচিত রহিয়াছে; পুঁথিগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—সযতনে সংরক্ষিত। পট্টবস্ত্র, নামাবলী, জপের মালা যথাস্থানে বিলম্বিত। কালাচাঁদ পলকশূন্য নয়নে স্বীয় অস্থিতুল্য প্রিয় জপের মালা পানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার বুকের ভিতর একটা ঝড় বহিয়া গেল; তিনি অস্থিরচিত্তে শয্যার উপর বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "বুনা, দুঃসংবাদের কথা শুনবে?"

বুনা। আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি প্রভু, আজিকার দিনে কোন সংবাদই দুঃসংবাদ হ'তে পারে না।

কালা। শুন বুনা, তুমি জান না, আমি কি সর্ব্বনাশ করেছি।

বুনা। কি করেছেন?

কালা। আমি মু—মুসল—মুসলমান হয়েছি।

বুনা। বেশ করেছেন।

কালা। বেশ করেছি! তুমি হয়ত আমার কথাটা বুঝলে না বুনা! আমি বলছি যে, আমি হিন্দুধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করেছি।

বুনা। তাতে হয়েছে কি? আপনি ত আর ধর্ম্মত্যাগ করেন নি—বাসগৃহ পরিবর্ত্তন করেছেন মাত্র।

কালা। তুমি এ কি বলছ বালক? আমি ধর্ম্মত্যাগ করিনি?

বুনা। না। আপনি সাধনার—আপনার উপাস্য-দেবতার বিভিন্ন নামকরণ করেছেন মাত্র। হরি না বলে আল্লা বলছেন—গীতা পাঠ না করে কোরাণ পাঠ করছেন। ধর্ম্মত্যাগ কোথায় হ'ল?

কালা। কে তুমি মহান্ শিক্ষাদাতা! ভৃত্যবেশে এসে আমার চক্ষু ফুটালে, আমায় শাস্তি দিলে। এস বালক, এস শাস্তিদাতা, আমার হৃদয়ে এস।

কালাচাঁদ বাহুপ্রসারণ করিলেন। বুনার মুখ আরক্তিম হইল, দেহ কাঁপিয়া উঠিল। বুনা আগ্রহভরে দেহ একটু বাড়াইয়া দিল। পরক্ষণেই আবার পিছাইয়া আসিল; এবং কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "প্রভু যাহা শিখিয়েছেন, ভৃত্য তাহাই তাঁহাকে স্মরণ করিয়া দিতেছে।"

বুনা প্রস্থান করিল; এবং তৎপরতা সহকারে আহারের স্থান করিল। থালিতে অন্নব্যঞ্জনাদি সাজাইয়া দিয়া কালাচাঁদকে ডাকিল। কালাচাঁদ আহারে বসিয়া প্রথমেই গণ্ডূষ করিলেন। সহসা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, তিনি আর হিন্দু নহেন। কালাচাঁদ ঝটিতি গণ্ডূষ দূরে নিক্ষেপ করিয়া হস্ত প্রক্ষালন করিলেন। বুনা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিল, কিন্তু কিছু বলিল না। কালাচাঁদ যখন দেখিলেন, বুনা কিছু বলিল না, তখন তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন, "দেখ বুনা, যে ধর্ম্ম অবলম্বন করা যায়, সে ধর্ম্মের নিয়মাদি পালন করা কর্ত্তব্য।"

বুনা তথাপি নিরুত্তর। তাহার বুকের ভিতর একটা ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল। কিন্তু কালাচাঁদের তখন কাণ ছিল না—তিনি সে রোল শুনিতে পাইলেন না। তিনি ক্ষণকাল স্থির নীরব থাকিয়া একটু বিরক্তি-সহকারে বলিলেন, "বল না বুনা, অনিবেদিত অন্ন কিরূপে গ্রহণ করি?"

বুনা। নিবেদন করবেন বই কি!

কালা। নারায়ণকে দিতে পারছি কই?

বুনা। আল্লাকে দিন, নারায়ণের কাছে পৌঁছবে; অথবা নারায়ণকে দিন, আল্লা গ্রহণ করবেন।

কালাচাঁদ বিমুগ্ধচিত্তে বুনার পানে চাহিয়া রহিলেন। বুনা অবনত-বদনে দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। কালাচাঁদ বলিলেন, "বুনা, তুমি কি সত্যই বালক? অনেক প্রবীণের মুখেও যে এমন কথা শুন্‌তে পাওয়া যায় না।" বুনা নিরুত্তর রহিল। কালাচাঁদ অবশেষে আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। আহার করিতে করিতে কালাচাঁদ বলিলেন, "দেখ, বুনা, তোমাকে দেখ্‌লে—জানিনা কেন—আমার প্রথম যৌবনের একটা কথা মনে পড়ে। সে কথা আমি কিছুতেই বিস্মৃত হ'তে পারছি না।"

বুনা। সেটা এমন কি কথা?

কালা। আমি একটী নিরপরাধা বালিকাকে ত্যাগ করে এসেছি।

বুনা। সে কে?

কালা। সে আমার স্ত্রী—আমার সহধর্ম্মিণী। তা'কে উপেক্ষাভরে ত্যাগ করে এসেছি; এ চিন্তা শত বৃশ্চিক-দংশনের ন্যায় নিয়ত আমাকে দগ্ধ করছে।

বুনা। নিশ্চয় তা'র কোনও অপরাধ ছিল, নতুবা আপনি তাকে ত্যাগ করবেন কেন?

কালা। তা'র কোনও অপরাধ ছিলনা বুনা! সে নিষ্কলঙ্ক, নিরপরাধ। আমি তখন রূপান্ধ ছিলাম—আমি মাধুর্য্যকে ছাড়িয়া তখন সৌন্দর্য্যকে বরণ করিয়াছিলাম।

বুনা। যাক্ ও-সব কথায় এখন প্রয়োজন নেই—আহার করুন।

কালাচাঁদ ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভোজন শেষ হইয়া আসিলে কালাচাঁদ বলিলেন, "দেখ বুনা, আমার মত দুঃখী সংসারে নাই। আমি যাহাকে ধরিয়াছি, তাহাকেই অবশেষে ত্যাগ করিতে হইয়াছে। যাহাকে রত্নভ্রমে হৃদয়ে ধরিয়াছিলাম তাহাকে ঘৃণা পদার্থ বোধে দূরে পরিহার করিতে হইয়াছে। আবার দেখ, আজীবন পুষ্ট ভালবাসা দিয়া যে

নারায়ণের পূজা করিয়া আসিতেছিলাম, তাঁহাকেও ত্যাগ করিতে হইল। এখন বুনা, আমার আর কিছু নাই—শুধু তুমি আছ—এবার তোমাকেও ত্যাগ করিতে হইবে।"

বুনা স্তম্ভিত হইল। রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমাকে ত্যাগ করবেন কেন, প্রভু?"

কালা। বুনা, অধীর হয়ো না—বুঝে দেখ—এখন তোমার আমার মধ্যে সমুদ্র ব্যবধান।

বুনা। কে—ন?

কালা। ধর্ম্মের ব্যবধান তুল্য ব্যবধান নেই, তুমি হিন্দু, আমি মুসলমান—মধ্যে অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর; তুমি আর আমার কাছে থাক্‌তে পার না।

বুনার মুখ প্রফুল্ল হইল। সে এবার কণ্ঠস্বরও খুঁজিয়া পাইল; বলিল, "আমিও ত মুসলমান হয়েছি।"

কালাচাঁদ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি মুসলমান হয়েছ বুনা?"

কালাচাঁদের কণ্ঠ হর্ষ-বিমিশ্র। বুনা তাহা লক্ষ্য করিল; বলিল, "হয়েছি—আজই হয়েছি; আপনি যে মোল্লার নিকট ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেছেন, আমিও তাঁর নিকট দীক্ষিত হয়েছি।"

কালাচাঁদের প্রফুল্লতা নিবিয়া গেল; তিনি বলিলেন, "কেন এমন কাজ করলে বুনা?"

বুনা তাহার বড় বড় চক্ষু দুইটি তুলিয়া কালাচাঁদের পানে চাহিয়া দেখিল; কিন্তু কোনও উত্তর করিল না। কালাচাঁদ একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বুঝেছি বুনা, তুমি আমারই জন্যে ধর্ম্মত্যাগ করেছ।"

বুনা উত্তর করিল, "আপনার জন্যে কেন করব? আমি বুঝে দেখ্‌লুম, হিন্দুধর্ম্মে কিছু নেই। কা'কে যে পূজা করব তা'র ঠিকানা পাইনে। বলে কিনা, তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা কর—নুড়ি পাথর পূজা কর। আমি দেখে শুনে স্থির করেছি, ইসলাম-ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—আল্লার আরাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা।"

এ কৈফিয়তে কালাচাঁদ তুষ্ট হইলেন না। তিনি বলিলেন, "না বুনা, তা' নয়; হিন্দুধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। তুমি তা' জান, আমিও তা' জানি। হিন্দু বলে পরিচয় দেবার গৌরব আজ আমাদের ত্যাগ করতে হয়েছে বুনা। কিন্তু নারায়ণ জানেন, আমি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিনি।"

বুনা। আমরা কি ত্যাগ করেছি? কিছুই ত নয়। সাড়ী ছেড়ে কুর্ত্তা পরেছি, এই! বেশের পরিবর্ত্তন হয়েছে, আত্মার ত নয়।

কালাচাঁদের বুকের উপর হইতে পাহাড় নামিয়া গেল। তিনি আবেগভরে বাহুপ্রসারণ করিয়া বলিলেন, "তবে এস বুনা, আমার হৃদয়ে এস—তোমার আমার মধ্যে সকল ব্যবধান তিরোহিত হইল।"

বুনা উঠিয়া দাঁড়াইল; কালাচাঁদের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য পা বাড়াইল। পরক্ষণেই পিছাইয়া আসিয়া বলিল, "আপনি আহার সমাপন করুন।"

কালা। বুনা, আমার ভাই, বন্ধু, পুত্র কিছুই নাই—তুমি সকল স্থান একা অধিকার করিয়াছ। এস বুনা, এস আমার জীবন-সহচর, হৃদয়ে এস।

বুনার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। সে আর সেখানে দাঁড়াইল না—কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল।

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

তা'রপর কয়েক মাস কাটিয়া গেল। বর্ষান্তে শরৎ আসিল। ব্রজবালা সেই সমুদ্র-সৈকতে, কুটীরবাসিনী। রাজা মুকুন্দদেবের চেষ্টার ক্রুটি নাই—কিন্তু ব্রজবালা নগরে আসিল না।

ব্রজবালা নগরে না আসুক, রাজা প্রত্যহ ব্রজবালার কুটীরে আসেন। তবে কোন দিন ব্রজবালার দর্শন পাওয়া যায়, কোন দিন পাওয়া যায় না। দর্শন মিলিলেও ব্রজবালা কোন দিন কথা কয়, কোন দিন কথা কয় না। কোন দিন দর্শনটুকু, কোন দিন কথাটুকু লইয়া রাজা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কত দ্রব্যসম্ভার রাজা, ব্রজবালার নিকট পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু ব্রজবালা কোন উপহারই গ্রহণ করে নাই—সমস্তই প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। একদিন বলরামের প্রসাদ আসিয়াছিল; ব্রজবালা তাহা হইতে কণিকা মাত্র উঠাইয়া লইয়া অবশিষ্টাংশ ফেরত দিয়াছিলেন। রাজা তদবধি আর কিছু পাঠান নাই।

একদিন নির্ম্মলা নগর হইতে সংবাদ লইয়া আসিল, যবনেরা শ্রীক্ষেত্র আক্রমণ করিতে আসিতেছে। নির্ম্মলা ভীত হইয়া পড়িল, ব্রজবালা আনন্দিত হইল। এমন সময় মহারাজ মুকুন্দদেব আসিয়া দর্শন দিলেন।

অন্যদিন ব্রজবালা রাজার পানে বড় একটা ফিরিয়াও দেখে না; আজ ব্রজবালা উঠিয়া দাঁড়াইয়া রাজাকে অভ্যর্থনা করিল। রাজা পুলকিত হৃদয়ে সমুদ্র-সৈকতে বালুকার উপর উপবেশন করিলেন। ব্রজবালা সহসা প্রগল্‌ভা হইয়া উঠিল; জিজ্ঞাসা করিল, "পাঠান নাকি উড়িষ্যা আক্রমণ করতে আসছে?

"হাঁ।"

"কি ব্যবস্থা করেছেন?"

"সীমান্তে সৈন্য পাঠিয়েছি।"

"কোথায়?"

"ত্রিবেণীতে।"

"কত সৈন্য?"

"ত্রিশ হাজার।"

"সেনাপতি কে?"

"মন্ত্রী দনার্দ্দনকে সেনাপতি করে পাঠাব ভাবছি।"

"এ সময় মন্ত্রীকে দূরে কেন?"

"সে কাছে থাক্‌লে গোল বাধাতে পারে—সিংহাসনের প্রতি তা'র লক্ষ্য আছে।"

"সে যদি রণক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করে?"

"তা'কে আমি নামে সেনাপতি করব—কার্য্যে নয়।"

"যা'কে সন্দেহ হয়, তাকে দূরে না রেখে কাছে রাখা ভাল।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "রাজনীতির তুমি কি জানিবে ব্রজবালা?"

ব্রজবালা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পাঠান কত সৈন্য লয়ে আসছে?"

রাজা। তা' ঠিক জানি না—দুই এক লাখ হ'তে পারে।

ব্রজ। এই দুই এক লাখ সৈন্যকে বাধা দিতে আপনার ত্রিশ হাজার সৈন্যই কি যথেষ্ট?

রাজা। হিন্দুর বাহুতে কত শক্তি তা' ত তুমি জান না ব্রজবালা!

ব্রজ। আমি এইটুকু জানি, শত্রুকে তাচ্ছিল্য করা উচিত নয়।

রাজা। ঠিক তাচ্ছিল্য করছি না, কটকে মহানদী-উপকূলে সৈন্য রক্ষা করছি।

ব্রজবালা নীরব রহিল। ক্ষণকাল পরে রাজা বলিলেন, "ব্রজবালা, হয়ত জীবনে আর সাক্ষাৎ ঘট্‌বে না।"

ব্রজবালা ঝটিতি ঘুরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ঘট্‌বে না?"

রাজা। আমি যুদ্ধে চলিলাম—ফিরিব কিনা জানি না।

ব্রজ। ফিরিবেন বই কি; বিজয়-মাল্য গলায় পরিয়া গৃহে ফিরিবেন বই কি।

রাজা। ব্রজবালা, তোমার তবে ইচ্ছা আমি আবার তোমার কাছে ফিরে আসি?

ব্রজবালা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি জানেন কি, এ যুদ্ধে পাঠান-সেনাপতি কে?"

রাজা। শুনেছি নবাব-জামাতা কালাপাহাড়।

ব্রজ। কালাপাহাড়?

রাজা। হাঁ; কালাচাঁদ রায় এক্ষণে কালাপাহাড়।

ব্রজবালা চিন্তামগ্ন হইল। রাজা অতৃপ্তনয়নে ব্রজবালার রূপসুধা

পান করিতে লাগিলেন। সুধা অনন্ত, কিন্তু সময় সান্ত। ব্রজবালা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এক্ষণে কোথায় যাইতেছেন?"

"কটক।"

"আমিও যাব।"

"কটকে? আমার সঙ্গে?"

ব্রজবালা রাজার পানে চাহিয়া একটু হাসিল। রাজা কৃতার্থ হইলেন।

---

# রাণী-ব্রজসুন্দরী

## চতুর্থ খণ্ড

মরুৎ

( লালসা )

মুকুন্দদেব ও ব্রজসুন্দরী

# প্রথম পরিচ্ছেদ

"বুনা, ত্রিবেণীর নাম শুনেছ ?"

"শুনেছি বই কি প্রভু।"

"দূরে সেই মুক্তবেণী।"

"চলুন না একবার দেখে আসি।"

"হিন্দুর তীর্থে আমাদের অধিকার কি বুনা ?"

বুনা উত্তর করিল না। তখন রজনী প্রভাত। তবে সূর্য্যদেব তখনও উঠেন নাই, কিন্তু পূর্ব্বগগন আরক্তিম। নদীবক্ষ স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে না—একটা ধূম্রবরণ যবনিকায় সমাচ্ছন্ন। পিছনে অসংখ্য পাঠান শিবির। জনশূন্য মুক্ত প্রান্তর এক্ষণে জনাকীর্ণ। উভয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বুনা জিজ্ঞাসা করিল, "এখান হ'তে ত্রিবেণী কত দূর ?"

"তিন চারি ক্রোশ।"

"হিন্দু-সৈন্য নাকি ত্রিবেণীর সন্নিকটে অপেক্ষা করছে ?"

"ঠিক সন্নিকটে নয়—দুই তিন ক্রোশ দূরে।"

উভয়ে ধীরপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দক্ষিণে উন্মুক্ত প্রান্তর, বামে বালুকাময় নদীতট। কালাচাঁদ অগ্রগামী, বুনা পশ্চাতে। বুনা জিজ্ঞাসা করিল, "শুনেছি, উড়িষ্যার রাজা নাকি ত্রিবেণীর ঘাট প্রস্তুত করে দিয়েছেন ?"

কালা। শুনেছি তাই।

বুনা। ঘাটের উপর দশ অবতারের মূর্ত্তি স্থাপনা করে দশটি বিষ্ণু-মন্দিরও নাকি প্রস্তুত করে দিয়েছেন?

কালা। হবে।

বুনা। চলুন না একবার দেখে আসি।

কালা। এখন নয় বুনা।

বুনা। তবে কখন?

কালা। যখন ধ্বংস কর্‌তে যাব।

সহসা দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে কে বলিয়া উঠিল, "কীর্ত্তি কখন ধ্বংস হয় কি কালাচাঁদ?"

কালাচাঁদ ঝটিতি ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, একজন পথিক বৃক্ষাশ্রয়ে উপবিষ্ট। তাহার পরিধানে মূল্যবান্ পরিচ্ছদ—কটিতে অসি; কিন্তু যোদ্ধবেশ নয়, দেখিবামাত্র কালাচাঁদ তাহাকে চিনিলেন; বলিলেন, "গদাধর, তুমি এখানে?"

গদাধর উত্তর করিল, "আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি—অদূরে আমার নৌকা।"

কালা। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ!

গদা। হাঁ কালাচাঁদ। জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি, তুমি এত সৈন্য নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?

কালা। উড়িষ্যা ধ্বংস কর্‌তে।

গদা। উড়িষ্যার অপরাধ? যদি কেউ অপরাধ করে থাকে ত সে মুকুন্দদেব। তার অপরাধে কেন সমগ্র উড়িষ্যাবাসীকে মার?

কালা। হিন্দুমাত্রেই আমার নিকট অপরাধী।

গদা। তোমার মাতাপিতা—যে পিতৃপুরুষের রক্ত তোমার দেহে প্রবাহিত—তাঁহারা সকলেই কি তোমার নিকট অপরাধী?

কালাচাঁদ সহসা কোন উত্তর করিলেন না; গদাধরের মুখ হইতে নয়ন অপসৃত করিয়া লইয়া সুদূর আকাশপানে চাহিলেন। রক্তমাখা রবি তখন নদীবক্ষে ভাসিয়া উঠিতেছেন—ধূম্রবরণ যবনিকা ধীরে ধীরে অপসৃত হইতেছে। বহুদূরবিস্তৃত সেনানিবাস মানবকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত—দিগ্‌দিগন্ত পক্ষীর ঝঙ্কারে মুখরিত। জবা পদ্ম ফুটিয়া উঠিয়া সূর্য্যদেবের চরণে অঙ্গ ঢালিবার জন্য ব্যাকুল। মানুষ পক্ষী, স্থাবর জঙ্গম তাঁহার প্রভাত আরতি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। চতুর্দ্দিকে জীবন—প্রেম আনন্দ। কালাচাঁদের সেটা ভাল লাগিল না; কেমন একটা বিরক্তি-ভাব আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি বলিলেন, "দেখ গদাধর, আমি কি করি বা না করি, তাহার কৈফিয়ত আমি কাহারও নিকট দিতে প্রস্তুত নই। আমি যখন আশ্রয় যেচে কাঙ্গালের মত হিন্দুর দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম, তখন কি তোমরা কবার আমার কাছে এসেছিলে? আজ আমি বলযুক্ত—প্রতিহিংসাপরায়ণ, তাই তোমরা এখন দলে দলে এসে আমার কৃপা ভিক্ষা করছ। আমি দয়াশূন্য, গদাধর। হিন্দু বা হিন্দু-দেবদেবী মূর্ত্তির আমার নিকট পরিত্রাণ নেই। বুঝেছ গদাধর?"

গদাধর। বেশ বুঝেছি—আর বুঝাতে হবে না। তোমার বৃদ্ধা জননী এখন তোমার শত্রু—তোমার বধ্য। আর যে সব দেবদেবীর মূর্ত্তি, তোমার পিতা পিতামহ, ফুলচন্দন চোখের জল বুকের রক্ত দিয়ে পূজা করে এসেছেন, সেই সব মূর্ত্তি এখন তুমি ধ্বংস করতে সমুদ্যত। বেশ বুঝেছি, কালাপাহাড়।

কালাচাঁদের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল—চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তিনি একটু তেজের সহিত বলিলেন, "তুমি কি করিতে গদাধর, যদি তোমাকে প্রত্যেক হিন্দু ঘৃণাভরে উপেক্ষা করিত?—তোমার স্পৃষ্ট অন্ন ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুকও গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হইত?—তোমাকে হিন্দুর গৃহ হইতে, হিন্দুর দেবালয়

হইতে, হিন্দুর তীর্থক্ষেত্র হইতে কুক্কুরের ন্যায় বিতাড়িত করিত? তুমি কি করিতে গদাধর, যদি তোমার জননী তোমার নামে ধিক্কার প্রদান করিত?—তোমার পরিণীতা ভার্য্যা তোমার জীবননাশার্থে শত্রুর আশ্রয় গ্রহণ করিত?—তোমার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন তোমাকে ঘৃণিত পদার্থের ন্যায় বর্জ্জন করিত?"

গদাধর। আমি কি করিতাম জিজ্ঞাসা করিতেছ কালাচাঁদ? আমি আমার ইষ্টদেবকে বুকের ভিতর আরও দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরিতাম; আর কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণে আত্মনির্ভর করিয়া বলিতাম, "মঙ্গলময়, তুমি যা' করাইতেছ, আমি তাই করিতেছি—আমার পাপপুণ্য, সুখদুঃখ সকলি তোমার।"

কালাচাঁদের চক্ষুমধ্যে যেখানে আগুন জ্বলিতেছিল, সেখানে সলিল ছুটিয়া আসিল; বিশাল ললাটে প্রসন্নতা আসিয়া বসিল। তিনি বলিলেন, "আমিও ত তাই করিতেছি গদাধর! সর্ব্বকর্ম্মের ফলাফল তাঁহার চরণে সমর্পণ করিয়া আমি প্রবাহে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছি। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত যখন গাছের পাতাটি পড়ে না, তখন আমি কে গদাধর?"

গদাধর। বেশ; তুমি যদি সত্যই আত্মনিবেদনে সমর্থ হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার বলিবার আর কিছু নাই। এখন চলিলাম—সময়ান্তরে আবার সাক্ষাৎ ঘটিবে।

কালাচাঁদ। কোথায়? যুদ্ধক্ষেত্রে?

গদাধর। হাঁ।

কালাচাঁদ। তোমার অপমান করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু নিরস্ত হইলে ভাল হইত।

গদাধর। সে কি কথা কালাচাঁদ?

কালাচাঁদ। শুন গদাধর, আমি এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিয়াছি। আমি

যখন উড়িষ্যা হইতে কুক্কুরের ন্যায় বিতাড়িত হইয়া বাঙ্গালায় ফিরিতে-ছিলাম, তখন পথিমধ্যে পান্থশালায় এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। আমার চারিদিকে যেন বিপুল রক্তপ্রবাহ ছুটিয়া চলিয়াছে; সেই স্রোতে সহস্র সহস্র দেবমূর্ত্তি, শত শত দেবমন্দির ভাসিয়া চলিয়াছে—আর আমি সেই প্রবাহমধ্যে অসংখ্য শব পরিবেষ্টিত হইয়া অগ্রসর হইতেছি। সহসা সম্মুখে তোমার মৃতদেহ দেখিলাম। লক্ষ মানুষ মারিয়া সহস্র দেবমূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া প্রাণে যে ব্যথা পাই নাই, তোমার মৃতদেহ দেখিয়া তদধিক ব্যথা পাইলাম। কষ্টে যন্ত্রণায় নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তাই বলিতেছিলাম গদাধর, নিবৃত্ত হইলে ভাল হইত না?

গদাধর। তুমি আজও আত্মনিবেদনে সমর্থ হও নাই। আমি তোমারই কথার উত্তর দিতেছি, তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত যখন গাছের পাতাটি পড়ে না, তখন আমি কে কালাচাঁদ?

কালাচাঁদ। বেশ, তবে তুমি তোমার পথে অগ্রসর হও। তুমি বা আমি একজন নিশ্চয়ই এ যুদ্ধে মরিব। তুমি মরিলে তোমাদের ধর্ম্মের অনেক ক্ষতি হইবে, কাঁদিবেও অনেকে; আমি মরিলে কাহারও ক্ষতি নাই, দুই জন ছাড়া জগতে কাঁদিবারও কেহ নাই। প্রার্থনা করি, যেন আমারই মৃত্যু হয়।

গদাধরের নয়ন সজল হইয়া আসিল। তিনি তথায় আর অপেক্ষা করিলেন না—ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

গদাধর অদৃশ্য হইতে না হইতে একজন ছদ্মবেশী শ্মশ্রুধারী হিন্দু আসিয়া কালাচাঁদের সম্মুখে দাঁড়াইল। কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

"আমি উড়িষ্যাবাসী হিন্দু।"

"কি চাও?"

"আপনার নামে একখানি পত্র আছে।"

"কে দিয়েছে?"

"মহামন্ত্রী দনার্দ্দন।"

কালাচাঁদ পত্র গ্রহণ করিয়া পাঠ করিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে একটা ঘৃণা ও বিরক্তিভাব প্রকটিত হইল। তিনি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "তবে যাও হিন্দু, অধঃপাতে যাও।"

কথা কয়টি বুনার কাণে গেল। তাহার বুক ফাটিয়া একটা নিশ্বাস উঠিল; কিন্তু ঝড়ের চিহ্ন বাহিরে প্রকাশ পাইল না।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুক্তবেণী ত্রিধারায় সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে। যেন তিন ভগ্নী পরস্পরের সাহচর্য্য পরিত্যাগ করিয়া পতিগৃহে নিজ নিজ সংসার পাতিতে চলিয়াছে। যাইবার সময় কত কাঁদিয়াছে—পরস্পরের অঙ্গে কত আছাড় খাইয়া পড়িয়াছে। অবশেষে মৃদুকণ্ঠে বিলাপ করিতে করিতে চোখের জলে দুই গণ্ড সিক্ত করিয়া চলিয়াছে।

তমোময়ী রজনী। তবে অন্ধকার তত গাঢ় নয়। মানুষ চেনা যায় না; কিন্তু দেখা যায়। নদীবক্ষে গভীর জলে একখানি তরণী স্থির হইয়া রহিয়াছে। দূর হইতে তাহা অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। নিকটে আর কোন নৌকা দৃষ্ট হইতেছে না। নৌকার মাঝিরা নীরব; কিন্তু

জাগ্রত ও সতর্ক। বড় বড় সৈনিক কর্ম্মচারীরা মাঝিমাল্লারূপে নৌকায় অবস্থান করিতেছিলেন। নৌকার ভিতরে কালাচাঁদ উপবিষ্ট। তিনি নীরবে মুদ্রিত নয়নে উপবিষ্ট ছিলেন। চারিদিক্ নিস্তব্ধ—কোনও শব্দ নাই। এমন সময় সে নৈশনিস্তব্ধতা মথিত করিয়া দূরবর্ত্তী কোনও নৌকা হইতে কে গাহিয়া উঠিল,—

স্রোতে বহি যাও,
তরণী আমার স্রোতে বহি যাও।

গান সহসা থামিল। কালাচাঁদের মনে হইল, সুরটা যেন স্রোতে ভাসিয়া গেল। তিনি উৎকর্ণ হইয়া গানের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্ষণমধ্যেই আবার সুর উঠিল। কালাচাঁদ শুনিলেন,—

দাঁড়াইও না আর, তরণী আমার,
দাঁড়াবার নাই অবসর, স্রোতে বহি যাও।
পিছু ফিরে চেও না, সাম্‌নে চেয়ে দেখো না,
আঁখি মুদে শুধু স্রোতে ভেসে যাও।
তরণী আমার স্রোতে বহি যাও॥

গান থামিল, কিন্তু সুর থামে নাই; তখনও সুর সেই নৈশ আকাশে ভাসিয়া চলিয়াছে। কালাচাঁদের গানের প্রতি আর লক্ষ্য নাই—তিনি সুর, গান সব বিস্মৃত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ের ভিতরে একটা নূতন সুর জাগিয়া উঠিয়াছিল। তিনি তাহারই ঝঙ্কার নীরবে শুনিতেছিলেন। অবশেষে মৃদুকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এস তবে দনার্দ্দন রায়, উড়িষ্যার ভাগ্যে কি আছে দেখা যাক্।"

বাক্যের অবসান হইতে না হইতে অদূরে একখানা নৌকা দৃষ্ট হইল। উভয় নৌকার লোকেরা হাঁকাহাঁকি করিল। প্রথম নৌকা হাঁকিল, "কে?"

দ্বিতীয় নৌকা উত্তর করিল, "ভূপবালা।"

সাঙ্কেতিক কথা নৌকার লোকেরা জানিত না; শুধু কালাচাঁদ জানিতেন। তিনি আদেশ করিলেন, "নৌকা ভিড়িতে দাও।" অচিরে দুই নৌকা একত্র হইল, এবং দ্বিতীয় নৌকার আরোহী উড়িষ্যার মহামন্ত্রী দনার্দ্দন রায় প্রথম নৌকায় আরোহণ করিলেন।

নৌকার ভিতর কক্ষে কালাচাঁদ একাকী উপবিষ্ট ছিলেন। একটা পিত্তল দীপাধারে ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছিল। কক্ষের সম্পদাদি অতি সামান্য। অভ্যাগত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া একবার চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিলেন; তারপর ফিরিয়া কালাচাঁদকে অভিবাদন করিলেন। পাঠান-সেনাপতি, উড়িষ্যার মহামন্ত্রীকে কোনরূপ আদর আপ্যায়ন করিলেন না; শুধু আসন পরিগ্রহ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। মহামন্ত্রী অবমানিত হইয়াও নীরবে উপবেশন করিলেন। কালাচাঁদ তাঁহার আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনি কি উড়িষ্যার মহামন্ত্রী?"

"হাঁ।"

"রাজমন্ত্রী মন্ত্রণাগার ছাড়িয়া সমরক্ষেত্রে কেন?"

"প্রয়োজন হইলে উড়িষ্যার কৃষকও যে সমরক্ষেত্রে আসে।"

কালাচাঁদ ক্ষণকাল নিরুত্তর থাকিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি জন্য আমার দর্শনপ্রার্থী হইয়াছেন?"

দনা। আপনি কি জন্য এত সৈন্য লইয়া উড়িষ্যার রাজ্যসীমায় উপস্থিত হইয়াছেন?

কালা। উড়িষ্যা-বিজয় আমার উদ্দেশ্য।

দনা। আপনার এই সামান্য সৈন্য কি উড়িষ্যা-বিজয়ে সমর্থ?

কালা। সংখ্যায় শক্তি নির্ণীত হয় না।

দনা। সে তর্কের এক্ষণে প্রয়োজন নাই—পাঠানের বারম্বার

পরাজয়ে ইতিপূর্ব্বে তাহা মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে আজ আমি একটা নূতন প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছি।

কালা। কি ?

দনা। আপনার উদ্দেশ্য যদি সহজে সিদ্ধ হয় ?

কালা। তা'হলে রক্তারক্তির প্রয়োজন নেই।

দনা। রক্তারক্তির কিছু প্রয়োজন আছে। আমি এখানে সেনাপতি নই ; তবে আপনাকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করিতে পারি।

কালা। কি করিতে পারেন ?

দনা। আমার অধীনে পাঁচ হাজার সেনা আছে ; আমি তাহা লইয়া সময়মত সরিয়া দাঁড়াইব। তখন অনেকেই ভগ্নোদ্যম হইয়া আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে।

কালা। আপনাদের কত সৈন্য আছে ?

দনা। চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার। আপনি সহজেই ত্রিবেণী যুদ্ধে জয়ী হইবেন।

কালা। তারপর ?

দনা। দ্বিতীয় যুদ্ধের সম্ভাবনা যজ্ঞপুরে।

কালা। সেখানে সেনাপতি কে ?

দনা। লক্ষ সৈন্যের অধিনায়ক যুবরাজ রামচন্দ্র।

কালা। সেখানে আপনি কি করিতে পারেন ?

দনা। তা' এখন ঠিক বলিতে পারি না ; তবে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইয়া রাজা মুকুন্দদেবকে বিব্রত রাখিতে পারিব।

কালা। মুকুন্দদেব কোথায় ?

দনা। কটকে।

কালা। কটকের দুর্গ নাকি অভেদ্য ?

দনা। হাঁ; কটকের বারোবাটী দুর্গ অজেয়।

ক্ষণকাল চিন্তার পর কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এ সাহায্যের মূল্য কিরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ?"

দনা। উড়িষ্যার সিংহাসন।

কালাচাঁদের সমস্ত মুখখানিতে ঘৃণাবিমিশ্র বিরক্তিভাব ফুটিয়া উঠিল। ক্ষীণালোকে দনার্দ্দন তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। কালাচাঁদ সহসা কোন উত্তর না করিয়া নীরবে একটু চিন্তা করিলেন। এমন সময় বহুদূর হইতে একটা সুরতরঙ্গ ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া কালাচাঁদের কাণে লাগিল। কালাচাঁদ শুনিলেন,—'তরণী আমার স্রোতে বহি যাও।'

কালাচাঁদ বলিলেন, "আপনাকে সিংহাসনে বসাইতে হইলে আপনার প্রভু ও প্রভুপুত্রকে হত্যা করিতে হয়। তা'তে আপনি প্রস্তুত আছেন ?"

দনা। যুদ্ধেও ত তাঁহাদের মৃত্যু ঘটিতে পারে।

কালা। যদি না ঘটে ?

দনা। যদি না হয়, তখন—তখন কোনরূপ ব্যবস্থা করা যাইবে।

কালাচাঁদ মুখ ফিরাইলেন। দনার্দ্দন তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "পাঠান-সেনাপতি, আপনি বয়সে নবীন—রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ উড়িষ্যার ইতিহাস যদি আপনি অবগত থাকিতেন, তাহা হইলে আপনি ঘৃণায় মুখ ফিরাইতে পারিতেন না। তেলেগু মুকুন্দদেব কিরূপে সিংহাসন পাইয়াছে জানেন কি ? সে তাহার প্রভু নরসিংহ জেনাকে মারিয়া রুধিরাক্ত হস্তে রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়াছে। নরসিংহ আবার গোবিন্দ বিদ্যাধরকে দূর করিয়া সিংহাসনে বসিয়াছে। গোবিন্দ আবার তাহার প্রভু প্রতাপরুদ্রের বত্রিশটি সন্তানকে মারিয়া ললাটে রাজটীকা ধারণ করিয়াছে। এইরূপে সিংহাসনের জন্য চিরদিনই দ্বন্দ্ব কলহ চলিয়া

আসিতেছে। কে রাজা? কে প্রজা? যে কৌশলে বা শক্তিতে সিংহাসনে বসিতে পারে, সেই রাজা; যে পারে না, সেই প্রজা। রাজনীতিতে পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই নাই।"

কালাচাঁদ। উত্তম—উড়িষ্যার মহামন্ত্রীর নিকট আজ অভিনব ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি শিক্ষালাভ করিলাম।

দনা। বিদ্রূপ করিবেন না—রাজনীতি শিখিতে এখনও আপনার অনেক বিলম্ব ও আপনি সবেমাত্র রাজ-সংসারে প্রবেশ করিয়াছেন।

কালাচাঁদের বদন আরক্তিম হইল। দনার্দ্দন বলিলেন, "পাঠান-সেনাপতি যদি রাজনীতি অবগত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি কখন মনে করিতেন না যে, আমি বিনা পুরস্কারে তাঁহাকে সাহায্য করিতে সমুদ্যত হইয়াছি।"

কালাচাঁদ। উড়িষ্যার উদারচেতা রাজনীতিজ্ঞ সম্ভবতঃ মনে করেন নাই যে, আমরা বিনা স্বার্থে এত লোকক্ষয়, অর্থক্ষয় করিতে অগ্রসর হইয়াছি।

দনা। আপনাদের উদ্দেশ্য ত লুণ্ঠন?

কালা। সিংহাসন কি আমাদের লক্ষ্য হইতে পারে না?

দনা। উড়িষ্যার সিংহাসন? রহস্য মন্দ নয়! এ কি বাঙ্গালা? উড়িষ্যার সিংহাসনে কখন বিদেশী বসিতে পারে না।

কালা। সে কথা সত্য; কিন্তু আপনি যখন উড়িষ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন উড়িষ্যার পতন অনিবার্য্য। আপনার সহিত বাক্যালাপে আমার আর প্রবৃত্তি নাই; সেনাপতি কতলু খাঁ বঙ্গেশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপে আপনার সহিত বাক্যালাপ করিবেন।

কালাচাঁদ গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে আসিলেন; এবং কতলু খাঁকে কিছু উপদেশ দিয়া ভিতরে পাঠাইলেন। তিনি দনার্দ্দনের সকল প্রস্তাব

সানন্দে গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "শ্রীক্ষেত্র জয়ের পর আপনাকে আমরা সিংহাসনে বসাইব—তৎপূর্ব্বে নয়। কিন্তু আপনাকে সুলতানের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে—কর ও উপঢৌকন যথাযোগ্য দিতে হইবে।"

দনা। সম্মত আছি।

অতঃপর দনার্দ্দন গাত্রোত্থান করিলেন ; এবং নিজের নৌকায় উঠিয়া অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন, "আগে সিংহাসনে বসি, তারপর তুর্কীকে দেখ্‌ব—তুর্কীর জামাতাকেও দেখ্‌ব।"

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহানদী ও কাঠ্‌জুড়ি নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রশস্ত ভূখণ্ডের উপর কটক-বারাণসী ও বারোবাটী দুর্গ। নগর কাঠ্‌জুড়ির উপর—দুর্গ মহানদীর উপর। নগর ও দুর্গের মধ্যে ব্যবধান দুই ক্রোশ মাত্র।

বারোবাটী ভূখণ্ডের উপর দুর্গ নির্ম্মিত বলিয়া দুর্গ বারোবাটী নামে পরিচিত। এক এক বাটীতে পঁচিশ বিঘা জমী। এক এক বিঘায় এক এক 'একার' অর্থাৎ এতদ্দেশীয় তিন বিঘা জমীরও কিছু বেশী। দুর্গের বর্ত্তমান আয়তন দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যায়, দুর্গ যে ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত, তাহা একশত বিঘারও কম। রাজ-প্রাসাদ, দুর্গ-পরিখার অপর পার্শ্বে—পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। এই রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ লইয়া বারোবাটী।

কটক-বারাণসী, উড়িষ্যা রাজ্যের রাজধানী। কেশরী-বংশের রাজত্ব-কালে দশম শতাব্দীর শেষভাগে চৌদ্বার হইতে কটকে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। তদবধি কটকই রাজধানী। কটক, রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নগরী সুদৃশ্য হর্ম্ম্যমালায় বিশোভিত। মুকুন্দদেব, দুর্গ ও নগরকে নানা অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজপ্রাসাদ (১) জগতে অতুলনীয় ছিল। ইহা বিস্তারে একখানি গ্রাম—উচ্চতায় নীলগিরি। কথিত আছে, ইহা নয় তোলা ছিল (২) প্রস্তর ও ইষ্টকে গঠিত, ইহার কারুকার্য্য একদিন জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। এক্ষণে ইহার ধ্বংসা-বশেষ একখানি ইষ্টকও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জড়ের পরিণাম এইরূপ।

দুর্গ-প্রাকারের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত জলপ্রণালী বা পরিখা। প্রণালী কোথাও চব্বিশ হাত, কোথাও বা একশত হাত প্রশস্ত। জল অতি গভীর—হাতীও তল পায় না। পরিখার উপরেই প্রস্তরনির্ম্মিত বিশালকায় প্রাচীর। প্রাচীর-গাত্রে একটীমাত্র দ্বার; এই দ্বার ব্যতীত দুর্গ প্রবেশের অন্য পথ নাই। আর একটী গুপ্তদ্বার আছে; সেই দ্বারপথে শেষ মহারাষ্ট্র-নরপতি, ইংরাজ-আগমনে নৌকায় উঠিয়া বিপুল অর্থসহ পলায়ন করিয়াছিলেন। পরিখার উপর একটী অপ্রশস্ত সেতু। সূর্য্যাস্তের পর সেতু উঠাইয়া লওয়া হয়।

দুর্গের বাহিরে—পরিখার অপর পার্শ্বে রাজপ্রাসাদ। এই প্রাসাদের নয়টি পল্লী বা প্রাঙ্গণ। প্রত্যেক পল্লীতে বহুসংখ্যক গৃহ। প্রথম প্রাঙ্গণে অসংখ্য গজ, অশ্ব ও উষ্ট্র; দ্বিতীয় পল্লীতে কামান, বন্দুক, অস্ত্রাগার ও

(১) ষ্টার্লিং সাহেবের মতে এই প্রাসাদ দেখিতে Windsor Castleএর মত।

(২) আইন-ই-আকবরি।

সৈন্যাবাস; তৃতীয় প্রস্থে প্রাসাদরক্ষক সৈন্য অবস্থান করিত; চতুর্থে শিল্পী ও কর্ম্মকার; পঞ্চমে রন্ধনশালা; ষষ্ঠে রাজার দরবার গৃহ ও রাজকর্ম্মচারীদের আবাসস্থল; সপ্তমে গুপ্ত পরামর্শের গৃহশ্রেণী; অষ্টমে মহিলা-নিবাস; নবমে রাজা ও রাজ-পরিবারবর্গের শয়নাগার। (১)

গৃহের সাজসজ্জাও প্রাসাদানুরূপ। দরবার ও মন্ত্রণাগৃহে যে সকল প্রস্তরগঠিত পুত্তলি ও দীপাধার ছিল, তাহা বা তদনুরূপ কিছুই এক্ষণে পাওয়া যায় না। সে রকম নিপুণ শিল্পী এক্ষণে আর কোন দেশে জন্মায় না। ভুবনেশ্বর মন্দিরাঙ্গে উড়িষ্যার ইতিহাস, তাজমহলের দেহে সমস্ত কোরাণ লিখিতে এখন আর কোন্ দেশের কোন্ শিল্পী পারে?

উড়িষ্যার শিল্প ছিল, শক্তি ছিল; কিন্তু সাহিত্য ছিল না। দুই একজন লেখক মধ্যে মধ্যে "বিচিত্র রামায়ণ," বা "রসকল্লোল" বা "গোপীবল্লভ নাটক" লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে সাহিত্য গঠিত হয় নাই। উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ কবি উপেন্দ্র ভঞ্জের "চন্দ্রলেখা" প্রভৃতি বহুতর উপন্যাস ও "লাবণ্যবতী" প্রভৃতি কাব্য উড়িষ্যার সাহিত্যের কিছুই করিতে পারে নাই।

উড়িষ্যার সাহিত্য ছিল না, কিন্তু ধর্ম্ম ছিল। প্রত্যেক নগর তীর্থক্ষেত্র। এমন গ্রাম ছিল না, যেখানে মন্দির বা বিগ্রহ ছিল না। উড়িষ্যা-ভূমিতে পদার্পণ করিলেই মনে হয় যেন বসুন্ধরা ছাড়িয়া কোন পুণ্যময় রাজ্যে সমুপস্থিত হইয়াছি। আকবরের মুসলমান-সেনাপতি উড়িষ্যাজয় করিতে আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—'এ দেশ ঈশ্বরের—মানুষের নয়।" ভাগবতে যজ্ঞপুর সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"যাজপুরে আছয়ে যতেক দেবস্থান।
লক্ষ লক্ষ বৎসরেও লৈতে নারি নাম॥

(১) W. Bruton.

দেবালয়ে নাহি হেন নাহি সেই স্থান।
কেবল দেবের বাস যাজপুর গ্রাম ॥"

উড়িষ্যার এক্ষণে কিছুই নাই,—ধর্ম্ম, শক্তি, শিল্প সব গিয়াছে। আছে শুধু ক্ষীণকায়া স্মৃতি। তা'ও সাহিত্যের অভাবে চিতাশায়িনী হইতে বসিয়াছে, "মাদলী পঞ্জী" ছাড়া উড়িষ্যার আর ইতিহাস নাই। তাহাও আবার অলীক ও অসম্ভব ঘটনায় পূর্ণ।

উড়িষ্যাবাসীর মুখে না শুনিয়া আমরা অপরের কাছে শুনিয়াছি, উড়িষ্যা একদিন ঐশ্বর্য্য ও শিল্পে, ধর্ম্ম ও শক্তিতে ভারতের বরেণ্য ছিল। মুকুন্দদেবের বিস্তীর্ণ প্রাসাদের কথা আমরা অপরের নিকট শুনিয়াছি, উড়িষ্যা নিজে বড় কিছু বলে নাই।

সেই প্রাসাদের দরবার-গৃহ একদিন পরিব্রাজকের দ্রষ্টব্য ছিল। গৃহের একধারে রজতময় উচ্চবেদীর উপর রত্নসিংহাসন। বেদীর নীচে দুই পার্শ্বে বহুতর স্বর্ণ ও রৌপ্যমণ্ডিত আসন। মধ্যে মধ্যে বিচিত্র দীপাধার। কোন দীপাধার স্তম্ভাকৃতি, কোন দীপাধার নগ্ন নারীমূর্ত্তি। সকল দীপাধারই মর্ম্মরপ্রস্তর নির্ম্মিত। কোন দীপাধার শত শাখা, কোন দীপাধার পুরাণকথিত কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায় সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, শাখা বা বাহু রৌপ্যমণ্ডিত। দীপাধার হইতে দীপাধারে সুবর্ণ শৃঙ্খল বিলম্বিত।

গৃহকোণে বৃহদাকার মানুষ্যমূর্ত্তি। কোনটা উড়িষ্যার পাহাড়ীর মূর্ত্তি, কোনটা বানুয়া, কোনটা ধানুকী, কোনটা বা পাইকের মূর্ত্তি। কাহারও হস্তে ঢাল ও খাঁড়া, কাহারও হস্তে অস্ত্রনিক্ষেপকারী যন্ত্র বিশেষ, কাহারও হস্তে ধনুর্ব্বাণ; কাহারও পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, দেহ হরিদ্রাক্ত, মুখমণ্ডল লালমৃত্তিকায় রঞ্জিত। গৃহের কোন অংশে দন্ত-বিস্তারী বৃহদাকার হস্তি-মূর্ত্তি। কোথাও বা অশ্বমূর্ত্তি, আবার কোথাও বা গর্দ্দভ। হস্তি-পৃষ্ঠে

যোদ্ধৃবেশী খাণ্ডাইত বা ভঞ্জের মূর্ত্তি, অশ্বপৃষ্ঠে দুর্দ্ধর্ষ মাল বা ধীরের মূর্ত্তি, গর্দ্দভোপরি কোনও পরাজিত মুসলমান সেনাপতির মূর্ত্তি। মূর্ত্তিনিচয় পাষাণময়ী।

গৃহপ্রাচীরগাত্রে নানামূর্ত্তি খোদিত। এক স্থানে দেখা যায়, এক ভীষণদর্শন রক্তবর্ণ দীর্ঘাকার মনুষ্য জগন্নাথদেবকে কক্ষে লইয়া পলাইতেছে। আর এক স্থানে মহারাজ যযাতিকেশরী, যবনদের উড়িষ্যা হইতে দূরীভূত করিতেছেন, তাহার চিত্র লেখা আছে। আর এক স্থানে গরুড়-স্তম্ভ পাদমূলে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব আত্মবিহ্বলচিত্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। এইরূপে প্রাচীরগাত্রে নানাবিধ চিত্র লিখিত রহিয়াছে দেখা যায়।

এই সভাগৃহে এক সহস্র ব্যক্তির বসিবার উপযোগী স্থান আছে। আরও দুই সহস্র ব্যক্তি গৃহমধ্যে অনায়াসে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। রাজা মুকুন্দদেব অদ্য প্রাতে যখন সভাগৃহে আসিয়া দর্শন দিলেন, তখন সেই বৃহৎ কক্ষটি লোকে পরিপূর্ণ। রাজকীয় পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া, মণিমুক্তাখচিত তরবারি-হস্তে রাজা যখন সিংহাসনে আসিয়া বসিলেন, তখন চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল। কিন্তু রাজার বদন বিষণ্ণ, চিন্তাক্লিষ্ট। রাজা আসন পরিগ্রহ করিলে রাজকর্ম্মচারী ও সভাসদ্‌বৃন্দ স্ব স্ব মর্য্যাদা অনুসারে আসন গ্রহণ করিলেন। রাজা তখন বলিলেন, "আপনারা বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন, ত্রিবেণীর যুদ্ধে আমরা পরাস্ত হইয়াছি। আমি সংবাদ-বাহককে এখানে আসিতে আদেশ করিয়াছি; আপনারা তাহার প্রমুখাৎ সকল বৃত্তান্ত অবগত হইবেন।"

রাজার বাক্য অবসান হইতে না হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া সিংহাসন-তলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল; এবং নাসিকা কর্ণ স্পর্শান্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। অবশেষে সম্বোধিত হইয়া বলিল, "মহারাজ অবধান করুন,

খাণ্ডাইত অবধান করন্তু। জগন্নাথ প্রভু জানন্তি, মু কি পরি লড়াই করিয়াছি। দু' হজার মুসলমান মু একা মারিয়াছি। আউ দু' হজার মারিথান্তি, তা' মারি কিস্ হব? দু' হজার মলে বিশ হজার আসন্তি।"—

একজন খাণ্ডাইত বলিয়া উঠিলেন, "তোমার বীরত্বের কথা পরে হবে—এখন যুদ্ধের কথা বল।"

সংবাদ-দাতা একটু অপ্রতিভ হইয়া চারিদিক্ পানে চাহিতে লাগিল। কাহারও নিকট কোনরূপ সহানুভূতি পাইল না। তখন বলিল, "যুদ্ধের আর কি হবে? আমরা হারলুম। আমরা চল্লিশ হাজার ছিলুম, আর তারা চল্লিশ লাখ্। কালাপাহাড়ের সঙ্গে কতলু খাঁ ছিল। দুইজনে মিলে আমাদের মধ্যিখানে ফেল্লে। আমরা এক এক জনে এক এক হাজার মেরিছি। মহামন্ত্রী তাঁর পাইকদের রক্ষা করে খুব পালিয়েছেন। সকলে পালাল, কিন্তু একজন পালাল না; সে বাঙ্গালী। তিন চার শত পাইক নিয়ে সে একা কতলু খাঁকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। পরে কালাপাহাড় এসে তা'কে তাড়ালে।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সেই বাঙ্গালী?"

"তা' জানি না। লোকে বল্তে লাগ্ল, এ কোন্ বাঙ্গালা দেশের রাজার ছেলে।"

---

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অকস্মাৎ এক ব্যক্তি জনতা ঠেলিয়া ব্যস্তভাবে সভাগৃহে প্রবেশ করিল। তাহার বস্ত্র কর্দ্দমাক্ত, অঙ্গ ধূলিধূসরিত। রাজা উৎকণ্ঠা-তীব্র স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ দূত?"

দূত উত্তর না দিয়া ভূপৃষ্ঠে শয়ন করত যথারীতি প্রণাম আরম্ভ করিল; এবং কর্ণ, নাসিকা ইন্দ্রিয়াদি স্পর্শান্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজা ব্যস্ত হইয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "দূত, সংবাদ কি?"

দূত উত্তর করিল, "মহারাজ, পাঠান অগ্রসর হইতেছে। কালাপাহাড় ময়ূরভঞ্জের দিকে যাইতেছে—কতলু খাঁ যাজপুর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। যুবরাজ অনুমান করিতেছেন, কালাপাহাড় ময়ূরভঞ্জে উপস্থিত না হইলে কতলু খাঁ যাজপুর আক্রমণ করিবে না। যাজপুর রক্ষা করিবার জন্য আরও সৈন্যের প্রয়োজন হইবে। তিনি আপনার নিকট আরও এক লক্ষ পাইক প্রার্থনা করিয়াছেন।"

রাজা সহসা কোনও উত্তর দিলেন না। সভাসদ্‌বর্গের মধ্যে উচ্চকণ্ঠে পরামর্শ চলিতে লাগিল। কেহ কাহারও কথা শুনে না। জনতার মধ্যে একটা কোলাহল উঠিল। রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বিরক্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কলরব তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল—সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজা বলিলেন, "খাণ্ডাইতগণ, আপনারা প্রস্তুত হউন—আমার যাবদীয় সৈন্য প্রস্তুত হউক—আমি স্বয়ং ময়ূরভঞ্জে যাইব।"

কুজঙ্গাধিপতি বলিলেন, "আমরা থাকিতে আপনি কেন যাইবেন?

আপনি বারোবাটী দুর্গ রক্ষা করুন। আমরা একলক্ষ সৈন্য লইয়া ময়ূরভঞ্জে যাইতেছি।"

রাজা। উত্তম—তাহাই হউক। গণকঠাকুর, পঞ্জিকা-দৃষ্টে যাত্রার লগ্ন স্থির কর।

গণকঠাকুর সিংহাসন-নিম্নে একখানি পৃথক্ আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ঠিক শুনেন নাই, রাজা কোন্ কার্য্যের জন্য লগ্ন স্থির করিতে আদেশ করিয়াছেন। তিনি তখন লড়াইয়ের বৃত্তান্ত শ্রবণ করত বড়ই ভীত হইয়া ভাবিতেছিলেন, এক্ষণে কটক ছাড়িয়া সপরিবারে পলায়ন বিধেয় কিনা? এমন সময় রাজার আদেশ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি চমকিত হইয়া রাজার পানে ফিরিলেন; এবং ক্রোড়স্থ পঞ্জিকাপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই বলিলেন, "মহারাজ, পলায়নের উপযুক্ত লগ্ন সমুপস্থিত; এ সকল কার্য্যে বিলম্ব অবিধেয়।"

রাজা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "আপনাকে পলায়নের লগ্ন স্থির করিতে বলা হয় নাই।"

গণক। তবে সপরিবারে পলায়ন বিধেয় কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন?

রাজা রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ভীরু ব্রাহ্মণ—"

জনতার ভিতর হইতে এক ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিল, "মহারাজ, ব্রাহ্মণ ভীরু নয়, ভীরু আপনি।"

সকলে চমকিত হইয়া ধৃষ্ট বক্তার পানে ফিরিয়া দেখিল। দেখিল, বক্তা বাঙ্গালী। তাহার অঙ্গে বর্ম্ম—কটিতে অসি—মস্তকে শিরস্ত্রাণ। বক্তার একজন সহচর ছিল; সেও বাঙ্গালী—যোদ্ধবেশী। তাহার স্কন্ধের উপরি ভর দিয়া আপাত্য বক্তা ধীরে ধীরে সিংহাসন অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

"আমি ব্রাহ্মণ, কিন্তু ভীরু নই। আমার গৃহে চোর প্রবেশ করিলে তাহাকে তাড়াইবার জন্য আমি শুভ লগ্নের অপেক্ষা করি না।"

রাজা কহিলেন, "ব্রাহ্মণ, তুমি প্রগল্‌ভ।"

ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, "মহারাজ, আপনি আজীবন চাটুকারের কথা শুনিয়া আসিতেছেন; সত্য কথা কখন শুনেন নাই—স্তাবক বা প্রতারক ব্যতীত প্রকৃত মানুষ কখন দেখেন নাই। মহারাজ আপনার গৃহে তস্কর প্রবেশ করিয়াছে; এক্ষণে আপনি জ্যোতির্ব্বিদের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া সেনাপতিকে আহ্বান করুন।"

একজন সভাসদ্ বলিয়া উঠিলেন, "বাঙ্গালী আসিকিরি মোদোর কাপুরুষ কইছন্তি।"

তেজস্বী ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "সত্যই বাঙ্গালী আসিয়া তোমাদের কাপুরুষ বলিতেছে। ত্রিবেণীতে তোমরা লড়াই কর নাই—কেবল পলাইয়াছ। মহামন্ত্রী যেমন তাঁহার সৈন্যসহ সরিয়া দাঁড়াইলেন, অমনি তোমরা সকলে পলায়ন আরম্ভ করিলে। একবার পলায়ন শিক্ষা করিলে আর কখন লড়াই করিতে পারিবে না।"

সভাসদ্। কেন, এই মাত্র আমাদের সংবাদ-দাতা বলিয়া গেল, আমাদের পাইকরা এক এক জনে এক এক হাজার পাঠান মারিয়াছে; আর তুমি বল কিনা লড়াই হয় নাই। মহারাজ, বাঙ্গালীরা বড় মিথ্যাবাদী।

ব্রাহ্মণ। মিথ্যাকথায় বাঙ্গালী কখন তোমাদের অতিক্রম করিতে পারিবে না।

সভাসদ্। তুমি কি ত্রিবেণীর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলে?

ব্রাহ্মণ। ছিলাম—লড়াইও করেছি।

রাজা বলিলেন, "তুমি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছ—বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ কি অস্ত্র ধরিতে শিখিয়াছে?"

ব্রাহ্মণ। শিখিয়াছে অনেকদিন, কিন্তু এক্ষণে ভুলিয়া আসিতেছে।

রাজা। আমি জানিতাম, বাঙ্গালী শুধু স্তুতি ও পদলেহনে পটু।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ বিদ্রূপ করিবেন না। আপনারা অক্ষতদেহে গৃহে বসিয়া বাঙ্গালীর নামে অযথা কলঙ্ক অর্পণ করিতেছেন, আর সেই বাঙ্গালী সুদূর বাঙ্গালা হইতে হিন্দুধর্ম্মরক্ষার্থ উৎকলভূমে ছুটিয়া আসিয়াছে—দেহের রক্ত ত্রিবেণীর ক্ষেত্রে ঢালিয়াছে। এই দেখুন মহারাজ, আমার অঙ্গে এখনও শত অস্ত্রের লেখা—"

বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ নিজের দেহ হইতে বর্ম্ম, শিরস্ত্রাণ উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন। তখন সকলে বিস্মিতনয়নে দেখিল, ব্রাহ্মণের পরিধেয় বস্ত্র রুধির-রঞ্জিত—মস্তকে ও ললাটে অস্ত্রচিহ্ন—অঙ্গে সর্ব্বত্র ক্ষত। ক্ষত-মুখ হইতে তখনও রক্ত নির্গত হইতেছে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি সেই বাঙ্গালী যাহার কথা দূত ক্ষণপূর্ব্বে বলিতেছিল?"

ব্রাহ্মণ মস্তক আন্দোলনে সম্মতি জানাইয়া বলিলেন, "মহারাজ, এবার বিপদ্ বড় সামান্য নয়,—প্রতিহিংসাপরায়ণ বাঙ্গালী, পাঠানবাহিনী লইয়া পুণ্যময় উৎকলভূমি ধ্বংস করিতে আসিয়াছে। আমি আর কি করিতে পারি মহারাজ? কতিপয় অনুচর লইয়া আপনাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছি।"

মুকুন্দদেব সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণের হস্তধারণ করিলেন; বলিলেন, "আমার রূঢ়তা মার্জ্জনা করুন। আপনার ন্যায় আত্মত্যাগী, আপনার ন্যায় যোদ্ধা বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিতে পারে, তা' আমার ধারণা ছিল না। আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

"আমার পরিচয় অতি সামান্য। নিবাস বঙ্গভূমি—জন্ম ব্রাহ্মণকুলে—শিক্ষা একজন ভূস্বামী—আমার নাম গদাধর।"

"আপনার সঙ্গে কত অনুচর আছে?"

"ছিল পাঁচ শত ; এক্ষণে দুইশত মাত্র অবশিষ্ট আছে।"

"আপনাকে আমি পঞ্চসহস্র সৈন্যের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিলাম।"

গদাধর উত্তর করিলেন, "আপনার অনুগ্রহে কৃতার্থ হইলাম, কিন্তু আমি কি করিতে পারি মহারাজ, যদি আপনার সৈন্যেরা বিশ্বাস-ঘাতক হয় ?"

রাজা চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সৈন্যেরা বিশ্বাসঘাতক ?"

গদা। ত্রিবেণী ক্ষেত্রে স্বচক্ষে যা' দেখেছি, তাই আপনার নিকট নিবেদন করছি।

রাজা। আমি নিজের চক্ষে দেখিলেও যে বিশ্বাস করিতে পারি না, উড়িষ্যাবাসী নিজের গৃহ, প্রাণের ইষ্টদেবকে যবনের হাতে তুলিয়া দিতেছে।

গদা। বাঙ্গালা পতনের পূর্ব্বে আমরাও বিশ্বাস করিতে পারি নাই, বাঙ্গালী কোন দিন আত্মগৃহ বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে।

রাজা সে কথায় কাণ না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিশ্বাসঘাতক কে? সকলে কি ?"

গদাধর উত্তর করিলেন, "না ; একজনমাত্র বিশ্বাসঘাতক। সে ব্যক্তি কিন্তু অনেক উচ্চে অধিষ্ঠিত।"

রাজা চিন্তামগ্ন হইলেন। গদাধর বলিলেন, "তাই বলিতেছিলাম মহারাজ, আর বিলম্ব করিবেন না—বিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতককে বাঁধিয়া আনিতে আপনি স্বয়ং সসৈন্যে যাত্রা করুন।"

রাজা বলিলেন, "হায়, কে জানিত যে, উড়িষ্যায় কোন দিন স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক জন্মিবে।"

রাজার বাম পার্শ্ব হইতে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "মহারাজ, অনুমতি করুন, আমি সেই উড়িষ্যার কলঙ্ক বিশ্বাসঘাতককে বাঁধিয়া আনি।"

এই ব্যক্তি সম্রাট ইব্রাহিমের হতভাগ্য পুত্র করিম সা। রাজা বলিলেন, "উত্তম পরামর্শ। আপনি দশ হাজার সৈন্য লইয়া সে বিদ্রোহী প্রজাকে ধরিয়া আনিতে অনতিবিলম্বে যাত্রা করুন।"

করিম সা। মহারাজ সে বিদ্রোহী কে? তাহাকে কোথায় পাইব?

রাজা সহসা কোন উত্তর না দিয়া চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিলেন। সকলে নীরব—উৎকর্ণ। রাজা বলিলেন, "সে ব্যক্তি—"

রাজার বাক্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই এক ব্যক্তি জনতা ভেদ করিয়া ত্বরিতপদে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "মহারাজ, আবার এক ভয়ানক বিপদ উপস্থিত। মহামন্ত্রী দনার্দ্দন বিদ্রোহ-পতাকা উড়াইয়া দেশমধ্যে ভীষণ আগুন জ্বালিয়াছেন। দলে দলে নির্ব্বোধ প্রজা তাঁহার পতাকা-নিম্নে সমবেত হইতেছে।"

সভাসদ্‌বৃন্দ চমকিত ও স্তম্ভিত হইল। সেই বিশাল কক্ষমধ্যে একটি অস্ফুটধ্বনি উঠিল,—উড়িষ্যার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি দুর্গ হইতে নগর দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। নগরের এক প্রান্তে—যেখানে কাঠ্‌জুড়ি নদী বাঁকিয়া পূর্ব্ববাহিনী হইয়াছে—বাঁকের মাথায় একটি সুরম্য উদ্যান দৃষ্ট হয়। উদ্যানের মধ্যে সর্ব্বশোভা-ময়ী ক্ষুদ্র অট্টালিকা। গৃহ বা উদ্যান নদীগর্ভ হইতে দৃষ্ট হয় না। বড় বড় গাছ নদীর ধারে এমনই ভাবে দাঁড়াইয়া আছে যে, দূর হইতে এ উদ্যানকে নিবিড় অরণ্য বলিয়া মনে হয়। অট্টালিকা তেমন উচ্চ বা প্রশস্ত নয়, কিন্তু অতি সুন্দরভাবে গঠিত ও সজ্জিত। বিলাসিতা যাহা কিছু কল্পনা করিতে পারে, তাহা এই ক্ষুদ্র বাটিকায় সংরক্ষিত হইয়াছে। এই গৃহ রাজা মুকুন্দদেবের বিলাসাগার; এক্ষণে ব্রজবালার বাসস্থান।

অট্টালিকার চারিধারে বিস্তীর্ণ উদ্যান। উদ্যানে ফুলের অভাব নাই—অভাবের সম্ভাবনাও নাই। যে দেশে ধর্ম্ম আছে—দেবদেবীর পূজা আছে, সে দেশে ফুল আপন হতেই জন্মায়।

উদ্যানের দুই ধারে কাঠ্‌জুড়ি নদী। নদী তত বড় নয়। তবে এখন যেমন নিদাঘে দেখা যায়, আগে তেমন ছোট ছিল না। এখন বৈতরণীতে নৌকা চলা ভার, কিন্তু উড়িষ্যার সুদিনে বড় বড় পণ্যবাহী জাহাজ বক্ষে লইয়া বৈতরণী সানন্দে ছুটিত। এক্ষণে সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়া গঙ্গা, পদ্মা, বৈতরণী সকলেই বিশাল দেহ সঙ্কুচিত করিতেছে। মানুষের দেহ মনও ছোট হইয়া আসিতেছে।

উদ্যানের একপ্রান্তে কাঠ্‌জুড়ির উপর পাথর-বাঁধা ঘাট। একদা অপ-

রাত্নে ব্রজবালা তাঁহার সঙ্গিনীসহ সেই ঘাটে স্নান করিতেছিলেন। বাঙ্গালীর মেয়ে দুই বেলা গাত্র ধৌত করে। সাজিবার আগে স্নান। প্রাতে গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একবার সাজে, সন্ধ্যায় পুণ্যভূমি শয্যা-গৃহে প্রবেশের পূর্ব্বে ভিন্ন প্রকারে সাজসজ্জা করে। ব্রজবালার গৃহকর্ম্ম নাই—শয্যাগৃহও নাই। তবু ব্রজবালা সংস্কারবশে দুই বেলা দুই রকম সাজসজ্জা করে।

নির্ম্মলা, আবক্ষ নিমজ্জমানা ব্রজবালাকে বলিল, "সন্ধ্যার সময় একটু দূর হইতে যদি কেহ তোমাকে দেখে, তাহা হইলে তাহার ভ্রম হয়।"

অবগাহিনী এক মুখ জল লইয়া নির্ম্মলার মুখের উপর কুলি করিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভ্রম হয় রে?"

নির্ম্মলা হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, "যেন একটি পূর্ণবিকশিত কমল ফুটিয়া রহিয়াছে।"

কমলাধার বড় বেশী প্রীত হইলেন না; কেননা, তাঁহার মুখের সঙ্গে পার্থিব কোন বস্তুর তুলনা হইতে পারে, ইহা তিনি মনে করিতেন না। তবে কমল জিনিষটা নিতান্ত মন্দ নয়। ব্রজবালা তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ-রাশি মুখের উপর ইতস্ততঃ ছড়াইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর এই চুলগুলো?"

নির্ম্মলা একটু মুস্কিলে পড়িল। বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণের সহিত তাহার আলাপ পরিচয় কোনও কালে হয় নাই। কি বলিবে স্থির করিতে পারিল না। ভাবিল, "কালি বলি; না, কালি বলিলে মুখের অপমানন৷ করা হয়। মুখে কালি, ছি! তবে কি বল্‌ব? মেঘ? কালো মেঘের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র। উপমাটি বেশ, কিন্তু এখানে ঠিক খাটে না। মুখখানাকে যে কমল বলেছি। তবে কি বলি?—"

"বল্‌না আমার চুলগুলো তবে কি?"

"যেন—যেন ভৃঙ্গদল মধুলোভে কমলের উপর আসিয়া বসিয়াছে।"

ব্রজবালা হাসিয়া বলিল, "এতগুলো ভ্রমর কমলের উপর বসিলে সে বেচারী আর বাঁচে না।"

নির্ম্মলা। আচ্ছা কমল যদি হ'তে না চাও, তবে আলো হও।

ব্রজবালা। সে কি রকম?

নি। অন্ধকারময়ী রজনীতে তরুদেহে যেন উজ্জ্বল আলোক।

ব্র। অন্ধকার রাত্রিতে গাছ দেখ্‌ব কেমন করে মূর্খ?

নি। তবে আর পার্‌লুম না, যা' হয় একটা হ'য়ে পড়।

ব্র। আমি কি হব জানিস?—

নি। বল।

ব্র। আমি উড়িষ্যার চাঁদ হব—রূপে গুণে 'শশী উজিয়ারা'।

অদূরে কি একটা ভাসিয়া যাইতেছিল; নির্ম্মলা নিবিষ্টচিত্তে তাহাই লক্ষ্য করিতেছিল; কোন উত্তর দিল না। একটু পরে নির্ম্মলা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "দেখ, দেখ, একটা মড়া ভেসে যাচ্ছে।"

ব্রজবালা ফিরিয়া দেখিল। দেখিল, সত্যই একটা শব আকাশের দিকে মুখ করিয়া মুদ্রিত নয়নে ভাসিয়া চলিয়াছে। তাহার মুখ অনাবৃত। পরিধানে একখানি বস্ত্র মাত্র। দেহ ক্ষীণ; বয়স ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ। মস্তক মুণ্ডিত, বর্ণ শ্যাম, মুখাবয়ব কুৎসিত নহে। তাহার চরণাগ্রভাগ দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু হস্ত অদৃশ্য। নির্ম্মলা শবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, "যাও, স্রোতে ভেসে যাও; এখন আর আকাশের দিকে তাকালে কি হবে?"

কথাটায় বিদ্রূপের ভাব ছিল না। কি ছিল, তা' নির্ম্মলাই জানে। বায়ুহিল্লোলে যেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বহিয়া গেল।

ব্রজবালা নিঃশ্বাস বা উক্তি কিছুই শুনিল না; সে তীক্ষ্ননয়নে শব লক্ষ্য করিতে লাগিল। শব স্রোতে ভাসিয়া ব্রজবালাকে অতিক্রম করিয়া

দূরে চলিয়া গেল; ব্রজবালা তবু নয়ন উঠাইল না, শব প্রতি চাহিয়া রহিল। নির্ম্মলা, ব্রজবালার ভাব দৃষ্টে একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি একদৃষ্টে কি দেখ্‌ছ?"

ব্রজবালা নয়ন না ফিরাইয়া উত্তর করিল, "লোকটা মরেনি বলে মনে হচ্ছে।"

"সে কি! না মরে মানুষ কখন ভাসতে পারে?"

"পারে—যে সন্তরণে দক্ষ, সে পারে।"

"আমি ত এমন মানুষ কখন দেখিনি।"

"তুমি সংসারের কিবা দেখেছ? আমিই এখনি তোমায় দেখাতে পারি জ্যান্ত মানুষ কিরূপে মড়ার মত ভেসে যেতে পারে।"

"আচ্ছা, সেটা না হয় মেনে নিলুম। এখন লোকটার খামকা এ এ রকম করে যাবার মতলব কি হ'তে পারে?"

ব্রজবালার নয়ন ভাসমান শবপ্রতি। সেটা তখন দূরে সরিয়া গিয়াছে এবং স্বল্পকালমধ্যে বাঁকের অন্তরালে গিয়া পড়িল। ব্রজবালা তখন নয়ন ফিরাইয়া বলিল, "উদ্দেশ্য কি বল্‌তে পারি না। দেশে শত্রু এসেছে—ছদ্মবেশী গুপ্তচর নানা ভাবে ঘুরতে পারে।"

নির্ম্মলা মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল, "তুমি পাগল, তাই পচা মড়ায় ছদ্মবেশী গুপ্তচর দেখ্‌ছ।"

ব্রজবালা কোনও উত্তর দিল না। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, অস্তপ্রায় রবি পর্ব্বতচূড়ায় বসিয়া রোদনোন্মুখ নয়নে জগতের নিকট বিদায় লইতেছেন। ব্রজবালা চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, স্থানটি বিরল। একটু দূরে—সহরের দিকে অনেক লোক। বাঁকের মাথায় মানুষ বা নৌকা দৃষ্টিগোচর হইল না। ব্রজবালা বলিল, "চল না কেন দেখি, মানুষটা কতদূর গেল?"

"তীর দিয়ে ত যাবার পথ নেই।"

"সাঁতার কেটে চল।"

"আবার উজান বয়ে ফিরতে হবে নাকি ?"

"না; বাঁকের ও-ধারে একটা মেটে ঘাট আছে; সেইখানে উঠে ঘরে যাব।"

বলিয়া ব্রজবালা স্রোতমুখে দেহ ভাসাইল; নির্ম্মলাও অনুবর্ত্তিনী হইল। উভয়ে সন্তরণপটু; কিন্তু ব্রজবালার মত দক্ষতা লাভ করিতে নির্ম্মলা পারে নাই। নির্ম্মলা বিস্মিত নয়নে দেখিল, মৃতদেহ যে ভাবে ইতিপূর্ব্বে ভাসিয়া গিয়াছিল, ব্রজবালাও সেই ভাবে ভাসিয়া চলিল। জলের উপর কোনরূপ হিল্লোল নাই—দেহাগ্রভাগেও বিশেষ কোন স্পন্দন নাই।—যেন একটী অম্ভোজিনী খরস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে; বড় দ্রুত নয়, তেমন ধীরেও নয়। নির্ম্মলাও তাহার পাশে পাশে যাইতে লাগিল—যেন একটী ভৃঙ্গ-পরিবীত কমল মৃণালসহ আর একটী কমলের অনুবর্ত্তন করিয়া চলিল। নৈশ অন্ধকার তখনও পৃথিবীতে উপনীত হয় নাই—পাখীর গান তখনও নীরব হয় নাই। নিকটে মনুষ্যাবয়ব দৃষ্ট হইতেছিল না, কিন্তু মানবকণ্ঠনিঃসৃত কলরব শ্রুত হইতেছিল। স্রোতস্বতী চঞ্চল, পৃথিবী চঞ্চল, আকাশ চঞ্চল। আবার যাহারা চঞ্চলা স্রোতঃস্বতী-হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া চলিয়াছে, তাহারাও চঞ্চল। স্বল্পকাল-মধ্যে ব্রজবালা ক্লান্ত হইয়া পড়িল; জিজ্ঞাসা করিল, "বাঁক কতদূর ?"

"এখনও অনেকটা।"

ব্রজবালা তখন ঘুরিয়া সহজভাবে সন্তরণ আরম্ভ করিল; এবং সলিলরাশি বিদলন করিতে করিতে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। উভয়ে স্বল্প সময় মধ্যে বাঁকের অপর পার্শ্বে আসিয়া উপনীত হইল। ব্রজবালা যে ঘাটের কথা বলিয়াছিল, সে ঘাটে আসিয়া উভয়ে দাঁড়াইল।

সম্মুখে, পার্শ্বে চাহিয়া দেখিল, কোথাও সে মৃতদেহ দৃষ্ট হইল না, তখন তাহারা ঘাটের উপর উঠিল। উঠিয়া দেখে, মানুষের পায়ের দাগ কোমল মৃত্তিকার উপর অঙ্কিত রহিয়াছে। যে যে স্থানে দাগ পড়িয়াছে, সেই সেই স্থান জলসিক্ত। দেখিলেই মনে হয়, একটা লোক স্বল্পকাল পূর্ব্বে জল হইতে উঠিয়া ঘাট বাহিয়া চলিয়াছে। ব্রজবালা সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইল এবং তীক্ষ্ণনয়নে জলের সন্নিকটস্থ ভূখণ্ড পর্য্যবেক্ষণ করিল। অবশেষে পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। নির্ম্মলা একটু ভীত হইয়াছিল; বলিল, "তুমি যা' বলেছিলে, তাই হ'লো! এখন সে গেল কোথা?"

গেল কোথা ব্রজবালাও তাই ভাবিতেছিল। নিকটে লোকালয় নাই —জনমানবও নাই। এ ঘাট কাহারও ব্যবহারে সচরাচর লাগে না— পথও বড় সুবিধাজনক নয়। নদীতট বালুকাময়। বালুকার উপর পায়ের দাগ অনুসরণ করিয়া ব্রজবালা চলিতে লাগিল; অবশেষে নিজের উদ্যানমধ্যে গিয়া পড়িল। সেখানে কিয়দ্দূর পদচিহ্ন পাইল; তারপর সহসা সকল চিহ্ন বিলুপ্ত হইল। ব্রজবালা বুঝিল, যে স্থানের মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত কঠিন, লোকটা সেই স্থানের উপর পা রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। লোকটা যে বিশেষ চতুর এবং সে যে অসদভিপ্রায়ে নদী পারে আসিয়াছে, তদ্বিষয়ে ব্রজবালার মনে কোন সন্দেহই রহিল না। ব্রজবালা ক্ষিপ্রনয়নে একবার চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিল—কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইল না। অতঃপর ভবনমধ্যে প্রবেশ করিল।

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়াই ব্রজবালা একজন পুররক্ষীকে ডাকাইল। সে আসিলে তাহাকে বলিল, "তুমি এখনি মহারাজের কাছে যাও। তাঁহাকে আমার নমস্কার দিয়া বলিবে আমি তাঁহার দর্শনপ্রার্থী।"

রক্ষী প্রস্থানোদ্যত হইলে ব্রজবালা আবার বলিল, "তাঁহাকে কর্ম্মান্তরে

ব্যস্ত দেখিলে আমার এই অঙ্গুরীয় তাঁহাকে দিও—আর কিছু বলিতে হইবে না।"

বলিয়া রক্ষীর হস্তে ব্রজবালা একটি অঙ্গুরীয় দিল। পুর-রক্ষী প্রণামান্তে বিদায় হইল, এবং অশ্বারোহণে প্রাসাদাভিমুখে ধাবিত হইল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রক্ষীকে পাঠাইয়া ব্রজবালা সোপানোপরি আসিয়া বসিল, নির্ম্মলাও কাছে আসিয়া বসিল। সে বিশেষ ভীত হইয়া পড়িয়াছিল; মুহূর্ত্তের জন্যও সে, ব্রজবালার সঙ্গ পরিত্যাগ করে নাই। দুইজনে নীরবে ক্ষণকাল বসিয়া রহিল। ক্রমে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। কোথাও একটু সামান্য শব্দ হইলে নির্ম্মলা ভীত হইয়া চারিদিকে নেত্রপাত করিতে লাগিল। পক্ষীর চীৎকার, বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর শব্দ, তাহাও নির্ম্মলার অসহ্য হইয়া উঠিল। অবশেষে বলিল, "আলো আন্‌তে বলব?"

"না।"

"তবে ঘরে চল।"

"সেখানে বড় গরম।"

নির্ম্মলা নিরুত্তর হইল। ক্ষণপরে পুনরায় বলিল, "এখানে আমার বড় ভয় করছে। যদি চোরটা—"

ব্রজবালা। চোর কা'কে বলছ নির্ম্মলা? যে এসেছে, সে চোর নয়—

ছদ্মবেশী গুপ্তচর। ভাবছ সে এখানে লুকিয়ে থাক্‌তে এসেছে? তা নয়, সে হয়ত এতক্ষণ নগরে বা দুর্গে প্রবেশ করেছে।

নি। তাই যদি হবে, তা'হলে সে সহজভাবে নৌকা করে আসতে পার্‌ত ত—

ব্রজ। না, তা' পার্‌ত না। নদীর ধারে—চারিদিকে—প্রত্যেক ঘাঁটিতে এমন কড়া পাহারা বসেছে যে, বাহিরের কোনও লোক সহজে নগরে প্রবেশ করতে পারে না। প্রবেশের অনুমতি যদি অনেক হাঙ্গামা করে পায়, তা'হলেও তাকে অনেক জবাব দিহি কর্‌তে হয়।

নি। তা' লোকটা রাত্রে এলেই ত পারত, আমরা তা' হলে ত তা'কে দেখ্‌তে পেতাম না।

ব্রজ। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে নগর ও দুর্গের দ্বার যে বন্ধ হয়ে যায়, তা' বুঝি জান না?

নি। তবে এই লোকটা কি ক'রে নগরে ঢুক্‌বে?

ব্রজ। পরিচয় দিতে হবে—সাঙ্কেতিক কথা বলতে হবে—

এমন সময় অশ্বশালার দিকে একটা গোল উঠিল। নির্ম্মলা ভয়ে জড়সড় হইয়া ব্রজবালার গা ঘেঁসিয়া বসিল। ব্রজবালা বলিল, "দেখে এস, কিসের গোল।"

নির্ম্মলা একটুও না নড়িয়া উত্তর করিল, "দেখ্‌তে হবে কেন, চোরটা ধরা পড়েছে।"

ব্রজবালা। সম্ভব নয়; আমার অনুমান, ঘোড়া চুরি গেছে।

ব্রজবালার অনুমান সত্য হইল। দুই তিন জন অশ্বরক্ষক পরস্পর কলহ করিতে করিতে আসিয়া ব্রজবালাকে সেই সংবাদ দিল। ব্রজবালা কোনওরূপ বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া বলিল, "তোমাদের একজন এখনি

নগরপালের কাছে যাও; তাঁহাকে এই অপহরণের সংবাদ দিয়ে বলো লোকটা সম্ভবতঃ দুর্গের আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নগরে বা দুর্গে যেখানে তা'কে পাওয়া যায়, এখনি যেন তাকে ধরে আনা হয়। বলো আমার আদেশ।"

অশ্বরক্ষীরা প্রণাম করিয়া নীরবে প্রস্থান করিল। নির্ম্মলা বলিল, "দেখ, তুমি আমার চেয়ে বয়সে ছোট হ'লেও, তোমার প্রতি আমার ভক্তি শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়্ছে। তুমি যথার্থই রাণী হবার উপযুক্ত। আজ হ'তে আমিও তোমাকে রাণী বলে ডাক্‌ব।"

ব্রজবালাকে সকলেই রাণী বলিয়া ডাকিত। দেশের প্রথানুসারে রাজার উপপত্নী মাত্রই রাণী নামে অভিহিতা। বিবাহিতা স্ত্রী যে সম্মান পাইত, রাজার উপপত্নীরাও সেই সম্মানের অধিকারিণী। তবে যিনি পাটরাণী, তিনি মহারাণী নামে অভিহিত হইতেন। ব্রজবালা ও নির্ম্মলা, এ প্রথার অস্তিত্ব অনবগত ছিলেন। ব্রজবালা, রাজার উপপত্নী ছিলেন না; অথচ তিনি মহিষীর সম্মান লাভ করিতেন। সুরম্য অট্টালিকা, অগণ্য দাসদাসী, রাজার ভালবাসা সকলই তিনি পাইয়াছিলেন; তবু তিনি রাজাকে দূরে রাখিতেন। রাজা যত নিকটে আসিতে চেষ্টা করিতেন, ব্রজবালা তত দূরে তাঁহাকে ঠেলিয়া রাখিতেন। রাজা বিতথপ্রয়াস হইয়াও ব্রজবালার আশা পরিত্যাগ করেন নাই।

নির্ম্মলার কথা শুনিয়া ব্রজবালা ভাবিল, সে কি কখন রাণী হইতে পারিবে? রাণী হইতে হইলে ত মুকুন্দদেবকে বিবাহ করিতে হইবে। বিবাহ ত হ'তে পারে না। তবে কি সে মুকুন্দদেবের উপপত্নী হইবে? কখনই না। তবে কি? কোন্ আশা বুকে ধরিয়া, কোন্ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া ব্রজবালা রাজাকে মুগ্ধ, করায়ত্ত করিতে যত্নবতী হইতেছে? ব্রজবালা ভাবিয়া কূল পাইল না। সহসা দূরে অশ্বপদধ্বনি

তাহার কর্ণগোচর হইল। নির্ম্মলা চমকিয়া উঠিল। ব্রজবালা বলিল, "রাজা আসছেন।"

নির্ম্মলা একটু উৎকর্ণ হইয়া শুনিল। শব্দে বুঝিল, অনেকগুলি ঘোড়া আসিতেছে। রাজা কখন একা আসেন না; দশ বার জন শরীর-রক্ষী তাঁহার সঙ্গে আসে। রাজা উদ্যানে প্রবেশ করিলে তাহারা দেউড়ীতে অপেক্ষা করে। বিশেষ এখন যুদ্ধের সময়—রাজা সতত সতর্ক।

অশ্বপদশব্দ শুনিয়া ব্রজবালা উঠিল; এবং কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানি বৃহৎ দর্পণ-সম্মুখে দাঁড়াইল। স্থানভ্রষ্ট কেশগুচ্ছ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া অলঙ্কারের পেটরা খুলিল। কণ্ঠে মুক্তার হার, প্রকোষ্ঠে হীরকবলয়, বাহুতে কেয়ূর, নাসিকায় বেসর, কটিদেশে সুবর্ণ-মেখলা, কর্ণে কুণ্ডল পরিধান করিল। আলুলায়িত কুঞ্চিত কেশরাশি তখনও সিক্ত ছিল; কেশ আর বাঁধা হ'ল না। ব্রজবালা সেই নীরদতুল্য কেশের মধ্যে মধ্যে নানা জাতীয় ফুল বাঁধিয়া দিল। মুটুক লইয়া নাড়া-চাড়া করিল, কিন্তু তাহা পরিল না। চক্ষে অঞ্জন, ভ্রূযুগের মধ্যে সিন্দূর-বিন্দু, চরণে অলক্তক দিতে ভুলিল না। ওষ্ঠাধর বা ভ্রূযুগল রঞ্জিত করিবার কোনই প্রয়োজন হইল না। ওষ্ঠাধর কমলদলতুল্য সতত রক্তিমাভ; ভ্রূদ্বয় যেন নিপুণ চিত্রকরের দ্বারা পটেতে অঙ্কিত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ব্রজবালার রূপ আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে; ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী এক্ষণে বর্ষাসমাগমে বিশাল নদীতে পরিণত হইয়াছে। যে বিকাশোন্মুখ মুকুলটিকে দেখিয়া কালাচাঁদ ও গদাধর একদিন আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন, সে মুকুল এক্ষণে পূর্ণবিকশিত—সৌন্দর্য্যভারাবনত।

সর্ব্ব আয়ুধে ভূষিত হইয়া ব্রজবালা যখন হাসিতে হাসিতে আকর্ণ-বিস্তৃত নীলোৎপলতুল্য চক্ষু দুইটী তুলিয়া নির্ম্মলার পানে চাহিল, তখন নির্ম্মলাও ক্ষণেকের জন্য আত্মবিস্মৃত হইল। পরে বলিল, "আর কেন,

যে ব্যক্তি পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, তাহাকে মারিবার জন্য আর এ রণবেশ কেন ?"

"তুই যা'—রাজাকে বসাগে—আমি যাচ্ছি।"

নির্ম্মলা প্রস্থান করিল। ব্রজবালা আবার দর্পণ-সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অলকাগুচ্ছ আবার ঈপ্সিত স্থানে সন্নিবিষ্ট করিল। অঞ্চল দিয়া মুখখানি বারম্বার মুছিল; দর্পণের উপর দুই একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। দর্পণমধ্যস্থ মনুষ্যকে নানারূপ মুখভঙ্গিমা দেখাইল; মুখ টিপিয়া একটু হাসিল; তার পর গম্ভীর হইল এবং গজেন্দ্রগমনে কক্ষান্তরে রাজেন্দ্রদর্শনে প্রস্থান করিল।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাজা একটি বড় ঘরে বিস্তৃত শয্যার উপর উপবিষ্ট ছিলেন। ঘরটি বেশ সাজান। মাঝে মাঝে পাথরের থাম, আর সেই সব থামের গাত্রে বহুসংখ্যক সুগন্ধি দীপ জ্বলিতেছিল। প্রাচীরের গাত্রে অনেক চিত্র; নগ্ন রমণীর চিত্রের সংখ্যাই কিছু বেশী। ফুলের মালার কোন ত্রুটি ছিল না,—চারিদিকে নানাবিধ ফুলের মালা ঝুলিতেছিল।

ব্রজবালা ধীরে ধীরে রাজার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। রাজা বলিলেন, "আজ আমার পরম সৌভাগ্য তুমি আমার দর্শনেচ্ছু হয়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ—"

ব্রজবালা যখন অগ্রসর হইয়া ক্রমে আলোকমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তিনী

হইল, তখন তাহার সমগ্র রূপবিভা রাজার নয়নগোচর হইল। রাজা অভিভূত হইয়া পলকশূন্য নয়নে ব্রজবালার পানে চাহিয়া রহিলেন। ব্রজবালা তাহা লক্ষ্য করিল; এবং তাহার ওষ্ঠের উপর একটু হাসি ভাসিয়া গেল। একটু হাসি লইয়াই সে ঘরের ভিতর আসিয়াছিল; কিন্তু এখন সে ধারকরা হাসির স্থানে একটু গর্ব্বের, একটু আনন্দের হাসি ভাসিয়া গেল। ব্রজবালা, রাজার দিকে ঠিক পিছন ফিরিল না, কিন্তু মুখ ফিরাইয়া দূরে দাঁড়াইল। রাজার লালসানলে আহুতি পড়িল।

তিনি ডাকিলেন, "ব্রজবালা!"

উত্তর নাই।

"রাণি!"

"কে রাণী? আমি আপনার রাজ্যের একজন সামান্য প্রজা মাত্র।"

"তুমি প্রজা! আমি যে তোমারই আশ্রিত—অনুজীবী—দাসানুদাস।"

ব্রজবালা হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "শুনেছি মহারাজের পাঁচশত মহিষী আছে—"

রাজা। মোটে পাঁচশত! সে কি ব্রজবালা?

ব্রজ। আপনার মহিষীর ভাণ্ডার অক্ষয় হউক।

রাজা। তোমার আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য। এখন তুমি কবে আমার মহিষী হ'বে?

ব্রজ। বলেছি ত যতদিন না যুদ্ধ শেষ হয়, ততদিন আমার ব্রত উদ্‌যাপিত হবে না। আমি আপনার সামান্য দাসী মাত্র, আমার উপর পীড়াপীড়ি কেন?

অকস্মাৎ রাজার প্রফুল্লতা নিবিয়া গেল; এবং গাম্ভীর্য্য ও বিষাদ আসিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল অধিকার করিল। রাজা বলিলেন, "এ জীবনে বুঝি তবে তোমাকে পাইলাম না।"

ব্রজবালা বুঝিল, রাজার বেদনা কোথায়। রাজ্য, রাণী, প্রাণ সব যাইতে বসিয়াছে। রাজার দুঃখ বোধ হয় তাহার অন্তর স্পর্শ করিল; বলিল, "আমি ত চিরদিনই আপনার।"

রাজা। তবে এস আমার রাণী—

ব্রজবালা শয্যার উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা বলিলেন, "বসো।" ব্রজবালা বসিলেন না; বলিলেন, "আপনার নিকট আমার একটি নিবেদন আছে।"

রাজা। ব্রজবালা, অনেকদিন পরে তোমাতে আমাতে আজ সাক্ষাৎ, আজ আর রাজ্যের কথা, যুদ্ধবিগ্রহের কথা—

ব্রজ। না শুন্‌লে চল্‌বে কেন? একজন গুপ্তচর—

রাজা। সে কি?

ব্রজ। সব বল্‌ছি। নির্ম্মলা!

নির্ম্মলা আসিল। ব্রজবালা বলিলেন, "রাজার একজন শরীররক্ষীকে ডাক।"

নির্ম্মলা প্রস্থান করিল। ব্রজবালা নতজানু হইয়া রাজার অদূরে বসিল। রাজা আনন্দে আপ্লুত হইয়া বলিলেন, "রাণি, মুকুট পর নাই কেন?"

ব্রজবালা নতমুখে উত্তর করিল, "আপনি যখন পরাইবেন, তখন পরিব।"

রাজা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; এবং হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে মুকুট অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় নির্ম্মলা আসিয়া সংবাদ দিল, দ্বারে রক্ষী দণ্ডায়মান। রক্ষী একজন সম্ভ্রান্তপদস্থ সৈনিক-কর্ম্মচারী।

ব্রজবালার ইচ্ছাক্রমে কর্ম্মচারী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং নতমুখে তাঁহার আদেশ অপেক্ষায় দাঁড়াইলেন। ব্রজবালা বলিলেন, "একজন

গুপ্তচর ক্ষণপূর্ব্বে ছদ্মবেশে নগরমধ্যে প্রবেশ করেছে, সম্ভবতঃ দুর্গের আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনি দুর্গস্বামী দীনকৃষ্ণকে বল্‌বেন, লোকটাকে যেন ধরে অচিরে এখানে পাঠান হয়। রাজা অপেক্ষায় আছেন।"

কর্ম্মচারী প্রস্থান করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে রাণি?"

ব্রজবালা তখন ঘটনাটি আদ্যন্ত বলিলেন। রাজা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন; এবং রাণীর বুদ্ধি বিবেচনার অনেক সুখ্যাতি করিলেন। এমন সময় নগরপালের নিকট যে লোকটা প্রেরিত হইয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল,—অশ্ব বা অশ্বারোহী কাহাকেও পাওয়া গেল না।

রাজা একটু উদ্বিগ্ন হইলেন; বলিলেন, "দেখিতেছি আমার চেয়ে দনার্দ্দন চতুর—তা'র লোকেরা আমার লোকের চেয়ে ধূর্ত্ত ও কর্ম্মঠ। আমার কপালগুণে দুর্গস্বামী, নগরপাল, মন্ত্রী সকলই অকর্ম্মণ্য—"

"মহামন্ত্রী দনার্দ্দন নাকি বিদ্রোহী হয়েছে?"

"তা' কি তুমি জান না?"

"তা'কে ধরে আন্‌বার কি ব্যবস্থা হয়েছে?"

রাজা সহসা কোন উত্তর করিলেন না। ব্রজবালা দেখিল, রাজার সমস্ত বক্ষ আন্দোলিত করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। বলিল, "রাজা!"

"কি রাণি?"

"এত কাতর কেন?"

"ভাবিতেছিলাম, আজ যদি দনার্দ্দন বিদ্রোহী না হত, তা'হলে এ কাফেরগুলাকে ফুৎকারে উড়ায়ে দিতাম।"

"রাজা, ভবিতব্য অলঙ্ঘনীয়; কিন্তু পুরুষকারেরও প্রয়োজন। আপনি কি ব্যবস্থা করেছেন?"

"কি আর করব ব্রজবালা? বিদ্রোহীকে বেঁধে আন্‌তে করিম সাকে পাঠিয়েছি।"

"ভুল করেছেন।"

"কি ভুল করেছি?"

"হিন্দু-বিদ্রোহ দমনার্থ মুসলমানকে পাঠান ভুল হয়েছে।"

রাজা কোনও উত্তর না দিয়া ব্রজবালার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ব্রজবালা বলিল, "মুসলমানকে দেখিলে হিন্দুরা জ্বলিয়া উঠিবে—যাহারা এখনও বিদ্রোহীর দলে যোগ দেয় নাই,—ইতস্ততঃ করিতেছে, তাহারাও অতঃপর যোগ দিবে। যে আগুন নিবাইতে প্রয়াস পাইতেছেন, সে আগুন আরও জ্বলিয়া উঠিবে।"

রাজা। ঠিক বলিয়াছ ব্রজবালা! যে কথা আমার সভাসদেরা বলে নাই, আমার বুদ্ধিতে যোগায় নাই, সে কথা আমি তোমার মুখে শুনিলাম। এখন তুমি আমায় কি পরামর্শ দেও?

ব্রজ। আপনি স্বয়ং বিদ্রোহদমনার্থ যাত্রা করুন। আপনাকে দেখ্‌লে অনেকে অস্ত্র পরিত্যাগ করবে; যাহারা ইতস্ততঃ করছে, তাহারা আপনারই পক্ষে অস্ত্র ধারণ করবে। অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্রোহ-আগুন নিবে যাবে—আপনার প্রজা আপনারই হবে।

রাজা। আমি কেমন করে যাই? কত্‌লু খাঁ যাজপুরে, কালাপাহাড় ময়ূরভঞ্জে, গৃহে গুপ্ত শত্রু, আমি এ অবস্থায় রাজধানী ছেড়ে কেমন করে দূরে যাই?

ব্রজ। রাজধানীর ভার আর কাহারও হাতে দিয়ে যান।

রাজা। এ সময় যে পুত্রকেও বিশ্বাস করে রাজধানীর ভার দিতে পারি না।

ব্রজ। আমাকে বিশ্বাস করেন কি?

রাজা। তোমাতে আমাতে ত প্রভেদ নেই ব্রজবালা।

ব্রজ। তবে আমার উপর রাজধানীর ভার দিন।

রাজা। তোমার উপর? ক্ষুদ্র বালিকা, তোমার উপর!

ব্রজ। বালিকা বটে, কিন্তু নির্ব্বোধ নই। আপনার ইচ্ছামত ব্যবস্থা করিতে পারেন।

বলিয়া ব্রজবালা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা বলিলেন, "রাগ করো না ব্রজবালা! কিন্তু তুমি রাজ্য, যুদ্ধ, দেশ-শাসন এ সকলের ত কিছুই বুঝ না।"

ব্রজ। উড়িষ্যার রাজমহিষীর যতটা বুঝা উচিত, ততটা বুঝি না বটে, কিন্তু আপনার দুর্গস্বামী ও নগরপালকে এখনও অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারি।

রাজা উত্তর করিলেন না। ব্রজবালা বুঝিল, রাজা তাহার কথা প্রত্যয় করিলেন না। বলিল, "বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করুন।"

রাজা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপে পরীক্ষা করব?—তলওয়ার ধরে?"

ব্রজবালা একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিল; বলিল, "তলওয়ার ধরতে পারলেই মানুষ একজন বড় রাজনীতিজ্ঞ বা দেশশাসক হল না। পশুবল নিকৃষ্ট বল। সেনাপতি লড়াই করে না—রাজার তরবারি কোমর হ'তে হাতে উঠে না। যাহারা নিকৃষ্ট বলের অধিকারী তাহারাই লড়াই করে। আজ যদি আপনার রাজ্যে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ থাকিত, তাহা হইলে সে বিশ্বাসঘাতক দনার্দ্দনকে নিকটে না রাখিয়া দূরে সেনাপতি করিয়া পাঠাইত না—হিন্দুবিদ্রোহ দমন করিতে মুসলমানকে নিয়োজিত করিত না। আপনারা বিস্মৃত হইয়াছেন, শাণিত বুদ্ধি, তীক্ষ্ণধার কৃপাণ অপেক্ষাও কার্য্যকরী; বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়াই

আপনাদের পরিবাপিত অঙ্কুর আজ এই বিষময় ফল প্রদান করিতেছে—"

রাজা একটু হাসিয়া বলিলেন, "রাণী, আজ তোমাকে মহামন্ত্রীর শূন্যপদে নিযুক্ত করিলাম।"

ব্রজ। বিদ্রূপ করিবেন না। আজ এই যে একটা গুপ্তচর আপনার রাজধানীর মধ্যে প্রবেশ করিল, তা' কা'র অনবধানতায়? কা'র অনবধানতায় সে লোকটা এখনও ধৃত হ'ল না? সৈন্য সান্ত্রী নিয়ে বড় বড় যোদ্ধারা যাহা করিতে পারেন নাই, তাহা এই ক্ষুদ্র বালিকা এইখানে বসিয়া করিতে পারে। ছিঃ, আপনারা তলওয়ার ধরিবার বড়াই করিবেন না।

রাজা। তুমি কি কর্‌তে পার ব্রজবালা?

ব্রজ। আমি এখনই তা'কে ধরে আন্‌তে পারি।

রাজা। আচ্ছা, তোমার কৃতিত্ব দেখা যাক্।

ব্রজবালা তখন তাহার একজন ভৃত্যকে ডাকিল। ভৃত্য আসিল। তাহার বয়স বেশী নয়—বিশ বৎসর হইবে। ছোঁড়াটাকে দেখিলেই খুব চতুর বলিয়া মনে হয়। তাহার নাম শান্ত; কিন্তু শান্তভাব তা'র মুখে চো'খে কোন স্থানেই লক্ষিত হয় না। ব্রজবালাকে সে অত্যন্ত ভয় করিত, ভক্তিও করিত। ভয় করিত তাহার রাণীত্বকে, ভক্তি করিত তাহার রূপকে।

ব্রজবালা জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁরে শান্ত, তুই ঘোড়ায় চড়্‌তে পারিস?"

শান্ত একটু হাসিয়া উত্তর করিল, "আমরা পাহাড়ী, পেট্ হ'তে পড়েই ঘোড়ার ঘাড় ধরি।"

ব্রজ। বেশ করিস্। এখন সেই সঙ্গে অন্ধকারে দেখাটাও কি অভ্যাস করেছিস্?

শান্ত। দিনের চেয়ে রাতে ভাল দেখ্‌তে পাই, রাণী-মা।

ব্রজ। আরও ভাল। সাঁতার জানিস্?

শান্ত। আমার সঙ্গে সাঁতার কাট্‌তে মাছও হার মেনে যায়।

ব্রজ। বাঃ তুমি একটি রত্ন। এখন ঘোড়ায় চড়ে দুর্গে যাও। ভিতরে যেও না—বাইরে থাক্‌বে। যেখানে যেখানে গড়খাই স্বল্প প্রশস্ত দেখ্‌বে, সেই সেই স্থানে অনুসন্ধান করবে। ভাল করে খুঁজলেই দেখ্‌তে পাবে একটা মানুষ জলের ভিতর লুকিয়ে আছে! কোন রকম শব্দ না করে মাছের মত সাঁতার কেটে যাবে। যদি জলে তা'কে দেখ্‌তে না পাও, তা'হলে দেয়ালের পানে চেয়ে দেখ্‌বে। যেখানে দেখ্‌বে একটা দড়ির মই ঝুলছে, সেইখানে লোকটাকে পাবে।

শান্ত। যদি সেখানে না পাই?

ব্রজ। নিশ্চয় পাবে। বেশী রাত্রি না হ'লে লোকটা দুর্গের ভিতর যাবে না।

শান্ত। লোকটাকে পেলে কি করব?

নির্ম্মলা থাকিতে পারিল না,—বলিল, "ভেজে চড়চড়ি করে খাবে।"

শান্ত অশেষ গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিল, "আমরা ছোট লোক, মানুষ খাই না।"

নির্ম্মলা কি বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু রাজার পানে চাহিয়া আত্ম-সংবরণ করিল। এবং মনকে প্রবোধ দিল যে, বারান্তরে শান্তকে সে কথাটা শুনাইয়া মনের জ্বালাটা মিটাবে।

ব্রজবালা বলিল, "লোকটাকে পেলে বেঁধে এখানে আনবে, একা না পার, দু'চারটা পাইক ডেকে নেবে—"

শান্ত নিজের বলিষ্ঠ দেহপ্রতি একবার সগর্ব্বে নেত্রপাত করিয়া বলিল,

"লোক ডাক্‌তে হবে না ; রাণী-মার হুকুম পেলে আমি গড়খাই তুলে আন্‌তে পারি।"

নির্ম্মলা বলিল, "বাহবা! কলা খেতে পার?"

শান্ত। পক্ক হলে পারি ; আর দগ্ধটা লোকবিশেষকে খাওয়াতে পারি।

নির্ম্মলা। আ মর পোড়ারমুখো—

ব্রজবালা বলিল, "শান্ত, আর দেরী করিস্‌ না—যা।"

শান্ত। হাঁ রাণী-মা, লোকটা দেখ্‌তে কেমন?

ব্রজ। তা'তে তোমার দরকার কি? যা'কে চোরের মত লুকিয়ে থাক্‌তে দেখ্‌বে, তা'কে ধর্‌বে।

শান্ত। যে আজ্ঞা।

শান্ত প্রস্থান করিল।

---

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাজা এতক্ষণ নীরব ছিলেন—বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন নাই। শান্ত প্রস্থান করিলে পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেমন করে জান্‌লে ব্রজবালা, লোকটা দুর্গের ধারে লুকিয়ে আছে?"

"তার হাতে মই আছে বলে।"

"তা'তে কি হ'ল?"

"গুপ্তচরের হাতে যখন মই, তখন সে দুর্গপ্রবেশের উদ্দেশ্যেই এসেছে—লোকের ঘরে সিঁদ দিতে আসে নি।"

"লোকটা যদি গুপ্তচর না হয়ে সাধারণ চোর হয়?"

"সাধারণ চোর মড়ার মত ভেসে আস্‌ত না—সাধারণ পথে সহজে নগরে প্রবেশ কর্‌ত।"

রাজা কথাটা একটু তলিয়া বুঝিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি তা'র হাতে মই দেখেছিলে?"

ব্রজ। না।

রাজা। তবে কেমন করে জান্‌লে তার হাত মই ছিল?

ব্রজ। লোকটা ঘাটের উপর উঠে নদীর দিকে ফিরে একটু দাঁড়িয়েছিল। তা' তার পায়ের দাগ দেখে বুঝতে পেরেছিলাম, পরে একটা কি টেনে নিয়ে যাচ্ছিল; সে জিনিষটার শেষে লোহার আংটা ছিল; তারও দাগ মাটীর উপর ছিল। ভাবে বুঝেছিলাম, লোকটা জলের ভিতর দিয়ে

একটা দড়ির মই টেনে আন্‌ছিল। যে এমনই ভাবে গোপনে মই টেনে আনে, তার উদ্দেশ্য কি তা'ও বুঝেছিলাম।

রাজা চিন্তামগ্ন হইলেন। অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া ব্রজবালার পানে চাহিলেন। বলিলেন, "ব্রজবালা, জানিতাম নারী জাতি আমাদের সখের, বিলাসের সামগ্রী—গৃহের অলঙ্কারস্বরূপা—অন্তঃপুরে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার জন্যই তাহাদের সৃষ্টি; এখন দেখিতেছি—"

ব্রজবালা মাথা নাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি অন্তঃপুরে আবদ্ধ হয়ে থাক্‌তে জন্মি নি।"

ব্রজবালা একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মাথার কাপড় কখন যে পড়িয়া গেল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। মস্তক সঞ্চালনে হীরকমণ্ডিত কর্ণভূষা দুলিয়া উঠিল এবং উজ্জ্বল আলোক তাহার চক্ষুর ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। বিপুল কেশভার ইতস্ততঃ ছুটিয়া আসিয়া ব্রজবালার মুখে চোখে পড়িল। কেশগুচ্ছের মাঝে মাঝে ফুল—যেন ফণীর মাথায় মণি; আর যেন তাদের দুরন্ত শিশুরা এদিক ও-দিক ছুটিয়া বেড়াইতেছে। ব্রজবালার চোখ মুখের উপর হতে চুলগুলা সরাইয়া দিয়া পুনরপি বলিল, "আমি অন্তঃপুরে আবদ্ধ হয়ে থাক্‌তে জন্মি নি।"

রাজার কর্ণদ্বয় কথা কয়টা গ্রহণ করিল কি না জানি না; কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয় সে সময় বড় ব্যস্ত ছিল,—রাজা মুগ্ধনয়নে ব্রজবালাকে দেখিতে-ছিলেন। অবশেষে বলিলেন, "ব্রজবালা, তুমি রাগ কর বা কৌতুক কর, সকল অবস্থাতে তুমি সুন্দর। তুমি নিত্যসুন্দর—তুমি চিরসুন্দর।"

ব্রজবালার উত্তেজনা মুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল; হাসিতে মুখখানি নাচিয়া উঠিল। তখন সে বুঝিল যে, তাহার মাথার কাপড় খসিয়া পড়িয়াছে। একটু ব্যস্ততাসহ কাপড়টা আবার উঠাইয়া দিল। রাজার তখন চমক ভাঙ্গিল। ডাকিলেন, "ব্রজবালা!"

ব্রজবালা মুখের উপর কাপড় টানিল।

"অনলশিখারূপিনী—"

"তুহিনবিমণ্ডিত গিরিশিখর—"

"তুহিন বিশুষ্ক—কাছে এস।"

"ক্ষমা করিবেন।"

"তোমাতে কি নারীত্ব একটুকুও নাই?"

"এতদিনে তাহা জানিলেন?"

এমন সময় নির্ম্মলা আসিয়া সংবাদ দিল, দুর্গস্বামী গুপ্তচরের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

ব্রজবালা রাজার পানে চাহিল। রাজা তাহা লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন, "ব্রজবালা, বিধাতা তোমাকে অতুল রূপের, অশেষ বুদ্ধি-বিবেচনার অধিকারিণী করিয়াছেন; কিন্তু তোমাকে হৃদয় দেন নাই।"

ব্রজবালা। উত্তম করিয়াছেন। হৃদয় দিলে হয় ত মাথা দিতেন না। তা'র চেয়ে আমি এ বেশ আছি।

অকস্মাৎ বাহিরে একটা গোল উঠিল। ক্ষণমধ্যেই নির্ম্মলা চঞ্চল চরণে আসিয়া সংবাদ দিল, শান্তু চোর ধরে এনেছে। ব্রজবালার বদন উৎফুল্ল হইল; রাজা বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন। এ দিকে বাহিরে শান্তু বড় গোল করিয়া উঠিল। বোধ হয় অযাচিতভাবে চোরটাকে উত্তম-মধ্যম কিছু প্রদান করিতেছিল; কিন্তু সে এ অকাতর দানের প্রতিবাদ করিয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছিল। রাজার আদেশ পাইয়া নির্ম্মলা তাহাদের কক্ষমধ্যে আনিল।

চোরের দুই হাত গামছায় বাঁধা ছিল। নির্ম্মলা আলোকে তাহাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিল, "এই সে চোর—মর্ মিন্‌সে, মড়ার মত জলের উপর ভাসছিলি কেন?"

লোকটা হাসিয়া উঠিল—পাগলের মত বিকটভাবে হাসিয়া উঠিল। রাজা চমকিয়া উঠিলেন; ব্রজবালা তীক্ষ্ণনয়নে তাহাকে দেখিতে লাগিল।

হাসি থামিবার আগেই লোকটা কাঁদিয়া উঠিল; এবং করুণস্বরে বলিল, "আমার ক্ষিদে পেয়েছে।"

শান্ত বলিল, "এত খাওয়ালাম তবু পেট ভরে নি? আচ্ছা একটু অপেক্ষা কর—বাইরে গিয়ে আবার কিছু দিচ্ছি।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "একে কোথায় পেলে শান্ত?

"গড়খাইয়ের ভিতর মহারাজ!"

নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল, "সেখানে কি করছিল?"

"চুল বাঁধ্‌ছিল।"

"আ মর্ হতভাগা, আমার সঙ্গে ঠাট্টা!"

"আজ্ঞে না, আপনার সঙ্গে ও-কাজ ক'রতে পারি!"

পাগলের মস্তক মুণ্ডিত—গোঁফ দাড়ি কিছু নাই। গাত্র উলঙ্গ—কোমরে একখানা সিক্ত বস্ত্র। লোকটা কৃশ, কিন্তু সবল। চক্ষু তীক্ষ্ণ, চিবুক ও নাসিকা বুদ্ধিব্যঞ্জক। মুখশ্রী অসুন্দর নহে। ব্রজবালা মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত লক্ষ্য করিয়া রাজাকে বলিল, "লোকটা অতি ধূর্ত্ত।"

শান্ত বলিল, "ঠিক বলেছেন রাণি-মা; লোকটা আমায় বড় বেগ দিয়েছে। আমি গিয়ে দেখি, একজন বাঙ্গালী গড়খাইয়ের ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাকে চোর মনে করে পিছন হতে জাপ্‌টে ধরলুম। সে-ও আমাকে ধরলে; আমি পড়ে গেলুম।"

নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল, "জোরে বুঝি পারলি নি? তার পর কি হল?"

শান্ত। তা'রপর আর কি হবে? তাঁ'তে আমাতে খুব ভাব হয়ে

গেল। সে তা'র নাম বল্‌লে, আমি আমার পরিচয় দেলাম—কাজের কথাও বল্‌লাম। সে তখন বল্‌লে, একটা মানুষকে গড়খাইতে নামতে দেখে অনেকক্ষণ ধরে সে পাহারা দিচ্ছে। দুজনে তখন জলে নেমে দু'দিক্ থেকে তাড়া দিয়ে এই পাগলটাকে ধরলুম। কি বল্‌ব রাণি-মা, সমস্ত পথটা হতভাগা আমায় জ্বালিয়ে মেরেছে।

পাগল তখন সহসা মাটীতে শুইয়া পড়িয়া হো হো শব্দে হাসিতে লাগিল। শান্ত দুই এক ঘা দিবার উপক্রম করিতেছিল; কেননা, এরূপ প্রহারের সুযোগ সচরাচর ঘটে না। কিন্তু রাজার দিকে চাহিয়া নিবৃত্ত রহিল।

ব্রজবালা জিজ্ঞাসা করিল, "মই পেয়েছ শান্ত ?"

"হাঁ পেয়েছি—ওর হাতেই ছিল।"

পাগল তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া নাচিতে আরম্ভ করিয়া দিল। নির্ম্মলা ভীত হইয়া ব্রজবালার কাছে সরিয়া গেল। ব্রজবালা, নির্ম্মলার কাণে কাণে কি বলিল। নির্ম্মলা বাহিরে চলিয়া গেল এবং অচিরে দুইজন পাইক লইয়া কক্ষমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিল। ব্রজবালা পাইকদের আদেশ করিলেন, "তোমরা এই লোকটাকে বেঁধে নিয়ে যাও এবং লোহা পুড়িয়ে গায় ছেঁকা দেও। যখন অপরাধ স্বীকার করতে রাজি হবে, তখন আমার কাছে নিয়ে আস্‌বে। যদি পালায়, তা'হ'লে তোমাদের কারও মাথা থাক্‌বে না—যাও।"

রাজা এতক্ষণ নীরব ছিলেন—ব্রজবালার কার্য্যকলাপ নিঃশব্দে লক্ষ্য করিতেছিলেন। এক্ষণে অবিচার হয় দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কেন পাগলাটাকে শাস্তি দিচ্ছ রাণি ? ছেড়ে দাও।"

ব্রজ। কা'কে আপনি পাগল বল্‌ছেন ?

রাজা। কেন, এই লোকটা পাগল নয় কি ?

ব্রজ। কোন কালে নয়। এর মত ধূর্ত্ত বদমায়েস খুব কমই আছে। (পাইকদের প্রতি) যাও—আমার হুকুম তামিল কর গে।

লোকটা তখন নাচ বন্ধ করিয়া দিয়া তীক্ষ্ণনয়নে ব্রজবালার পানে চাহিল; এবং পরক্ষণে মাটীতে পড়িয়া যুক্তকরে বলিল, "রাণি-মা, মারিতে হয় মারুন—কিন্তু আপনার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে আমি কখন দেখি নি। আমি সকল অপরাধ স্বীকার কর্‌ছি।"

রাজা বিস্মিত হইয়া বক্তার পানে চাহিলেন। ব্রজবালা ইঙ্গিত করিল,—প্রহরীরা কক্ষের বাহিরে দ্বারপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। ব্রজবালা তখন শয্যার উপর বসিয়া অশেষ গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিল, "সকল কথা এখন খুলে বল।"

"আমার নাম নটবর; আমি দনার্দ্দন রায়ের গুপ্তচর।"

"কি জন্যে এখানে এসেছ?"

"ক্ষমা করবেন রাণি-মা; আমার নিজের অপরাধ স্বীকার করেছি, আমাকে যে শাস্তি দিতে হয় দিন্! কিন্তু অপরের নিকট বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারব না।"

রাজা গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তোকে এখনি শূলে দেব।"

ব্রজবালা, রাজাকে শান্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নটবর, তুমি কা'র প্রজা?"

নট। মহারাজের।

ব্রজ। যে দেশে তুমি ও তোমার স্ত্রীপুত্র জন্মেছে, সে দেশকে তুমি ভালবাস?

নট। খুব বাসি।

ব্রজ। কে তোমার দেশকে নষ্ট করতে, তোমার স্ত্রী-পুত্রকে, মেরে ফেল্‌তে এসেছে?

নট। মুসলমান।

ব্রজ। সেই মুসলমানকে তুমি ভালবাস কি ?

নট। না—কখনই না।

ব্রজ। আর যে ব্যক্তি সেই মুসলমানকে সাহায্য করছে, তা'কে ভালবাস কি ?

নট। না—সে আমার শত্রু, আমার দেশের শত্রু।

ব্রজ। তোমার সেই শত্রু দনার্দ্দন বিশ্বাসঘাতকতা করছে—তোমার দেশকে শত্রুর হাতে তুলে দিচ্ছে, তা কি তুমি জান না ?

নট। না, রাণি-মা, এতদিন তা' বুঝতে পারিনি। শুনেছিলাম, দুর্গস্বামী দীনুকৃষ্ণ ও বিদেশী সেনাপতি দু'টাকে মারবার জন্য এত ষড়যন্ত্র হচ্ছে। মা, তুমি আমার ভ্রম ঘুচালে—আজ হ'তে তুমি আমার মা। মহারাজ, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

রাজা তখন নটবরকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন। নটবর বিনা সঙ্কোচে এক বৃহৎ ষড়যন্ত্র-রহস্য প্রকাশ করিল। সে বলিল, দুর্গ ও প্রাসাদ মধ্যেও অনেক ষড়যন্ত্রকারী আছে। দনার্দ্দন তাহাদের পত্র দিয়াছে। পত্রগুলি নটবর এক বৃক্ষকোটর মধ্যে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ষড়যন্ত্রকারীরা প্রত্যহ রাত্রি এক প্রহরের সময় সেই বৃক্ষ কোটরে পত্রের অনুসন্ধান করে। নটবর সেই সকল ব্যক্তির নাম জানে না। নির্দ্দিষ্ট স্থানে আদেশমত পত্রগুলি সন্ধ্যার পর রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, অদ্য রজনী তৃতীয় প্রহরে দনার্দ্দন দুর্গ আক্রমণ করিবে। তাহার উপর দুর্গদ্বার মুক্ত রাখিবার ভার অর্পিত হইয়াছে, দুর্গদ্বার মুক্ত পাইলে দনার্দ্দন দুই চারি হাজার সৈন্য লইয়া চুপি চুপি দুর্গে প্রবেশ করিবে এবং তৎক্ষণাৎ অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীরা যোগদান করিবে।

রাজা ও ব্রজবালা সকল কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। রাজা চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য বলছিস্?"

নটবর উত্তর করিল, "মিথ্যা বলবার ইচ্ছা থাক্‌লেও আমার মায়ের কাছে মিথ্যা বলব না। আমার বড় দর্প ছিল, আমার মত বুদ্ধিমান্ পৃথিবীতে নেই; কিন্তু আজ আমি গুরু পেয়েছি—আমার দর্প চূর্ণ হয়েছে।"

রাজা। দনার্দ্দন কোথায় আছে?

নট। আজ কোথায় আছে জানি না; দুই দিন আগে বিশালের উপকণ্ঠে করিম সাকে ঘিরে ফেলতে দেখে এসেছি।

রাজা। দনার্দ্দনের সঙ্গে কত লোক?

নট। অনেক লোক, কিন্তু সকলকে আন্‌বে না—বেশী সৈন্য আন্‌লে গোল হয়ে পড়বে—বাছা বাছা দু'চার হাজার আন্‌বে।

রাজা নিরুত্তর হইলেন। ব্রজবালা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের সাঙ্কেতিক কথাটা কি?"

"মহাপ্রভু।"

ব্রজবালা বলিল, "আচ্ছা যাও নটবর, তোমাকে আমি ছেড়ে দিলাম; কাল সকালে যেখানে তোমার ইচ্ছা হয় চলে যেও।"

নটবর বিস্মিত হইয়া ব্রজবালার পানে চাহিল। তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া করযোড়ে বলিল, "মা, আমাকে শাস্তি দেও—আমি মহাপাপিষ্ঠ। তোমাকে নিয়ে পালাবার ষড়যন্ত্র হয়েছে, তা'তেও আমি লিপ্ত আছি।"

ব্রজবালা। তা' হোক; তোমাকে আমি ক্ষমা করেছি—তোমার ইচ্ছামত স্থানে যেতে পার।

নটবর। এততেও তোমার রাগ হল না? তুমি কে মা? এত দয়া

ত জগতে দেখিনি! আমাকে চরণে আশ্রয় দেবে কি? আমি কোথাও আর যেতে চাই না।

রাজা বলিলেন, "এখানে থেকে ষড়যন্ত্রের সুবিধা করতে চাও বুঝি?"

নটবর ক্ষুণ্নমনে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্রজবালা বলিলেন, "নটবর, তুমি আমার কাছে থাক—আমি তোমাকে আশ্রয় দিলাম।"

নটবর তৎক্ষণাৎ মাটীতে লুটাইয়া পড়িল এবং সজল নয়নে বলিল, "মা, আজ হতে জীবনে মরণে আমি তোমার চরণে বাঁধা রইলাম; আমার প্রাণ দিয়েও তোমাকে রক্ষা করব। নিশ্চিন্ত থাক মা।"

হরি হরি! নটবর কিরূপে রক্ষা করিয়াছিল, তাহা জানিতে পারিলে উভয়ে শিহরিয়া উঠিতেন।

# নবম পরিচ্ছেদ

সকলকে বিদায় দিয়া রাজা, ব্রজবালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে কর্ত্তব্য কি রাণি?"

ব্রজবালা কি ভাবিতেছিল; সহসা কোন উত্তর না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি স্থির করিয়াছেন?"

রাজা। আমি এখনও কিছু স্থির করিনি; বিপদ যত ঘনীভূত হচ্ছে, আমার বুদ্ধিও তত লোপ পাচ্ছে।

ব্রজ। তবে আমার পরামর্শ মত কাজ করুন। একজন লোককে

দনার্দ্দনের কাছে পাঠিয়ে দিন; তা'কে যেন নটবর পাঠিয়ে দিচ্ছে এমনি করে শিখিয়ে দেবেন। লোকটা গিয়ে যেন বলে, দুর্গদ্বার খোলা আছে। সাঙ্কেতিক কথা 'মহাপ্রভু' বলে দিতে ভুলবেন না।

রাজা। দনার্দ্দনের সাক্ষাৎ কোথায় সে পাবে?

ব্রজ। কেন, নদী পার হয়ে মাটীতে কাণ পাতলেই বুঝা যাবে, কোন্ দিক হতে বিদ্রোহী সেনা আস্ছে।

রাজা। ব্রজবালা, তোমার বুদ্ধি অসাধারণ—

ব্রজ। আর একটা কথা স্মরণ রাখ্বেন। দুর্গের বাহিরে যেন দনার্দ্দনকে আক্রমণ করা না হয়। দুর্গদ্বার খুলে রাখ্বেন, যখন দেখ্বেন দনার্দ্দন সসৈন্যে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করছে, তখন দুর্গদ্বার বন্ধ করে তাদের আক্রমণ করবেন—একটা মানুষও যেন জীবন্ত ফিরে না যায়। তা' যদি পারেন, তা'হলে দনার্দ্দনের পিছনে আপনাকে আর ছুটতে হবে না।

রাজা। তুমি ত বালিকা নও ব্রজবালা!

ব্রজবালা একটু হাসিল।

রাজা। তুমি ত সামান্যা নও রাণী!

ব্রজ। যে আপনার শিষ্যা, সে কি কখন সামান্যা হ'তে পারে?

রাজা। তুমি আমার শিষ্যা নও—তুমি আমার রাণী, আমার রাজ্যেশ্বরী। মহিষী, প্রাসাদে চল।

ব্রজ। সেখানে কেন?

রাজা। যাঁহার উপর রাজ্যভার অর্পণ করিব, তিনি এখানে থাকিতে পারেন না।

ব্রজবালার নয়ন জ্বলিয়া উঠিল—অধরে হাসি ফুটিয়া উঠিল, আত্ম-সংবরণ করিয়া ব্রজবালা বলিল, "আপনার দয়া—"

রাজা। আমার দয়া নয় ব্রজবালা। তুমি যে দেশে আসিয়াছ, সে

দেশে বিশ্বাস বলে কোনও পদার্থ নাই। রাজ্যলোভে পুত্র পিতাকে, ভৃত্য প্রভুকে হত্যা করে। কোনও কর্ম্মচারী হয়ত মহিষীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকে বিষ খাওয়াইতে পারে; পুত্র হয়ত কালাপাহাড়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া আমাকে রাজ্যচ্যুত ও নিহত করিতে পারে। আমি বিশ্বাস ন্যস্ত করিতে পারি, এমন কোনও ব্যক্তি সংসারে আমার নাই। আমি সকলকে ভালবাসিতে চাই, কিন্তু কেহ আমাকে ভালবাসে না। আমি স্নেহ নিয়ে যাই, তারা স্বার্থ নিয়ে আসে। ব্রজবালা, আমি বড় দুঃখী। আমার মত দুঃখের বোঝা নিয়ে সিংহাসনে আজ পর্য্যন্ত কেহ বসে নাই। তুমিই কেবল একমাত্র নিঃস্বার্থ হৃদয় লইয়া আমার এই দুর্দ্দিনে, আমার বন্ধুরূপে, আমার শক্তিরূপে আসিয়া আমাকে বরণ করিয়াছ।

ব্রজবালা কাঁপিয়া উঠিল। তাহার দেহমধ্যে একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল। সে নিরুত্তর রহিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রাসাদে কবে যাবে রাণি?"

কম্পিতকণ্ঠে ব্রজবালা উত্তর করিল, "যবে আদেশ করিবেন।"

রাজা। বিলম্বে প্রয়োজন নাই। এ স্থান এক্ষণে আর তত নিরাপদ নহে। দুই এক দিনের মধ্যে আমি সকল ব্যবস্থা করিব। উড়িষ্যার রাণী যে আদর, যে সম্মান কখন পান নাই, আমি সেই আদর, সেই সম্মানের ব্যবস্থা করিব।

বলিয়া রাজা প্রস্থান করিলেন।

ব্রজবালা ভূপৃষ্ঠে বসিয়া পড়িল।

# দশম পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতেই ব্রজবালা সংবাদ পাইল, দনার্দ্দন ধরা পড়ে নাই। দুই সহস্র সৈন্য লইয়া দনার্দ্দন দুর্গ আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই সে নিজে আক্রান্ত হইয়াছিল। অর্দ্ধেক সৈন্য রণক্ষেত্রে ফেলিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া দনার্দ্দন পলায়ন করিয়াছিল। শুনিয়া ব্রজবালা বড় ব্যথিত হইল। বুঝিল, তাহার উপদেশমত সকল কার্য্য করা হয় নাই। সত্যই তা করা হয় নাই। রাজা যখন প্রস্তাব করিলেন যে, দুর্গদ্বার খুলিয়া রাখিয়া দুর্গমধ্যে দনার্দ্দনকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হউক, তখন দীনকৃষ্ণ প্রভৃতি বড় বড় মহারথীরা কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা বলিলেন, শত্রুকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইতে পারে না। রাজা অবশেষে সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ছয় হাজার সৈন্য লইয়া নদীপারে দনার্দ্দনকে আমক্রণ করাই স্থির হইল।

গদাধরের প্রস্তাবও গৃহীত হয় নাই। তিনি যখন প্রস্তাব করিলেন যে, ছয় হাজার সৈন্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া একদল পশ্চাৎ হইতে অপরদল সম্মুখ হইতে দনার্দ্দনকে আক্রমণ করুক, তখন দীনকৃষ্ণ আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, অন্ধকার রাত্রে আমরা সৈন্য ছত্রভঙ্গ করিতে পারি না। রাজাও দীনকৃষ্ণের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। না দিয়া তাঁহার উপায় ছিল না। তিনি সতত শঙ্কিত, পাছে সেনাপতিরা অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহী দলে যোগদান করে।

নদীপারে দনার্দ্দন আক্রান্ত হইয়া স্বল্পকাল যুদ্ধের পর পলায়ন তৎপর হইল। পশ্চাৎ উন্মুক্ত, সহজেই পলায়নে সমর্থ হইল। অন্ধকার রাত্রে তাহার পশ্চাদ্ধাবন সেনাপতিরা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। তাঁহারা দনার্দ্দনকে দূরীভূত করিয়া বিজয়গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিয়া হাসিতে হাসিতে দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কিন্তু এ জয়ে ফললাভ কিছুই হইল না। দনার্দ্দন যেমন মুক্ত ছিল, তেমনই মুক্ত রহিল—বিদ্রোহীর দল যেমন পুষ্ট হইতেছিল, তেমনই পুষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে রাজা যুদ্ধের তৃতীয় দিবস প্রভাতে বিদ্রোহ দমনার্থ সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। তদ্‌পূর্ব্বদিবস সন্ধ্যাকালে একবার ব্রজবালার গৃহে আসিয়া দর্শন দিলেন। ব্রজবালাও জানিত যে, রাজা তাহার নিকট হইতে বিদায় না লইয়া স্থানান্তরে যাইবেন না।

আজ আর ব্রজবালার বেশভূষার পারিপাট্য নাই। যাহা সচরাচর পরিয়া থাকে তাহাই পরিয়া সে রাজদর্শনে আসিল। দর্পণে একবার মুখখানাও দেখিল না। রাজা সাক্ষাৎমাত্রেই বলিলেন, "সত্যই ব্রজবালা, তলওয়ার ধরতে পারলেই মানুষ একজন বড় রাজনীতিজ্ঞ বা দেশশাসক হল না। তোমার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য।"

ব্রজবালার অধরে একটু হাসি আসিল, কিন্তু ফুটিল না। রাজা বলিলেন, "তোমার পরামর্শানুসারে দনার্দ্দনকে যদি দুর্গের ভিতর আসিতে দিতাম, তাহা হইলে আজ এই বিপদের দিনে রাজধানী ছাড়িয়া বিদ্রোহীর পিছনে আমাকে ছুটিতে হইত না।"

ব্রজ। ভবিতব্য কে খণ্ডন করিতে পারে মহারাজ?

রাজার সমস্ত দেহ কাঁপাইয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল; ব্রজবালা শিহরিয়া উঠিল; বলিল, "রাজা, হতাশ হবেন না—পুরুষকারে অদৃষ্টলিপি পরিবর্ত্তিত করুন।"

রাজা। সকল চেষ্টাই যে ব্যর্থ হতেছে রাণি! বৈতরণী তীরে কতলু খাঁর হস্তে কুজঙ্গাধিপতি পরাস্ত হয়েছেন।

রাণী। তা'তে আমাদের বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় নি। এখনও আমাদের যে সৈন্য আছে, তা'তে আমরা অনায়াসে পাঠানদের গঙ্গাপারে রেখে আস্‌তে পারি। ভয় কি?

রাজা। তোমার উপর সকল ভার অর্পণ করিয়া চলিলাম রাণি। তুমি যাহা হয় করিও। আমার রাজ্য, আশা, সুখ—আমার ইহকালের যা' কিছু, সকলই তোমার হস্তে ন্যস্ত করিয়া চলিলাম। কিন্তু—কিন্তু রাণি, জানি না, জীবনে আবার সাক্ষাৎ ঘটিবে কি না।

রাণী। এত আশঙ্কা! তবে আপনি স্বয়ং না গিয়া আর কাহাকেও পাঠান।

রাজা। কা'কে আর পাঠাব রাণি? করিম সাকে পাঠালুম; সে কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। বিদেশী গদাধরকে পাঠাই, তা' তোমার ইচ্ছা নয়। খাণ্ডাইতদের মধ্যে এমন কোনও উপযুক্ত ব্যক্তি নেই, যা'কে আমি বিশ্বাস কর্‌তে পারি। যা'কে পাঠাব সে-ই হয়ত বিদ্রোহীদলে যোগ দিয়ে বসবে। আমার বিপদ্ যত ঘনীভূত হয়ে আস্‌ছে, ততই সকলে সরে দাঁড়াচ্ছে। এত অল্প দিনের মধ্যে এতটা পরিবর্ত্তন সম্ভবপর বলে কখন ভাবি নি।

ব্রজ। তবে এ সময় রাজধানী ছেড়ে দূরে যাবেন না।

রাজা। এখানে থাক্‌লেই কি আমি পরিত্রাণ পাব? দুই চারি-দিনের মধ্যে হয়ত গুপ্তঘাতকের হাতে আমায় প্রাণ দিতে হবে। দূরে সরে গেলে ষড়যন্ত্রটা কম হ'তে পারে। তুমিও সাবধানে থেকো রাণি, দুইজন বিদেশী ছাড়া বড় একটা কাউকে বিশ্বাস করো না।

ব্রজ। বিদ্রোহ কি তবে রাজধানীতেও বিস্তার লাভ করেছে?

রাজা। করেছে বই কি। সভাসদেরা যখন দুর্বিনীত ও অবাধ্য হয়ে উঠেছে, তখন তাহারাও বিদ্রোহী বই কি। আজ যখন আমি আদেশ প্রচার করলুম, রাণী ব্রজবালা আমার অনুপস্থিতে আমার প্রতিভূস্বরূপ রাজ্যশাসন কর্‌বেন, তখন একজন মন্ত্রী স্পষ্টই বলে উঠ্‌ল, 'উড়িষ্যার সিংহাসন দুর্ব্বলচিত্ত রাজার ক্রীড়নক নয়—আমরা যাকে সিংহাসনে বসাইব সেই সিংহাসনে বসিবে।

ব্রজ। মন্ত্রীটা কে?

রাজা। ভৃগুরাম।

ব্রজ। আচ্ছা, আমি তা'কে আর তার দলকে দেখে নেব—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

রাজা। যখন দেখিব উড়িষ্যা আর রক্ষা হয় না, তখন পাঠানদের সঙ্গে সন্ধি করিব; উত্তর ভাগ তাদের দিয়ে দক্ষিণ ভাগ আমি লইব। তাই আমি দনার্দ্দনকে মারিয়া দক্ষিণ ভূমি নিষ্কণ্টক করিতে চলিলাম।

ব্রজ। আমিও কতকটা সেই উদ্দেশ্যে আপনাকে দক্ষিণে পাঠাইতেছি। আপাততঃ আমি উত্তর ভাগের ভার লইলাম। যতদিন না আপনি বা যুবরাজ প্রত্যাবর্ত্তন করেন, ততদিন আমি রাজধানী রক্ষা করিব।

রাজা উঠিলেন। তাঁহার চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া আসিল। তিনি কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "ব্রজবালা, একটা কথা তোমায় বলে যাই—হয়ত আর বলা হবে না। আমি তোমাকে যে ভাবে আগে দেখিতাম, এখন আর সে ভাবে দেখে না। আমার সে মোহ, সে রূপ-লিপ্সা কাটিয়া গিয়াছে—এখন তুমি আমার সে বিলাসের কামিনী, অন্তঃপুরচারিণী মহিষী নও—এখন তুমি আমার জীবনসঙ্গিনী, সুখদুঃখভাগিনী সহধর্ম্মিণী।"

ব্রজবালার সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিল—একটা অননুভূতপূর্ব্ব তাড়িত

প্রবাহ মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত বহিয়া গেল; নীলপদ্ম দুইটি বারিভারে ধীরে ধীরে অবনত হইয়া আসিতে লাগিল। ব্রজবালা ভূপৃষ্ঠে সহসা বসিয়া পড়িল।

রাজার চক্ষু শুষ্ক ছিল না। তিনি বলিলেন, "ব্রজবালা, যখন দেখিবে বিপদ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে—রাজ্য আর রক্ষা হয় না, তখন তুমি আমার কাছে ছুটিয়া আসিবে। আমি রাজ্য ছাড়িয়া দেশ ছাড়িয়া, তোমায় লইয়া কোন এক দূরদেশে পলায়ন করিব। আমি সব ছাড়িতে পারি, কিন্তু তোমায় ছাড়িতে পারি না, ব্রজবালা! তুমি আমার সর্ব্বস্ব।"

ব্রজবালার বক্ষ, পঞ্জর কাঁপিয়া উঠিল; সমস্ত বুকখানার ভিতর একটা ঝড় উঠিল। সেই ঝড়ের আঘাতে উৎস-মুখের আবরণ সরিয়া গেল,—ব্রজবালা চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে স্রোত তাড়নে আবর্জ্জনাও ভাসিয়া গেল।

রাজা বলিলেন, "ব্রজবালা, কেঁদো না—তোমার কান্না দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়।"

চক্ষের অঞ্চল না সরাইয়া ব্রজবালা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ক্ষমা করুন—আপনার পায়ে ধরি, আমার প্রতি আর দয়া দেখাবেন না।"

"দয়া কেন ব্রজবালা!—আমার প্রেম, শ্রদ্ধা, ভক্তি—"

ব্রজবালার কান্না আরও বাড়িয়া উঠিল। বলিল, "আপনি জানেন না আমি কে?"

রাজা। জানি বই কি ব্রজবালা! তুমি নির্ম্মল স্বচ্ছ অকলঙ্ক বারিধির জল—নানা ভাবে সতত উদ্বেলিত—নানা ভঙ্গিমায় চির-মনোহারিণী।

ব্রজ। আমার জীবন-কাহিনী শুনুন; শুনিলে আপনি আমায়—

রাজা। বারিধি-বক্ষে অনেক আবর্জ্জনা ভাসিয়া যায়, তবু লোকে তাকে প্রণাম করে। ব্রজবালা তুমি আমার নমস্য।

ব্রজ। ছি ছি, অমন করে বলবেন না—আমি মহাপাপিষ্ঠা। আমি স্বামী ত্যাগ করে পরের নিকট প্রণয় যাচ্ঞা করেছিলাম। সেখানেও উপখ্যাত হয়েছি। পরে আপনার নিকট স্বার্থপূর্ণ হৃদয় নিয়ে—

রাজা। ব্রজবালা, আমি একদিন বেশর মহান্তিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমাতে আমাতে বিবাহ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কি না। মহান্তি উত্তর করেছিলেন, 'বিবাহ কতকটা হৃদয়ের বন্ধন, কতকটা সামাজিক বন্ধন—আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের সঙ্গে তাহার বড় একটা সম্বন্ধ নেই।' ব্রজবালা, আমাকে বিবাহ করবে?

কথাটা ব্রজবালা ঠিক বুঝিল না; তাহার বুকের ভিতর তখন ঝড় বহিতেছিল। রাজা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল ব্রজবালা, আমাকে বিবাহ করিবে?—আমার পাটরাণী হইবে?"

এবার ব্রজবালা কথাটা প্রণিধান করিল। সে তখন চক্ষু হইতে অঞ্চল নামাইয়া মুখ তুলিল; এবং বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে রাজার পানে চাহিয়া রহিল। রাজা বলিলেন, "ব্রজবালা তুমি শতবার আমার নমস্য—তুমি দেবী।"

ব্রজবালা উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং রাজার পানে চাহিতে চাহিতে দুই এক পা পিছাইয়া গেল। পরক্ষণে অগ্রসর হইয়া রাজার সমীপবর্ত্তিনী হইল। রাজা সমস্ত প্রাণের চীৎকার কণ্ঠে আনিয়া ডাকিলেন, "আমার ব্রজসুন্দরি!"

ব্রজবালা ঝটিকামুখে বৃক্ষপত্রের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে রাজার একখানি হাত তুলিয়া লইয়া নিজের মুখের উপর স্থাপন করিল। যে ব্যক্তি ব্রজবালার চরণাঙ্গুলি স্পর্শ করিতেও কখন অধিকার বা সাহস পায়

নাই, সে আজ কম্পিতদেহা বেপমানা ব্রজবালাকে বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া মুখচুম্বন করিল। বাঁধ ভাঙ্গিয়া ব্রজবালার নয়ন হইতে অজস্রধারে অশ্রু গড়াইতে লাগিল! [illegible]

অনেকক্ষণ পরে উভয়ে প্রকৃতিস্থ হইলেন। ব্রজবালা একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। রাজা বলিলেন, "ব্রজ, আর আমার যুদ্ধে যাওয়া হ'ল না।"

"কেন মহারাজ?"

"তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার মন সরছে না।"

"আমি ত আপনার সঙ্গেই থাকিব। ভাবিবেন, রণক্ষেত্র আপনার কেলি-গৃহ নররক্ত কুঙ্কুমের দাগ। আপনার কটিচর্ম্ম, আমার ভুজলতা আপনার শোণিত কৃপাণ আমার দেহ। আর শত্রু সৈন্যকে আমার সপত্নীবৃন্দ ভাবিবেন। আকাশকে আপনার রাজছত্র, পাহাড়কে আপনার রাজদণ্ড মনে করিবেন। অরণ্য নদীকে আপনার প্রমোদগৃহের চিত্রাবলী ভাবিবেন। আপনি ত আপনারই গৃহে থাকিবেন মহারাজ!"

---

# রাণী-ব্রজসুন্দরী

## পঞ্চম খণ্ড

ব্যোম

( আত্মবিসর্জ্জন )

মানবী ও দেবী

# প্রথম পরিচ্ছেদ

মহানদী-উপকূলে বহুদূর বিস্তৃত বিশাল রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদটি একটি নগর বিশেষ। তার পল্লী বা প্রাঙ্গণ আছে। আবার প্রত্যেক পল্লীর মধ্যে বড় ছোট অনেকগুলি বাড়ী। বাড়ীগুলি স্বতন্ত্র,—একের সহিত অপরের বড় একটা সম্বন্ধ নাই। মহিলাবাস অষ্টম পল্লীতে। ব্রজবালা এই পল্লীতে স্থান পাইয়া ছিলেন। তাঁহার গৃহটি একটি প্রাসাদ বিশেষ। ব্রজবালা এই প্রাসাদের নামকরণ করিয়াছিলেন—'চিত্রা।'

চিত্রা, নদীর ধারে—মধ্যে প্রাচীর ব্যবধান মাত্র। প্রাচীরের গায় ব্রজবালা একটা দ্বার ফুটাইয়া লইয়াছিলেন। সেই পথে রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ ও গুপ্তচরেরা রাণী ব্রজবালার আদেশ মত যাতায়াত করিত। চিত্রার অপর তিন পার্শ্বে উচ্চ প্রাচীর উঠাইয়া ব্রজবালা তাঁহার প্রাসাদটিকে অন্যান্য মহিলাবাস হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়াছিলেন।

স্বতন্ত্র করিয়া ব্রজবালা প্রাচীরের ধারে ধারে প্রহরী বসাইয়াছিলেন। নদীর দিকে একমাত্র চিত্রা-প্রবেশের পথ ছিল। সেই পথে সকল সময়ে সতর্ক প্রহরীবৃন্দ থাকিত। সেই সব প্রহরীদলের নেতা গদাধর। রাণীর আজ্ঞা ব্যতীত গদাধর কাহাকেও ভিতরে আসিতে দিতেন না। তবে অনুগৃহীত অনুচর ও গুপ্তচরের গতিবিধি অবারিত ছিল।

চিত্রার একাংশে রাণীর মন্ত্রণাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যে অংশে তিনি বাস করিতেন, সে অংশের সহিত মন্ত্রণাগারের কোনও সম্বন্ধ ছিল

না। ভৃত্য বা প্রহরী মন্ত্রণাগারের অংশে থাকিত; দাসীরা রাণীর কাছে থাকিত।

চিত্রার চারি ধারে সুরম্য পুষ্পোদ্যান। উদ্যানমধ্যে নানা বর্ণের প্রস্তর স্থানে স্থানে সজ্জিত রহিয়াছে। কোথাও কৃত্রিম পাহাড়, কোথাও প্রস্রবণ; কোনস্থানে কৃষ্ণ প্রস্তরের বেদী, কোথাও মর্ম্মর গঠিত স্তম্ভ। কোথাও রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত রমণীয় রমণীমূর্ত্তি, কোথাও বা ধূসরবর্ণ প্রস্তরগঠিত বরণীয় বীরের মূর্ত্তি। লিপি-কৌশল অতি চমৎকার। তাহার কিছু কিছু নিদর্শন ভুবনেশ্বরের অন্নপূর্ণা মন্দিরগাত্রে আজও পাওয়া যায়।

এই বিশাল সৌধ, এই চিত্রতুল্য উদ্যান এক্ষণে ব্রজবালা'র। সে যা' চাহিয়াছিল তাই পাইয়াছে। কিন্তু ব্রজবালা আর সে ব্রজবালা নাই— একদিনে সে বৃদ্ধা হইয়াছে। তাহার চঞ্চল চক্ষু এক্ষণে স্থির হইয়াছে; গাম্ভীর্য্য আসিয়া তাহার মুখানিকে আশ্রয় করিয়াছে। একটা দৃঢ়তা, একটা কমনীয়তা, একটা স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ তাহার বদনমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; যেন ঊষার দীপ্তি, যেন সন্ধ্যারতির দীপছটা প্রতিমার মুখের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ব্রজবালার মাথার উপর একটা রাজ্যের দায়িত্ব-ভার। ব্রজবালা সে বোঝা অকাতরে মাথায় ধরিয়াছে। তবে যুবতী বৃদ্ধা হইয়াছে।

শুধু তাই নয়, ব্রজবালার হৃদয় ভিজিয়াছে। পাষাণী এক্ষণে সলিল প্রবাহিণী। অভিমান, গর্ব্ব, তেজ, সলিল-প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছে; ব্রজবালা ভালবাসিতে শিখিয়াছে।

ব্রজবালা প্রাসাদে আসিয়া বেশ জমকাইয়া বসিয়াছে। প্রথমে রাজ-কর্ম্মচারীরা একটু মাথা নাড়া দিয়া ব্রজবালাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ব্রজবালা চতুরতার সহিত তাহাদের মধ্যে কলহ বাধাইয়া দিয়া দুই দলের সৃষ্টি করিল। তখন সাহায্য ও পুষ্টির আশায় উভয় পক্ষ

ব্রজবালার মুখাপেক্ষী হইল। অবশেষে এমনই অবস্থা দাঁড়াইল যে, ব্রজবালার হুকুম পালন করিবার জন্য উভয় পক্ষই ব্যাকুল ও লালায়িত হইল। এক পক্ষকে কোনও একটা কার্য্যভার দিলে, অপর পক্ষ ঈর্ষান্বিত হইত। ব্রজবালা ঈর্ষা জ্বালাইয়া দিয়া তখনই আবার তাহা নিবাইত। এইরূপে রাজ-প্রতিনিধি মহারাণী ব্রজবালা দুর্বিনীত মন্ত্রী ও সেনাপতিদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

রাণীর যদি মনোহারী রূপ না থাকিত, তাহা হইলে তিনি কৃতকার্য্য হইতেন কি না সন্দেহ স্থল। রূপেতে ব্রহ্মাণ্ড আকৃষ্ট হয়। রূপ পুরুষ, গুণ শক্তি। রাণী যখন রূপ ও শক্তি লইয়া মন্ত্রণাগারে সিংহাসনে বসিতেন, তখন তাঁহার হুকুম অমান্য করিবার প্রবৃত্তি বা সাহস কাহারও হইত না। সেনানায়ক গদাধর সবিস্ময়ে দেখিতেন, রাজা মুকুন্দদেব যে সকল রাজ্য-কর্ণধারকে করায়ত্ত করিতে সমর্থ হয়েন নাই, ব্রজবালা কয়েকদিনের মধ্যে তাহাদের বশীভূত করিয়াছে।

একদিন অপরাহ্ণে উদ্যানমধ্যে লতাকুঞ্জ তলে কৃষ্ণপ্রস্তর বেদীর উপর বিদ্যুল্লতার ন্যায় ব্রজবালা শয়ান রহিয়াছে। পার্শ্বে নির্ম্মলা বীণ হস্তে উপবিষ্টা। কতকগুলা পাখী অনেক উচ্চে নীল আকাশের গায় ভাসিয়া যাইতেছে; আবার কতকগুলা পক্ষী আহার অন্বেষণে পৃথিবীর উপর উড়িয়া বেড়াইতেছে। ব্রজবালা একমনে পাখী দেখিতেছিল। বীণহস্তা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি হয়েছে বল দেখি?"

শায়িতা উত্তর করিলেন, "শুয়ে আছি বলে বলছ? কাল সমস্ত রাত্রি, আজ সমস্ত দিন একবারও শুই নি; তবু অভিযোগ!"

নির্ম্মলা। না গো, তা' নয়; তুমি কি এক রকম হয়ে গেছ।

ব্রজবালা। কি হইছি বল্ দেখি?

নির্ম্ম। তুমি বুড়োকে ভালবেসেছ।

ব্রজ। কা'কে, রাজাকে ?

নির্ম্ম। হাঁ গো হাঁ। অমন কন্দর্প তুল্য দিগ্বিজয়ী স্বামী গেল, এখন কি না একটা বুড়োকে—

ব্রজ। ছি।

নির্ম্ম। কেন গো ?

ব্রজ। যাঁর নিকট আমরা সকল বিষয়ে ঋণী, তাঁকে তাচ্ছিল্য করো না।

নির্ম্ম। বটে ! এতদূর ?

ব্রজ। আমার মনে হয়, আমি ছাড়া তাঁর জগতে কেহ নাই ; সৈন্য, পুত্র, মহিষী সকলেই স্বার্থান্বেষী—

নির্ম্ম। আর তুমি বুঝি নিঃস্বার্থ ?

ব্রজ। না, না ; আমার মত প্রবল স্বার্থ ও দুরভিসন্ধি লয়ে কেহ কখন রাজদ্বারে আসে নি। আমি যা'কে প্রতারণা কর্‌তে এসেছিলাম, তার নিকট অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা পেয়েছি।

নির্ম্ম। তবে ?

ব্রজবালা উত্তর করিলেন না। কথাটা তাঁর কাণে গেল কি না বলা যায় না। কিন্তু তিনি কেমন একটু অন্যমনস্ক হইলেন। নির্ম্মলা ক্ষণকাল অপেক্ষা করিল ; যখন দেখিল, কোনও উত্তর পাওয়া গেল না, তখন সে বলিল, "তবে আমি গান গাই।"

"গাও"

নির্ম্মলা বীণা বাজাইয়া গান ধরিল,—

কাঁহা মেরা মাধব, কাঁহা মেরা কান,
কাঁহা মেরা হৃদয়ক ধন ;
অব ছিল নিয়ড়ে, কাঁহা গেল ভাগই,
অজানত ছিন্‌ লেই মন।

সো মেরা নয়ান, সো মেরা গেয়ান,
সো বিনা কি কাজ জীবনে ;
তমালে ছাড়ি লতা, চাঁদ ছাড়ি কমল,
কানু বিনে রাধা বাঁচে কি পরাণে।
মেরা লাজ সরম, মেরা ধরম করম,
সব ডারছু চরণে তাকর ;
সো পুন আসবে, রাধা বলি ডাকবে
সো আশে রইছে পরাণ হামার।

গান থামিল ; কিন্তু ব্রজবালা নীরব রহিল। নির্ম্মলা সম্ভবত একটু সুখ্যাতি প্রত্যাশা করিয়াছিল। তাহা পাইল না দেখিয়া অথবা দ্বিতীয় গীত আরম্ভ করিবার অভিপ্রায়ে বীণায় ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। ব্রজবালা একটু বিরক্তির সহিত হস্তান্দোলনে তাহাকে নিষেধ করিলেন। নির্ম্মলা ক্ষুব্ধ হইয়া ব্রজবালার পানে চাহিলেন ; দেখিল, তাঁহার নয়ন মন একটা ফুলের প্রতি আবিষ্ট রহিয়াছে। ফুলটি ক্ষুদ্র, কিন্তু সুন্দর—ছোট গাছের একটি কোমল শাখার মাথায় ফুটিয়া রহিয়াছে। পবন-হিল্লোলে শাখাটি প্রতিনিয়ত দুলিতেছে—কখন বামে, কখন দক্ষিণে, কখন সম্মুখে, কখন বা পিছনে। একটা ভ্রমর সেই রূপময় মধুভরা ফুলটির উপর বসিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতেছে না। যখনই ভ্রমর বসিতে যাইতেছে তখনই ফুল হেলিয়া পড়িতেছে। ভ্রমর গুণ্ গুণ্ রবে সরিয়া আসিয়া আবার ফুলের উপর বসিবার প্রয়াস পাইতেছে। ফুল আবার দুলিয়া উঠিতেছে। ভ্রমর ক্রমে রাগিয়া উঠিল। তখন সে গুঞ্জন ছাড়িয়া ঝঙ্কার আরম্ভ করিল। ফুল তবুও চুম্বন দিল না। ভ্রমর একটু উপরে উঠিয়া গেল, তারপর তীরবেগে ফুলের উপর পড়িল। ফুল ঠিক সময়ে সরিয়া গিয়া ভ্রমরের আলিঙ্গন হইতে আত্মরক্ষা করিল। ভ্রমর

তখন আত্মহারা হইয়া ফুলকে দলিত করিবার চেষ্টা পুনঃ পুনঃ করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই ফুলকে স্পর্শ করিতে পারিল না। ভ্রমরের ক্রোধ ও আগ্রহ ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল—ঝঙ্কারও ক্রমে তীব্র হইতে লাগিল। সে ঝঙ্কারের শব্দ ব্রজবালার কাণে বড় মধুর শুনাইতে লাগিল। সহসা ব্রজবালা বলিয়া উঠিল, "আমার একটা সুর মনে পড়েছে—বীণা দাও।"

নির্ম্মলা। সুর, না গান?

ব্রজবালা। গান নয়, সুর।

ব্রজবালা যে লতাকুঞ্জ তলে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই কুঞ্জ মধ্যে ছোট পাখীতে বাসা বাঁধিয়াছিল। একটা শাবক নীড়ের ভিতর হইতে ছিট্‌কাইয়া সহসা মাটীতে পড়িয়া গেল। ব্রজবালা তদ্দৃষ্টে বীণা রাখিয়া দিলেন, এবং ধীরে ধীরে উঠিয়া শাবককে লঘু-হস্তে তুলিলেন। দেখিলেন, সে বিশেষরূপে আহত হয় নাই। তখন তিনি অতীব যত্ন সহকারে তাহাকে তাহার নীড়ে পুনঃ স্থাপন করিলেন। নির্ম্মলা তদ্দৃষ্টে বিস্মিত হইল।

এমন সময় একজন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, "সেনাপতি গদাধর দর্শনপ্রার্থী হইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান।"

ব্রজবালা বীণা পুনরায় রাখিয়া দিলেন। একটু কি ভাবিলেন; পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার প্রয়োজন?"

"অত্যাবশ্যকীয় রাজকার্য্য।"

"মন্ত্রণাগৃহে তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে বল গে—সেইখানে যথাসময়ে আমার দর্শন পাইবেন।"

দাসী প্রস্থান করিল। ব্রজবালা একটু অন্যমনস্ক হইলেন। নির্ম্মলা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এখানে আস্‌তে বল না কেন।"

ব্রজবালা উত্তর করিলেন না। নির্ম্মলা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মনের জোর কতটা ভাবৃছ বুঝি?"

ব্রজবালা। তুমি আজও আমায় চিন্‌তে পার্‌লে না নির্ম্মলা! মনের গতি রোধ কর্‌তে কখন শিখি নি—চেষ্টাও করি নি। মন আমায় গৃহত্যাগ করিয়েছে—গদাধরের নিকট প্রণয় যাচ্ঞা করিয়েছে; সেই মন এখন আমায় বলে দিচ্ছে যে, এই পক্ষী-শাবক অপেক্ষা গদাধর আমার নিকট প্রিয় নহে।

নির্ম্ম। তবে সঙ্কোচ কেন?

ব্রজ। সঙ্কোচ আমার মনে নেই; কিন্তু ভেবে দেখেছ কি, গদাধর কেন সব ছেড়ে এখানে এসেছে?

এমন সময় কোথা হইতে নটবর ছুটিয়া আসিয়া রাণীর চরণে প্রণত হইল। ব্রজবালা একটু হাসিয়া বলিলেন, "তোমায় আজ আমি কয়দিন দেখিনি নটবর।"

"মা কাজে বড় ব্যস্ত ছিলাম।"

"বেশ। নির্ম্মলা, তুমি বাহিরে অপেক্ষা করগে। এখানে যেন কেহ না আসে—সতর্ক থাকিও।"

নির্ম্মলা প্রস্থান করিল। রাণী তখন নটবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংবাদ কি?"

নটবর। মা, সংবাদ বড় গুরুতর। কতলু খাঁ নরাজের নিকটে এসে ছাউনি করেছে।

ব্রজ। বল কি?

নট। হাঁ মা।

ব্রজ। নরাজ পাহাড়ের নীচে হ'তেই না কাঠজুড়ি, মহানদীর গা ভেঙ্গে বেরিয়েছে?

নট। হাঁ মা।

রাণী। কতলু খাঁ কোন্ নদীর ধারে অবস্থান করছেন?

নট। কাঠজুড়ি। সেইখানে থাকাই সুবিধা। ইচ্ছা কর্‌লেই ছোট নদী পার হতে পার্‌বেন। সেতু বাঁধবার আয়োজন হচ্ছে।

রাণী। তার পর?

নট। তার পর আর কি মা! নরাজ ত এখান হতে বেশী দূর নয়।

রাণী। (চিন্তান্তে)। সেতু প্রস্তুত হতে কত সময় লাগ্‌তে পারে?

নট। ছোট নদী—কাল সন্ধ্যার মধ্যে শেষ হতে পারে।

রাণী আরও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন।

তাহাকে বিদায় দিতে না দিতে দ্বিতীয় চর আসিয়া সংবাদ দিল, দক্ষিণ পশ্চিম দিক্ হ'তে প্রায় পনর হাজার বিদ্রোহী সেনা নিয়ে দনার্দ্দন, রাজধানী আক্রমণ ক'র্‌তে আস্‌ছে।

রাণী স্তম্ভিত হইলেন। বিপদের উপর বিপদ। রাণীর ত্রিশ হাজারের বেশী সৈন্য নাই; সম্মিলিত শত্রু সৈন্যকে কিরূপে তিনি বাধা দিবেন?

তৃতীয় চর দ্বিজবর ক্ষণপরে আসিয়া সংবাদ দিল, দনার্দ্দন পতরক-গ্রামে অবস্থান কর্‌ছে।

ব্রজ। পতরক কোথায়?

দ্বিজ। কাঠজুড়ির অপর পারে—চৌঘর হতে কিছু দূরে। এখান হতে দশবার ক্রোশ হতে পারে। আমার মনে হয়, রাজধানীর ভাবগতিক না বুঝে দনার্দ্দন চৌঘর অতিক্রম করে বড় বেশী অগ্রসর হবে না।

দ্বিজবর বিদায় হইল। আরও দুই চারি জন চর আসিয়া রাণীকে নানা সংবাদ দিয়া গেল।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চরেদের বিদায় দিয়া রাণী সেইখানেই বসিয়া রহিলেন। তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন। ভ্রমরের গুঞ্জন, ফুলের দুষ্টামি সকলই তিনি বিস্মৃত হইলেন। সূর্য্য অস্ত গেল—অন্ধকার আসিয়া পৃথিবী ঘিরিল, রাণীর কোন দিকে লক্ষ্য নাই। দণ্ডের পর দণ্ড অতীত হইল—রাণী আত্মবিস্মৃতা। নির্ম্মলা অদূরে দণ্ডায়মানা।

অবশেষে রাণী চিন্তায় কূল পাইলেন। একটু হাস্য-রেখা তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে ভাসিয়া উঠিল। তিনি মাথা তুলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, পৃথিবী অন্ধকারাভিভূতা। ডাকিলেন, "নির্ম্মলা!" নির্ম্মলা আসিল। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজার নিকট হ'তে লোক আসে নি?"

"কখন এসেছে। রোজ আসে, আর আজ আসবে না!"

"তাকে পাঠিয়ে দেও।"

সংবাদ-বাহক অচিরে আসিয়া প্রণাম করিল। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংবাদ কি?"

"সংবাদ শুভ—রাজা ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্চেন; বাধা দিতে বড় বেশী লোক নেই।

ব্রজবালা বলিলেন, "সংবাদ অশুভ বল। যা হো'ক রাজাকে সত্বর ফিরতে বলবে। তাঁকে জানিও যে, ধূর্ত্ত দনার্দ্দন ভূরিভাগ সেনা নিয়ে পাশ কাটিয়ে রাজধানীর কাছে চলে এসেছে। কয়েক সহস্রমাত্র

বিদ্রোহী সেনা রাজাকে ভুলিয়ে ক্রমে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ দিকে কতলু খাঁ নয়াজে উপস্থিত। দুই দল একত্র হয়ে কটক আক্রমণ করতে আসছে। বিপদ গুরুতর।"

সন্দেশ-বাহক বিদায় হইল। রাণী তখন উঠিয়া শয্যা-গৃহে গমন করিলেন এবং উত্তম বসন-ভূষণে সজ্জিত হইলেন। মাথায় মুকুট, কণ্ঠে মণিময় হার, প্রকোষ্ঠে হীরক বলয় যত্নসহকারে পরিলেন। তিনি জানিতেন, ঐশ্বর্য্য বিমণ্ডিত রূপের বিশ্ববিমোহন শক্তি। তাঁহার দেশের মৃন্ময় প্রতিমা দেখিয়াই হয়ত তাঁহার এ ধারণা জন্মিয়াছিল।

তিনি রূপ ও ঐশ্বর্য্যে বিমণ্ডিত হইয়া মন্ত্রণাগৃহে দর্শন দিলেন। যে বিস্তীর্ণ মন্ত্রণাগৃহে রাজা বসিতেন, সেখানে রাণী বসেন না—রাজার সিংহাসনেও রাণী উপবেশন করেন না। রাজার মণিমুক্তাখচিত সিংহাসন খানি আনাইয়া রাণী তাঁহার মন্ত্রণাগৃহের একটা উচ্চস্থানে স্থাপন করিয়াছেন; এবং সেই সিংহাসনের পাদদেশে একটা ক্ষুদ্র রত্নময় আসনে বসিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন।

রাণী আসিয়া তাঁহার আসনের উপর উপবেশন করিলেন। বসিবার পূর্ব্বে একবার রাজার সিংহাসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, ইঙ্গিতে বুঝি প্রণাম করিলেন।

মন্ত্রণাগৃহে দীনকৃষ্ণ, গদাধর, করিম সা প্রভৃতি কয়েকজন সেনাপতি, ভৃগুরাম প্রভৃতি দুই চারিজন মন্ত্রী উপবিষ্ট ছিলেন। রাণী তথায় দর্শন দিবামাত্র সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন; এবং রাণী আসন গ্রহণ করিলে সভাসদ্‌বর্গ স্বস্ব আসনে উপবেশন করিলেন।

একজন সেনাপতি উঠিয়া দেখিয়া আসিলেন, মন্ত্রণা-গৃহের চতুর্দ্দিকে প্রহরীরা সতর্ক আছে কিনা। আর একজন উঠিয়া দেখিয়া আসিলেন, মন্ত্রণাগৃহের দুইটি দ্বার ভিতর হইতে উত্তমরূপ অর্গলবদ্ধ ও তালাবদ্ধ

আছে কি না। তৃতীয় ব্যক্তি উঠিয়া প্রত্যেককে চুপি চুপি সাঙ্কেতিক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি কাণে কাণে তাহার উত্তর দিলেন। তথায় তের জন কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। এই তের জনের সকলেই সকলকে চিনেন ও জানেন। তথাপি তিন জন কর্ম্মচারী উঠিয়া চির-প্রথানুসারে তিনটি কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অতঃপর সকলে আসন পরিগ্রহ করিয়া অবনত-বদনে রাণীর আদেশ প্রতীক্ষায় মৌনী হইয়া রহিলেন।

রাণী তখন ধীরে ধীরে মাথা তুলিলেন। তাঁহার লজ্জাটা ঠিক তখনও ভাঙ্গে নাই। এতগুলা বড় বড় কর্ম্মচারীর সম্মুখে মুখ খুলিয়া কথা কহিতে কেমন একটু বাধ বাধ ঠেকে। আগে কপালের উপর একটু কাপড় টানিতেন; এখন আর সে কাপড়টুকু নাই।

রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজ্যের কুশল?"

সকলে একবাক্যে উত্তর করিলেন, "কুশল।"

রাণী। ধর্ম্ম অক্ষুন্ন?

সকলে। অক্ষুন্ন।

রাণী। রাজ্যে অশান্তি নাই?

সকলে। নাই।

তারপর কার্য্যারম্ভ হইল। সেনাপতি দীনকৃষ্ণ বলিলেন, "কতলু খাঁ নরাজে উপস্থিত হয়েছে।"

রাণী। আমি সে সংবাদ অবগত আছি।

সকলে বিস্মিত হইয়া রাণীর পানে চাহিলেন। রাণী বলিলেন, "আপনারা বোধ হয় একটা সংবাদ অবগত নহেন—"

সকলে। (একবাক্যে) কি, কি সংবাদ?

রাণী। দনার্দ্দন রায় পনর হাজার সেনা নিয়ে পতরকে উপস্থিত।

সকলে স্তম্ভিত হইলেন।

এদিকে কথাটা শেষ করিয়াই রাণী অলক্ষ্যে ভৃগুরামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, তাহার বদন উৎফুল্ল, ক্ষণমধ্যেই সে আত্মসংবরণ করিয়া লইল। রাণীও নয়ন সরাইয়া লইয়া গদাধরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কাল রাত্রিতে দনার্দ্দনকে চুপি চুপি আক্রমণ করতে হবে; আপনার উপর সে আক্রমণের ভার দিব স্থির করেছি।"

দীনকৃষ্ণ বিষণ্নবদনে বলিলেন, "রাণি-মা, রাজ্য বুঝি আর রক্ষা হয় না। এক দিকে কতলু খাঁ, অপর দিকে দনার্দ্দন। এ যাত্রা আমাদের আর রক্ষা নাই।"

রাণী একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "হস্তীর চতুর্দ্দিকে কুক্কুরের দল চীৎকার করে, কিন্তু সে কখন ভীত হয় না। আপনি কেন শঙ্কিত হইতেছেন সেনাপতি? দুই দিনের মধ্যে দেখিবেন, শত্রু-সেনা ঝটিকা-মুখে শুষ্ক পত্রের ন্যায় উড়িয়া যাইতেছে।"

বৃদ্ধ সেনাপতি আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "তা' যদি করতে পার মা তা' হলে চিরদিন তোমার সিংহাসনের পাশে দাঁড়িয়ে তোমার দাসত্ব করব।"

মন্ত্রী ভৃগুরাম ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন, "সেনাপতি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছেন,—স্ত্রী-কন্যার উপর নির্ভর না করিলে আর চলে না।"

ভৃগুরামের কথাটা কাণে না তুলিয়া দীনকৃষ্ণ বলিলেন, "একদিন রাণি-মা, তোমার কথার অবাধ্য হয়ে দনার্দ্দনকে হারিয়েছি—রাজ্যকে বিপন্ন করেছি; আর কখন তোমার অবাধ্য হব না। কি করতে হবে আদেশ কর—আমার বিশ হাজার সেনা আছে।"

রাণী। তাই যথেষ্ট।

ভৃগুরাম থাকিতে পারিল না, বলিল, "তা' বই কি! কতলু খাঁর ত্রিশ হাজার বই ত আর সেনা নাই, আর দনার্দ্দনের মোটে পনর হাজার। আমাদের বিশ হাজার সেনাই যথেষ্ট।"

এ অবক্ষেপ সকলেই বুঝিল; কিন্তু কেহই তাহার কথার উত্তর করিল না। রাণী ক্রোধ দমন করিয়া হাস্যমুখে বলিলেন, "শুনেছি মন্ত্রী ভৃগুরাম একজন বড় যোদ্ধা। ভরসা আছে, তিনি আগামী কল্য রজনীতে আমাদের বিশেষ সাহায্য করিবেন।"

ভৃগুরামের বদন উৎফুল্ল হইল। তিনি বলিলেন, "আমি প্রস্তুত আছি। আমার প্রতি কি আদেশ হয়?"

"তা' কাল সন্ধ্যায় শুনিবেন।"

ক্ষণপরে সভাভঙ্গ হইল—কক্ষদ্বার উদ্ঘাটিত হইল। একে একে সকলে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কেবল দীনকৃষ্ণ, গদাধর ও করিম সা রহিলেন; রাণীর ইঙ্গিতানুসারেই তাঁহারা অবস্থান করিলেন। রাণী, গদাধরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনি সৈন্য সহ প্রস্তুত থাকিবেন। এক সহস্র অশ্বারোহী লইবেন—পদাতিক লইবেন না। আগামী কল্য অপরাহ্নে যাত্রা করিতে হইবে; তদ্পূর্ব্বে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথাযথ উপদেশ লইবেন। এখন যাইতে পারেন।"

গদাধর প্রস্থান করিলেন। করিম সা অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে রাণী বলিলেন, "আপনিও আপনার সেনা নিয়ে প্রস্তুত থাক্‌বেন।"

"কোথায় যেতে হবে রাণি-মা?"

"তা' কাল সন্ধ্যায় শুন্‌বেন।"

"আপনার হুকুমে আমি জাহান্নমে যেতে প্রস্তুত।"

করিম সা প্রস্থান করিলেন। সর্ব্বশেষে দীনকৃষ্ণ অগ্রসর হইলেন, রাণী বলিলেন, "আগামী কল্য মধ্যাহ্নে আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ

করিবেন। আপাততঃ একশত তীরন্দাজ সেনা দয়াপূর্ব্বক পাঠাইয়া দিবেন—এখনই প্রয়োজন।"

"যথা আজ্ঞা" বলিয়া দীনকৃষ্ণ প্রস্থান করিলেন। গৃহ শূন্য হইল। রাণী তবু উঠিলেন না। তিনি নগরপালকে ডাকিয়া আনিবার জন্য এক-জন অনুচরকে অশ্বারোহণে পাঠাইলেন। এক দণ্ডের মধ্যে নগরপাল আসিয়া অভিবাদন করিলেন। রাণী কহিলেন, "আপনি একজন রাজ-ভক্ত প্রবীণ কর্ম্মচারী; আপনার উপর গুরুতর কার্য্যভার দিতেছি। কাঠযুড়ি নদী পারাপার হইয়া কাহাকেও যাইতে বা আসিতে দিবেন না।

নগরপাল। সাঙ্কেতিক কথা বলিলেও না?

রাণী। সাঙ্কেতিক কথা বলিলেও না। আমার বিশেষ আদেশ বা আমার স্বাক্ষরিত ছাড়-পত্র ভিন্ন কাহাকেও যাইতে আসিতে দিবেন না। যদি কেহ বলপূর্ব্বক অথবা লুকাইয়া যাইবার চেষ্টা করে, তা'হলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিহত করিবেন। মোট কথা, নগর বাহিরে আমার গুপ্তচর ও সৈন্য ছাড়া আর কেহ যায়, এটা আমার ইচ্ছা নয়।

নগরপাল। যথা আজ্ঞা।

রাণী। আর এক কথা। আজ রাত্রে এক ব্যক্তি প্রাসাদ হইতে কোনও পত্র লইয়া গোপনে বাহির হইবে। আপনি তাহাকে ধরিয়া বন্দী করিবেন; এবং তাহার বস্ত্র মধ্যে যে পত্র থাকিবে, তাহা লইয়া আমার নিকট আসিবেন।

নগরপাল। যথা আজ্ঞা।

রাণী। আরও একটি অনুরোধ আছে। সেখানে যত নৌকা পাবেন সব ধরে এনে নগর তলে কাঠজুড়িতে রাখ্‌বেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সব নৌকা ঘাটে যেন প্রস্তুত থাকে।

নগরপাল। যথা আজ্ঞা।

নগরপাল বিদায় হইতে না হইতেই একজন প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল, একশত ধানুকী আদেশ অপেক্ষায় দ্বারে দণ্ডায়মান। রাণী তাহাদের দলপতিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দলপতি আসিয়া অভিবাদন করিল।

রাণী তীক্ষ্ণনয়নে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ্‌ছি আপনি বালক"—

দলপতি। বয়সে জ্ঞান বা বুদ্ধির পরিমাপ হয় না, মহারাণি।

রাণী পরিতুষ্ট হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার অধীনে কত তীরন্দাজ আছে?"

দলপতি। একশত।

রাণী। তাহারা শিক্ষিত?

দলপতি। তাদের লক্ষ্য অভ্রান্ত।

রাণী। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ?

দলপতি। আমার আদেশ পেলে তা'রা আমার পিতামহ দীনকৃষ্ণকেও হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয় না।

রাণী। আপনি সেনাপতির পৌত্র? তবে আর আমার কোনও সঙ্কোচ নাই। আপনার উপর গুরুতর কার্য্যভার অর্পণ করিতেছি; ভরসা আছে, দীনকৃষ্ণের বংশধর কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইবেন না।

দলপতি নতমুখে রাণীর আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাণী বলিলেন, "আপনি বোধ হয় শুনে থাক্‌বেন, নরাজে কত্‌লু খাঁ ও পতরকে দনার্দ্দন এসে ছাউনি করেছে। কিন্তু পরস্পর পরস্পরের অস্তিত্ব অবগত নহে। আমার উদ্দেশ্য তাহারা যেন সে সংবাদ অনবগতই থাকে। আপনি আপনার সেনা নিয়ে নরাজের চারি পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে এমনই ভাবে দূরে দূরে সেনা সংস্থাপন কর্‌বেন যে, নরাজের দিক্ হ'তে কোনও

লোক পশ্চিমে না আস্তে পারে—পশ্চিমের লোকও নরাজের দিকে না যেতে পারে।"

দল। উত্তম; যদি কেহ যেতে চেষ্টা করে?

রাণী। নিষেধ কর্‌বেন; না শুনে, হত্যা করবেন।

দল। আর কিছু আদেশ আছে?

রাণী। আছে—মন দিয়া শুনুন। আগামী কল্য রাত্রি একপ্রহর বা দেড় প্রহরের সময় আপনি মাটিতে কাণ পেতে শুন্‌বেন। যখন বুঝ্‌বেন অনেক সৈন্য আপনার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তখন আপনি নদীর দিকে সরে যাবেন। তাহারা আপনার অবস্থিতির স্থান অতিক্রম করে চলে গেলে আপনি নিঃশব্দে নরাজের দিকে অগ্রসর হবেন। পথে সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তখন আপনি তাঁহার আদেশ মত চলিবেন।

দল। মহারাণীর আদেশ শিরোধার্য্য—আমি এখনই যাত্রা করিলাম।

রাণী। নদীপার হবার সময় ছাড়্‌পত্র প্রয়োজন হবে—আপনি তা' নিয়ে যান।

বলিয়া রাণী তাঁহাকে একখানা ছাড়-পত্র লিখিয়া দিলেন। দলপতি বিদায় হইলেন। রাণী তখন নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া উড়িষ্যার মানচিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

---

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাণী যখন মন্ত্রণা-গৃহ হইতে উঠিলেন, তখন রাত্রি দুইপ্রহর অতীত হইয়াছে। দ্বিতলে শয়নকক্ষে আসিয়া দেখিলেন, নির্ম্মলা হর্ম্মাতলে নিদ্রাভিভূতা। রাণীর চক্ষে নিদ্রা নাই; তিনি বাতায়নে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অন্ধকার রাত্রি কৃষ্ণা দ্বাদশী। আকাশময় নক্ষত্র—পৃথিবীময় অন্ধকার। রাণী একখানা আসন টানিয়া লইয়া বাতায়নে বসিলেন।

রাণীর দৃষ্টি আকাশে,—যেখানে আলো, সেইখানে দৃষ্টি। ভবিষ্যতে কি আছে, আলোকে বুঝি দেখা যায়। কিন্তু সামান্য আলোকে বুঝি তা' দেখা যায় না। রাণীর সমস্ত দেহ কাঁপাইয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

এমন সময় একজন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, নগরপাল আদেশ প্রতীক্ষায় নিম্নতলে দণ্ডায়মান। রাণী তৎক্ষণাং নামিয়া আসিলেন, নগরপাল প্রণাম করিয়া দাসীর হাতে একখানা পত্র দিল; বলিল, রাণী মা যা' বলেছিলেন, তা' যথার্থ।"

রাণী দাসীর হাত হইতে পত্রখানা লইয়া তাহাকে বিদায় দিলেন, পরে নগরপালের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পত্রবাহককে বন্দী করেছেন?"

"হাঁ।"

"তাকে ছাড়্‌বেন না। সে কিছু স্বীকার ক'রেছে?"

"সে বলেছে যে, মন্ত্রী ভৃগুরাম তা'কে দনার্দ্দনের নিকট পাঠিয়েছেন।"

রাণী একটু চিন্তাপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার অধীনে কত শান্তি-রক্ষক সেনা আছে?"

নগরপাল। চারি হাজার তিন শত এগার।

রাণী। এই চারি হাজার সেনা আপনি কাল সন্ধ্যার সময় নদীর ধারে একত্র কর্‌বেন। দুর্গ হ'তেও কিছু সাহায্য পাবেন। এই সমবেত সৈন্য পশ্চিম দিকে সাত ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তার করেনদীর ধারে ধারে স্থাপন করবেন। পরে অন্য উপদেশ দেব।

নগ। কোন্ নদী রাণি-মা?

রাণী। কাঠযুড়ি।

নগ। রাণি-মার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

রাণী। আপনি এখন যেতে পারেন। সাবধান, ছাড়পত্র না দেখালে কাউকে নগর-বাহিরে যেতে দেবেন না।

নগরপাল প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। রাণীর কার্য্যকলাপ দেখিয়া নগরপালের বড়ই শ্রদ্ধা ভক্তি জন্মিয়াছে। তাঁহার এক্ষণে আশা হইয়াছে যে, রাণীর বুদ্ধিবলে রাজ্য রক্ষা হইলেও হইতে পারে। তিনি রাণীর আদেশ মত কার্য্য করিতে প্রাণপণে সচেষ্টিত।

রাণী পত্রখানা লইয়া আলোক সাহায্যে পাঠ করিলেন। তাহাতে লেখা ছিল,—"আগামী কল্য রজনীতে আপনি যখন অসতর্ক থাকিবেন, তখন বাঙ্গালী সসৈন্যে আপনাকে আক্রমণ করিবে। সাবধান।" পত্রের নিম্নদেশে ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা ছিল, "কতলু খাঁ নরাজে উপস্থিত হয়েছে। রাজ্য আপনার, কিন্তু বাঙ্গালিনী আমার।"

শেষ ছত্রটা পড়িবামাত্র রাণীর বদন আরক্তিম হইল। তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "বটে!"

পত্রের নিম্নাংশ রাণী কাটিয়া ফেলিয়া দিলেন। প্রথমার্দ্ধ যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিয়া উপরে উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় বাহিরে পদশব্দ শ্রুত হইল। রাণী দাসীকে ডাকিলেন; বলিলেন, "বোধ হয় আমার অনুচরেরা ফিরিয়া আসিয়াছে; দেখ, বাহিরে কে?"

রাণীর অনুমান যথার্থ। চরেরা নগর-বাহিরে যাইতে পায় নাই; তাই ছাড়পত্র লইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। নগরপালের সতর্ক প্রহরায় রাণি পরিতুষ্ট হইলেন। সকলকে বিদায় দিয়া রাণী দুইজনকে রাখিলেন। একজন নটবর, অপর দ্বিজবর। রাণী বাহিরে নটবরকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া একটী ক্ষুদ্র কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং দ্বিজবরকে ভিতরে ডাকিয়া আনিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। দাসী বাহিরে প্রহরায় রহিল। দ্বিজবর বুঝিল, একটা গুরু কার্য্যভার তাহার উপর অর্পিত হইবে। তাহার অনুমান যথার্থ। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "দ্বিজবর তোমার স্ত্রী-পুত্র কোথায়?"

দ্বিজবর। এই নগরে আছে রাণি-মা।

রাণী। দেশে মুসলমান এসেছে শুনেছ?

দ্বিজ। শুনেছি বই কি।

রাণী। তা'রা কি করতে এসেছে জান?

দ্বিজ। দেশ লুঠ করতে।

রাণী। শুধু তাই নয়; তোমার স্ত্রী-পুত্রকে মারতে, তোমার মন্দির ভাঙ্গতে, তোমার ঠাকুর দেবতাকে পোড়াতে তা'রা এদেশে এসেছে। এখন ভরসা ভগবান্।

দ্বিজ। আর ভরসা আপনি রাণি-মা। আমায় কি করতে হবে আদেশ করুন; আমার প্রাণ দিয়াও আপনার আদেশ পালন করব।

রাণী। তুমি এই পত্রখানা নিয়ে পতরকের পথ ধরে অশ্বারোহণে

যাও। পতরকে যাবার দুটা পথ; যে পথ চৌঘরের ভিতর দিয়ে গেছে, সেই পথে যাবে। পতরকে পর্য্যন্ত যেতে হবে না, পথ মধ্যেই—সম্ভবত চৌঘরে—তুমি মুসলমান-বন্ধু দনার্দ্দনের সাক্ষাৎ পাবে। তাঁকে এই পত্রখানা দিয়ে বল্‌বে, মন্ত্রী ভৃগুরাম চিঠিখানা দিয়েছে। বুঝেছ কি?

দ্বিজ। বেশ বুঝেছি মহারাণি।

রাণী, দ্বিজবরের হস্তে ভৃগুরামের লিখিত পত্রখানা দিয়া বলিলেন, "দনার্দ্দন যদি জিজ্ঞাসা করে, কতলু খাঁ কতদূরে তা'হলে তুমি বলো ময়ূরভঞ্জে। পত্রখানা তুমি পড়ে দেখ। কি লেখা আছে, তোমার জেনে রাখা ভাল; কি জানি যদি পত্রখানা পথে হারিয়ে যায়।' তখন তুমি বাচনিক সব বল্‌তে পার্‌বে।"

দ্বিজবর শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্‌। মূর্খকে রাণী কখনও কোন কার্য্যভার দিতেন না। তিনি মানুষ অনেকটা চিনিতে পারিতেন। দ্বিজবর পত্রখানা পড়িয়া বিস্মিত হইল; বলিল, "চিঠিখানা কি সত্যই মন্ত্রী ভৃগুরামের লেখা?"

রাণী। হাঁ, দনার্দ্দন দেখিলেই ভৃগুরামের হস্তাক্ষর চিনিবে।

দ্বিজ। তবে এ চিঠি কেন দিতে যাচ্ছি মহারাণি? দনার্দ্দন যে সতর্ক হবে।

রাণী। আমার উদ্দেশ্য পরে বুঝ্‌বে। এখন একখানা চিঠি লিখতে হবে; আমি বলে যাই, তুমি লেখ।

দ্বিজবর কাগজ ও কলম সংগ্রহ করিয়া লইয়া লিখিত বসিল। রাণী উৎকল ভাষা শিখিয়াছিলেন, কিন্তু ভাল লিখিতে পারিতেন না। রাণী বলিয়া যাইতে লাগিলেন, দ্বিজবর লিখিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে পত্র লেখা শেষ হইল। রাণী পড়িলেন,—

মহামহিমান্বিত বীরকুলধুরন্ধর শ্রীযুক্ত দীনকৃষ্ণ রায়

সেনাপতি বরাবরেষু।

আমাদের আশীর্ব্বাদ জানিবেন। আপনি বিদ্রোহী দনার্দ্দনকে বিতাড়িত করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন শুনিয়া সুখী হইলাম। আপনি এক্ষণে এখানে না ফিরিয়া আপনার সাত হাজার সৈন্য সহ চৌঘরে অপেক্ষা করিবেন। অদ্য রজনীতে আপনার সাহায্যার্থ পঞ্চ সহস্র সৈন্য প্রেরিত হইবে। আপনি এই সমবেত সৈন্য লইয়া নরাজে কতলু খাঁকে আক্রমণ করিবেন। রাজধানী রক্ষার্থে প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য প্রস্তুত আছে; সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন। ইতি—"

পত্রপাঠান্তে রাণী তদুপরি স্বাক্ষর করিলেন,—"রাণী ব্রজসুন্দরী"।

দ্বিজবর বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না রাণি-মা।

রাণী পত্রখানা রাখিয়া দিয়া সহাস্যে বলিলেন, "কাল রাত্রে বুঝ্তে পার্বে দ্বিজবর—আজ যাও।"

রাণী তাহাকে বিদায় দিয়া নটবরকে ডাকিলেন। কক্ষদ্বার পূর্ব্ববৎ বন্ধ হইল। রাণী বলিলেন, "নটবর সকলে আমাকে রাণী বলে ডাকে, তুমি কিন্তু মা ছাড়া আর কিছু বল না। সত্যই কি তুমি আমাকে মায়ের মত দেখ?"

নটবর। মহাপ্রভু জানেন, আপনাকে আমি মায়ের চেয়ে বড় দেখি। আপনি আমার স্ত্রী-পুত্রকে আশ্রয় দিয়েছেন—আমার জীবন রক্ষা করেছেন, আমাকে ধন-দৌলত দিয়েছেন—

রাণী। বেশ; তবে আজ পুত্রের কাজ কর।

নট। কি আদেশ মা?

রাণী। বড় গুরুতর কাজ,—তোমার জীবনকে বিপন্ন কর্‌তে হবে।

নটবর। যে দিন মা তোমার কাজে জীবন দিতে পারব, সে দিন আমার জীবন সার্থক হবে।

রাণীর নয়ন সজল হইল। তিনি বলিলেন, "রাজকার্য্যে তোমায় পাঠাচ্ছি নটবর;—আমার কাজ হলে তোমায় পাঠাতুম না।"

রাণী তখন নটবরকে সবিশেষ উপদেশ দিলেন; বলিলেন, "তুমি আমার দূত—পতরকে সেনাপতির নিকট প্রেরিত হয়েছ। তুমি ভুল করে পাঠান-শিবিরের নিকট গিয়ে পড়েছ। সেখানে তুমি ধৃত হ'লে এবং কতলু খাঁর সম্মুখে আনীত হলে। তোমার বস্ত্রমধ্যে এই পত্রখণ্ড পাওয়া গেল—"

বলিয়া রাণী যে পত্রখানা ইতিপূর্ব্বে দ্বিজবর তাঁহার উপদেশানুসারে লিখিয়াছিল, তাহা নটবরকে পড়িয়া শুনাইলেন। এবং সেখানা তাহার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন সব বুঝেছ? তোমার নিকট লুকাইবার কিছু নাই।"

নটবর। আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন মা। পুত্র কার্য্যোদ্ধার করে আবার মায়ের চরণে প্রণাম করবে।

রাণী। অপরাহ্নে পাঠান-শিবিরের কাছে যাবে—তদ্‌পূর্ব্বে নয়। কার্য্য গুরুতর; কিন্তু তোমার বুদ্ধি ও শক্তিও অসামান্য। এখন যেতে পার।

ছাড়-পত্র দিয়া রাণী তাহাকে বিদায় দিলেন। তখন পূর্ব্বাকাশে অরুণোদয় হইয়াছে।

---

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নরাজ-পাহাড়ের পাদমূলে পাঠান-শিবির। শিবির বহুদূরব্যাপী, অশ্বারোহী, পদাতি গোলন্দাজ প্রভৃতি সকল রকমের সৈন্যে শিবির সালঙ্কৃত। এই বাহিনীর নেতা প্রসিদ্ধ যোদ্ধা কতলু খাঁ।

শিবিরের একপ্রান্তে নদী-উপকূলে কতলু খাঁর বস্ত্রাবাস। তন্মধ্যে বিলাসিতার কোনও ত্রুটি নাই। সুন্দর গালিচা, সুন্দরী রমণী, কোমল শয্যা, মখমলমণ্ডিত আসন কিছুরই অভাব নাই। উত্তম সরাপ, সুগন্ধি তামাকু, আতর, গোলাব সকলই আছে। আবার সেই শয্যা ও আসনের আশে পাশে শাণিত কৃপাণও রহিয়াছে। মুসলমান যেমন বিলাসী, তেমনই শক্তিশালী। আজিকার দিনে শক্তি গিয়াছে, বিলাসিতা আছে।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদ-বর্ণিত ঘটনার পরদিন অপরাহ্ণে কতলু খাঁ তাঁহার শিবিরে বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। সরাবও কিছু কিছু চলিতেছিল, কতলু খাঁর শিবিরে কয়েকজন উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারী উপবিষ্ট ছিলেন। দুই চারি জন চাটুকারও ছিল।

কতলু খাঁ একজন কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "সেতু কি এখনও হয় নি, কাসিম?"

"না।"

"আর বিলম্ব কত?"

"রাত্রি একপ্রহরের পূর্ব্বে যে শেষ হয়, এমন অনুমান হয় না।"

"তবে আজও রাত্রি আমাদের এখানে কাটাতে হবে?"

একজন চাটুকার বলিয়া উঠিল, "সে ত খুব মজা—যুদ্ধ ত আছেই।"

আর একজন বলিল, "তবে নাচ্‌নেওয়ালী ডাকি?"

কতলু খাঁ রমণী ও সরাবের বড়ই অনুরাগী ছিলেন। যেখানে যাইতেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দুই বস্তুই চলিত। যখনই কোন কাজ না থাকিত, তখনই সরাব ও নৃত্যগীতাদি চলিত।

কতলু খাঁ একটু অন্যমনস্ক ছিলেন, সহসা কোনও উত্তর করিলেন না। চাটুকার পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "নাচ্‌নেওয়ালী ডাকি?"

এমন সময় একজন প্রহরী আসিয়া এত্তেলা করিল, "দুইজন গুপ্তচর ধরা পড়েছে।"

কতলু খাঁ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুপ্তচর? আমার শিবিরে!"

প্রহরী নিরুত্তর রহিল। একজন কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন করে জান্‌লে তা'রা গুপ্তচর?"

"একজনের বস্ত্রমধ্যে একখানা চিঠি পাওয়া গেছে।"

"চিঠি কোথায়?"

"মনসবদারের কাছে।"

তখন মনসবদার ও বন্দীদ্বয়ের তলব হইল। তাহারা অচিরে আসিল। বন্দীদের একজন পুরুষ, অপরা স্ত্রী। যে পুরুষ, সে আমাদের পরিচিত—নটবর। স্ত্রীলোকটির সহিত আমাদের আলাপ পরিচয়ের সৌভাগ্য পূর্ব্বে ঘটে নাই। কিন্তু নটবরের ঘটিয়াছিল। কেননা, সে নটবরের অর্দ্ধাঙ্গিনী। নটবর তাহার ছেলেমেয়ে দুইটিকে রাণীর দ্বারদেশে ফেলিয়া রাখিয়া সস্ত্রীক এই বিপজ্জনক কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে। স্ত্রী ললাটী সানন্দে স্বামী-সঙ্গে আসিয়াছে। স্ত্রী, স্বামীর উপযুক্তা। সাহস ও চতুরতায় স্ত্রী,

স্বামী অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহেন—বরং একটু উপরে উঠে। সে কৃশা, কিন্তু সবলা; কৃষ্ণকায়া, কিন্তু সুন্দরী; বিগতযৌবনা, কিন্তু লাবণ্যময়ী।

নটবর বস্ত্রাবাস মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সাষ্টাঙ্গে কতলু খাঁকে প্রণাম করিল—ললাটী, মনসবদারের দেখাদেখি সেলাম করিল। নটবর বলিল, "হুজুর!"

ললাটী ডাকিল, "বাদশা!"

কতলু খাঁ নিঃশব্দে তাহাদের আপাদমস্তক লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। পরে মনসবদারের দিকে ফিরিয়া ইঙ্গিত করিলেন। সে সেলাম করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া সেনাপতির হস্তে পত্রখণ্ড দিল। তিনি তাহা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া অবশেষে কাসিম খাঁকে নিকটে ডাকিলেন। কাসিম উৎকল ভাষা শিখিয়াছিল। কতলু খাঁ লিখিতে পড়িতে পারিতেন না, কিন্তু ভাষা বুঝিতে পারিতেন। সে সময় অনেক হিন্দু, মুসলমান উৎকল ভাষা শিক্ষা করিতেছিলেন। সকলেরই লক্ষ্য তখন উৎকলের প্রতি। কেননা, একমাত্র উৎকলই সে সময় হিন্দু-স্বাধীনতা সগর্ব্বে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল।

সে যাহা হউক, দ্বিজবরের হস্তলিখিত পত্রখানা এক্ষণে কাসিম খাঁ কর্তৃক সভামধ্যে পঠিত হইল। পত্রমর্ম্ম অবগত হইয়া সকলে চমকিত হইলেন। কতলু খাঁ কিছু বলিলেন না। নটবর তখন কাঁপিতে কাঁপিতে মাটীর উপর বসিয়া পড়িল; এবং যুক্তহস্তে বলিল, "হুজুর, বাদসা, আমি কিছু জানি নে—"

"পত্র নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলে?"

"হুজুর, তা জানি নে।"

"কার কাছে যাচ্ছিলে?"

"বাদশা, আমি কিছুই জানি নে।"

এক ভীষণ চপেটাঘাত নটবরের পৃষ্ঠোপরি পড়িল। আঘাতকারী আর কেহ নয়, তাঁহারই অর্দ্ধাঙ্গিনী। চড় খাইয়া নটবর "হুজুর" "হুজুর" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। ললাটী মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "বাদশার সাম্‌নে মিছে কথা! বাদশা যখন দেশে এসেছেন, তখন তোর রাণীর রাজত্ব উঠে গেছে। সত্যি কথা বল্।" পরে কতলু খাঁর দিকে ফিরিয়া বলিল, "বাদশা, ও সব জানে।"

কতলু খাঁ, ললাটীর ব্যবহারে পরম প্রীত হইয়া বলিলেন, "তুমি কি জান, বলত।"

ললাটী তখন বলিতে লাগিল, "আমাদের দেশে একটা বাঙ্গালী মেয়ে এখন রাজা হয়েছে না? এই মিন্‌সে তা'কে খুব ভালবাসে; যেখানে সেখানে তা'র চিঠি নিয়ে যায়। আমি কিছুতেই হতভাগাকে ঘরে ধরে রাখ্‌তে পারি নে। আজ ক' দিন ঘরে আসে নি, তাই ধরে আন্‌তে গিছলুম। নগরের কাছে দেখা হ'ল। হতভাগা কিছুতেই আমার সঙ্গে আসবে না; বলে, আমি চৌঘরে যাব। আমি বলি, সামুটী যাবে। ও পশ্চিমে যাবে; আমি পূবে যাব। তা' বাদশা, আমার সঙ্গে ও পার্‌বে কেন, আমি এতদূর টেনে এনেছি। এখান থেকে আমার বাড়ী বেশী দূর নয়।"

কতলু খাঁ এতক্ষণে বুঝিলেন, চৌঘরের দিকে না গিয়া নরাজের দিকে কেন আসিয়া পড়িল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্দি, সত্য বল, কার কাছে পত্র নিয়ে যাচ্ছিলে?"

বন্দী কাঁদিতে লাগিল। বন্দিনী মুখভঙ্গী করিয়া তাহার মুখের কাছে হাত-পা নাড়িল; বলিল, "কেমন, এখন যাও তোমার সেনাপতির কাছে।" তা'রপর কতলু খাঁর দিকে ফিরিয়া তিন সেলাম ঠুকিল; বলিল,

"ও মিন্‌সে সেনাপতির কাছে যাচ্ছিল। তিনি একটা মস্ত যুদ্ধ জিতে চৌঘরে বসে হাওয়া খাচ্ছেন। বাদশা-মশাই, কোন রকমে এই বাঙ্গালী মেয়েটাকে আমাদের দেশ হতে তাড়াতে পার? মেয়েটা মন্ত্রীগুলোকে ভেড়ো করেছে, রাজাকে তাড়িয়েছে, দনার্দ্দনকে বন্দী করেছে, মেয়েটা সব পারে।"

কতলু খাঁ একটু হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যখন বলছ, তখন তাকে তাড়াব। এখন তোমরা বাইরে যাও।"

ললাটী যুক্তকরে বলিল, "বাদশা-মশাই, আজ আমাদের এখানে থাক্‌তে দিন। যদি নিতান্তই এখানে স্থান না দেন, তাহলে একটা লোকের হুকুম হোক—আমাদের সঙ্গে যাবে, মিন্‌সেটাকে আর টেনে নিয়ে যেতে পারছি নে।"

কাশিম খাঁ হাসিয়া বলিলেন, "আজ তোমরা দুজনেই বাদশার অতিথি হয়ে এইখানেই থাক।"

ললাটী প্রফুল্ল বদনে "বেশ" বলিয়া প্রহরীর সঙ্গে বাহিরে আসিল, নটবরও অবশ্য তাহাদের অনুবর্ত্তী হইল। কিন্তু তাহারা বন্দী হইয়া রহিল না—শুধু নজরবন্দী রহিল। নটবর ও ললাটী উভয়েই জানিত, কোন কারাগার বা প্রহরী তাহাদের দীর্ঘকাল ধরিয়া রাখিতে সমর্থ নহে।

বন্দীদের বিদায় দিয়া কতলু খাঁ মন্ত্রণা আঁটিতে বসিলেন। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল, আপাততঃ রাজধানী আক্রমণ করিতে যাওয়া বৃথা প্রয়াস; কেন না, তথায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য অবস্থান করিতেছে। তা' ছাড়া শত্রুকে পিছনে রাখিয়া অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। দীনকৃষ্ণ রায় বার হাজার সৈন্য লইয়া পিছনে থাকিলে রসদ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। বড় বড় সৈনিক কর্ম্মচারীরা পরামর্শ দিলেন, "দীনকৃষ্ণ

আমাদের আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে আমরাই আগে তাহাকে আক্রমণ করি।" পরামর্শটা কতলু খাঁ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। জনৈক সৈনিক বলিলেন, "দীনকৃষ্ণের বার হাজার সেনা আমরা ফুৎকারে উড়ায়ে দেব।"

একজন চাটুকার বলিল, "কিন্তু নাচটা হ'ল না।"

কতলু খাঁ সে কথা কানে না তুলিয়া বলিলেন, "কিন্তু অন্ধকারে লুকিয়ে চুপি চুপি আক্রমণ কর্‌তে হবে। আমাদের সৈন্য বেশী ক্ষয় না হয়, সেটাও ত দেখ্‌তে হবে।"

পরামর্শটা স্থির হয়ে গেল। তখন পথপ্রদর্শকদের তলব পড়িল। তাহারা বলিল, "চৌঘর বেশী দূর নয়—পাঁচ সাত দণ্ডের মধ্যে তথায় পৌঁছন যেতে পারে।"

এখন পাঠানবাহিনী সাজিতে লাগিল। রাজধানী-আক্রমণের কথাটাই সৈন্য-দলের মধ্যে প্রচার রহিল। রাত্রি যখন একপ্রহর, তখন কতলু খাঁ প্রায় পঁচিশ হাজার সৈন্য লইয়া চৌঘরের পথ ধরিলেন। শিবির রক্ষার্থে দুই হাজার সৈন্য রহিল। অন্ধকার রাত্রি—পথ দেখা যায় না; তবু কতলু খাঁ নির্ভয়ে অজ্ঞাতপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নটবর সস্ত্রীক কিছুদূর পিছনে পিছনে আসিয়াছিল; তারপর সুবিধামত স্থানে সরিয়া পড়িল; এবং রাণীকে সংবাদ দিতে অশ্বারোহণে নগরাভিমুখে ধাবিত হইল।

ঠিক সেই সময়ে চৌঘরে দনার্দ্দন রায় চমৎকার কৌশলে সৈন্য ব্যূহ রচনা করিয়া আস্ফালন পূর্ব্বক বলিতেছিলেন, "আজ বাঙ্গালীকে জালে ফেল্‌ব—পঞ্চাশ হাজার সেনা নিয়ে এলেও তার নিস্তার নেই।"

দনার্দ্দনকে আমরা একবার বহুপূর্ব্বে ত্রিবেণী-ক্ষেত্রে দেখিয়াছিলাম। তখনও সর্প, এখনও সর্প। তবে তখন পত্রান্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিল, এক্ষণে

প্রকাশ্য রাজপথে বিচরণ করিতেছে। ভৃগুরাম আজও প্রচ্ছন্নতা ত্যাগ করে নাই। দনার্দ্দনের বড় ইচ্ছা, ভৃগুরাম সদলে আসিয়া তাহার সহিত যোগ দেয়। তাই দনার্দ্দন, ভৃগুরামের পত্রোত্তরে লিখিয়াছিল, "আপনার পত্র পাইয়া বড় সুখী হইলাম। বাঙ্গালীর অভ্যর্থনার জন্য যথেষ্ট আয়োজন হইবে। আপনি স্বয়ং আসিয়া দেখিবেন, ইহা আমার সবিশেষ অনুরোধ।"

দ্বিজবর, ভৃগুরামের পত্র বহিয়া আনিয়াছিল; আবার উত্তরও লইয়া গিয়াছিল। যখন সে উত্তর লইয়া রাজধানীতে পঁহুছিল, তখন সূর্য্যদেব নীলাচলের অন্তরালে লুকাইয়াছেন।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাণী ব্রজবালা বড়ই উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত। তিনি বুঝিয়াছিলেন; নটবরের কার্য্যতৎপরতার উপর তাঁহার বিপুল আয়োজনের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। যদি তাহার দৌত্য নিষ্ফল হয়, তাহা হইলে রাজ্য অধিকতর বিপন্ন হইবে। কিন্তু নটবর কি অকৃতকার্য্য হইবে? রাণী যখন নটবরের পুত্রকন্যার নিকট শুনিলেন, নটবর সস্ত্রীক গিয়াছে, তখন তিনি কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। রাণী জানিতেন, ললাটী স্থিরবুদ্ধিশালিনী। তিনি তদ্ধেতু তাহাকে একটু স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন, এবং তাহার বসবাসের জন্য নগরমধ্যে দিব্য একটি বাড়ী দিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে রাণী প্রাসাদ-চূড়ায় উঠিয়া অস্থিরচিত্তে পাদচালনা

করিতেছিলেন। এক একবার দূরবর্ত্তী পথপানে দেখিতেছিলেন। নটবর বা দ্বিজবর কাহাকেও না দেখিয়া আবার পরিক্রমণ করিতেছিলেন। একবার চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, সূর্য্য রক্ত-বদন; নীলাচল অবগুণ্ঠিত; মহানদী রোরুদ্যমানা। নগর নীরব, স্তম্ভিত। দুর্গ চকিত, সন্ত্রস্ত। একটা ভয়, একটা বিষাদ, একটা আতঙ্ক যেন চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রবল শত্রু দ্বারে—আক্রমণোদ্যত। কেহ কেহ নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। যাহারা আছে, তাহারা একজনের মুখ চাহিয়া আজও আছে। সেই একজন আবার রমণী, বয়সে তরুণী। রাণী সকল অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া একবার আকাশপানে চাহিলেন। বুঝি বা শক্তি খুঁজিতেছিলেন।

রাণীর হাতে একখানি উড়িষ্যার মানচিত্র ছিল। পতরক, নরাজ, চৌঘর প্রভৃতি স্থান কোথায়, কোনদিকে তাহা শতবার দেখিয়াছেন। তবু সে মানচিত্রখানি ছাড়িতে পারেন নাই। বারম্বার তাহা দেখিতে-ছিলেন। যখন অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, তখন রাণী সেখানি গুটাইয়া লইয়া ছাদের উপর বসিয়া পড়িলেন।

এমন সময় একজন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, "মন্ত্রণা-গৃহে সেনাপতি দীনকৃষ্ণ, গদাধর, করিম সা, ভৃগুরাম, নগরপাল প্রভৃতি মহারাণীর অপেক্ষা করিতেছেন।" রাণী উঠিলেন না—বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। ক্ষণপরে দ্বিতীয় দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, "দ্বিজবর প্রণাম করিতে আসিয়াছে।" রাণী তখন ঝটিতি উঠিয়া ক্ষিপ্রপদে নীচে নামিয়া আসিলেন। এবং পূর্ব্ব পরিচিত ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বিজবরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। একখানি ছোট চৌকীর উপর কুসুমকোমল শয্যা বিস্তৃত ছিল, রাণী তদুপরি উপবেশন করিলেন।

দ্বিজবর, রাণীর চরণে প্রণাম করিয়া দনার্দ্দনের পত্র দিল। ঘরে

উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছিল। রাণী তদালোকে পত্র পাঠ করিলেন।' পাঠান্তে রাণীর বদন প্রফুল্ল হইল; তাঁহার মনে আবার শক্তি ও সাহস ফিরিয়া আসিল। তিনি ভাবিলেন, "যখন এক স্থানে কৃতকার্য্য হয়েছি, তখন অপর স্থানেও কৃতকার্য্য হব—নিশ্চয় হব।"

রাণী তখন দ্বিজবরকে বিদায় দিয়া নগরপালকে ডাকিলেন। এবং চুপি চুপি তাঁহাকে কিছু উপদেশ দিলেন। নগরপাল ফিরিয়া গিয়া ভৃগু-রামকে বলিলেন, রাণি-মা আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন।"

সর্ব্বাগ্রে ভৃগুরামের খাতির। সে গরবে ফুলিয়া উঠিল। বক্রভাবে দীনকৃষ্ণের প্রতি একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভৃগুরাম, নগরপালের অনুগমন করিল। কিন্তু নগরপাল তাহাকে রাণীর নিকট না লইয়া গিয়া অন্য একটা ক্ষুদ্র কক্ষমধ্যে লইয়া গেলেন; এবং তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বাহির হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। অনতিবিলম্বে দুইজন সশস্ত্র প্রহরী দ্বারের দুই পার্শ্বে দাঁড়াইল, ভৃগুরাম বিনা গোলযোগে সকলের অজ্ঞাতসারে বন্দী হইলেন।

রাণী তখন দীনকৃষ্ণ প্রভৃতিকে একে একে ডাকিয়া পাঠাইয়া চুপি চুপি উপদেশ দিতে লাগিলেন। গদাধরের ডাক পড়িল, সকলের শেষে। রাণী তাঁহাকে যথাযথ উপদেশ দিয়া বিদায় দিলেন। কিন্তু গদাধর নড়িলেন না—দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কিছু বক্তব্য আছে কি?"

গদাধর। শুনিতেছি, পতরকে শত্রু নাই—নগরের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তা' আমি পতরকে শত্রুর অপেক্ষায় বসিয়া থাকিয়া কি করিব?

রাণী ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। গদাধর বলিলেন, "যাহারা যুদ্ধব্যবসায়ী, তাহাদের মতামত লইয়া কার্য্য করা উচিত। আপনি কখন উলঙ্গ কৃপাণও—"

রাণী বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনার নিকট উপদেশ চাহি নাই—উপদেশ দিতে আপনাকে আহ্বান করিয়াছি। আদেশ প্রতিপালনে আপনার অনিচ্ছা থাকে, আপনি এই মুহূর্ত্তে উড়িষ্যা ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন—উড়িষ্যার কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।"

গদাধর দাঁড়াইয়া স্থিরদৃষ্টে ব্রজবালার পানে চাহিয়া রহিলেন। ব্রজবালা তদ্দৃষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি স্থির করিলেন?"

গদাধর উত্তর করিলেন, "স্থির করিলাম, সাত বৎসর পূর্ব্বে যাহাকে ক্ষুদ্র পল্লীমধ্যে দেখিয়াছিলাম, তাহাকেই আজ সম্মুখে দেখিতেছি। আদেশ প্রতিপালন করিতে চলিলাম; কিন্তু রাজ্য যেন উৎসন্ন না যায়—এক রাত্রির মধ্যে উড়িষ্যার স্বাধীনতা যেন বিলুপ্ত না হয়।"

রাণী চমকিয়া উঠিলেন। সত্যই কি তিনি ভুল বুঝিয়া রাজ্য উৎসন্ন দিতে বসিয়াছেন? রাণী চিন্তামগ্ন হইলেন। নিজের সুখসমৃদ্ধির প্রতি তাঁহার আর লক্ষ্য নাই; নিজের আগে—রাজার আগে, এক্ষণে উড়িষ্যা।

রাত্রি একপ্রহর তদবস্থায় অতিবাহিত হইল। সহসা একজন দাসী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাণীর চিন্তাস্রোতে বাধা দিল। রাণী একটু বিরক্ত হইলেন। দাসী বলিল, "রাজার নিকট হ'তে দূত এসেছে।"

রাণী তাহাকে আসিতে ইঙ্গিতে আজ্ঞা দিলেন। দূত আসিয়া অভিবাদনান্তে একখানি পত্র দিল। পত্রখানি রাজার। রাণী পড়িলেন,—

"আমার রাজ্যেশ্বরী, আমার সর্ব্বস্বধন!"

রাণীর চক্ষে জল আসিল। দাসী ও দূতকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া রাণী পুনরায় পত্রপাঠে মনোযোগী হইলেন। পড়িলেন,—"আমার রাজ্যেশ্বরী, আমার সর্ব্বস্বধন! রাজ্যময় তোমার সুনাম, তোমার যশ।

যাহাদের আমি আয়ত্ত করিতে পারি নাই, তাহারা তোমার বশীভূত। যে একতা স্থাপন করিতে এতকাল আমি বৃথা চেষ্টা করিয়াছি, তুমি স্বল্পকালমধ্যে তাহা স্থাপন করিয়াছ। ব্রজসুন্দরি, তুমি অতুলনীয়া।

"কিন্তু আমাদের সকল চেষ্টা বৃথা। উড়িষ্যার পতন অনিবার্য্য। বেসর মহান্তি একদিন বলিয়াছিলেন, 'যখন উড়িষ্যায় স্বদেশবৈরী বিশ্বাসঘাতক জন্মিবে, তখন উড়িষ্যার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইবে।' আজ সে দিন সমাগত। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের বৃথা প্রয়াস রাণি!

"আর শুনিলাম, কতলু খাঁ বহু সৈন্যসহ রাজধানীর সন্নিকটে পৌঁছিয়াছে। দনার্দ্দনও প্রায় বিশ পঁচিশ হাজার সৈন্য লইয়া নগর আক্রমণ করিতে ছুটিয়াছে। এই বিপুল শত্রুবাহিনীকে বাধা দিবার উপযোগী সেনা রাজধানীতে নাই। আমি ও যুবরাজ ভূরিভাগ সৈন্য লইয়াছি। অতএব এক্ষণে রাজধানীতে অবস্থান নিরাপদ নহে; তুমি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া তোমার সৈন্যসহ আমার সহিত সম্মিলিত হইবে। উড়িষ্যার ভাগ্যে যাহা আছে তাহা ঘটিবে—তুমি বা আমি রোধ করিতে পারিব না। যদি কখন সুবিধা ও সুযোগ পাই, তখন আবার চেষ্টা দেখিব।

"আমি ফিরিলাম—তোমাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আমি রাজধানীর দিকে ফিরিলাম। তুমি আসিবে। রাজ্যের চেয়ে—সকলের চেয়ে তুমি বড়। তুমি আসিও। তোমার মুকুন্দ—"

ব্রজবালার অজ্ঞাতসারে তাহার মুখ হইতে বিনির্গত হইল, "ছি! ছি!"

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এদিকে কতলু খাঁ বড় মুস্কিলে পড়িলেন। চৌঘরের সন্নিকটবর্ত্তী হইতে না হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর আসিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। বুঝিলেন, তিন দিক্ হইতে শর নিক্ষিপ্ত হইতেছে। পশ্চাৎ উন্মুক্ত; কিন্তু পাঠান সহজে পশ্চাৎ ফিরে না। তিনি পিছু ফিরিলেন না; বরং দ্রুতপাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া শত্রুর সমীপস্থ হইতে চেষ্টা করিলেন। তখন তিনি ব্যূহ-রচনা করিয়া বন্দুকধারী সৈন্যদের সম্মুখে ও পার্শ্বে আনিলেন। তাঁহার দুইটা কামান ছিল; কিন্তু তিনি তাহা সঙ্গে আনেন নাই—শিবিরে রাখিয়া আসিয়াছেন। অতএব বন্দুকের উপর নির্ভর করিয়া গুলিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহাতে বড় ফললাভ হইল না; কেননা, শত্রু অদৃশ্য।

কতলু খাঁর সঙ্গে কিছু অশ্বারোহী-সৈন্য ছিল। তিনি সেই সৈন্যদের সঙ্গে লইয়া কোভরে অগ্রসর হইলেন। অচিরে শত্রুর দর্শন মিলিল; তখন পাঠান-সৈন্য বিপুল উৎসাহে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সে সময় যদি কেহ পাঠানদের বলিত, 'তোমরা এ কি করিতেছ?—মিত্র দনার্দ্দনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছ?'—তাহা হইলেও তাহারা তখন ফিরিত না। কেননা, তাহারা দাঁড়াইয়া মার খাইয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

পাঠান ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল; দনার্দ্দন রায় হটিতে লাগিল। এদিকে পাঠানের পার্শ্বদেশে মাটীতে শুইয়া যাহারা শরনিক্ষেপ

করিতেছিল, তাহারা যুদ্ধের ভাব বুঝিয়া সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। কিন্তু পাঠান সরিতে দিল না। পাঠান-বাহিনীর বিসর্পিত বিপুল দেহ ঘুরিয়া ধানুকীদের বেষ্টন করিল। ধানুকীদের বড় বেশী কেহ পলাইতে পারিল না। জঙ্গল নিকটে ছিল না, নদীও দূরে। যাহারা নদীর দিকে ছিল, তাহাদের কিছু সুবিধা হইল; তাহারা ছুটিয়া গিয়া নদীর জলে পড়িয়া আত্মরক্ষা করিল।

দনার্দ্দন যখন বুঝিল, 'বাঙ্গালী' তাহাকে আক্রমণ করে নাই—পাঠান-বাহিনী আক্রমণ করিয়াছে, সে তখন যুদ্ধ বন্ধ করিতে মনস্থ করিল; কিন্তু বন্ধ করিলে নিজেই মুহূর্ত্তে ধ্বংস হইয়া যায়। দনার্দ্দন দুই একবার কতলু খাঁর নিকট আত্মপরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। তখন দনার্দ্দন অনন্যোপায় হইয়া পলায়নতৎপর হইল। সে উদ্যমে দনার্দ্দনের অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইল। অবশিষ্টাংশ লইয়া দনার্দ্দন যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে পলায়ন করিল। শ্রান্ত পাঠান-সৈন্য অন্ধকারের ভিতর আর তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল না।

দনার্দ্দন পথে যাইতে যাইতে পশ্চাতে বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইল। ভাবিল, পাঠানেরা তাহার পশ্চাদনুসরণ করিয়াছে। সে আরও দ্রুত চলিতে লাগিল। দুই এক দণ্ড পরে কামানের শব্দ তাহার কর্ণগোচর হইল। তখন সে নিতান্ত ভীত হইয়া অশ্ব ছুটাইল। তাহার অশ্বারোহী সেনা অল্পই ছিল। যাহারা অশ্বে ছিল, তাহারা দনার্দ্দনের সঙ্গে চলিল। পদাতিক সৈন্য যখন দেখিল, দনার্দ্দন তাহাদের ছাড়িয়া পলাইয়াছে, তখন তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া যে যেদিকে পারিল, পলায়ন করিল। অনেকে নদীজলে লাফাইয়া পড়িয়া অপর পারে গিয়া উঠিল। তাহাদের বিশ্বাস, পাঠান তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। নৈশ নিস্তব্ধতায় দূরের শব্দ নিকটে শুনায়।

এদিকে দনার্দ্দনকে বড় বেশী দূর যাইতে হইল না। পতরকে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই সে আক্রান্ত হইল। তখন পূর্ব্বাকাশে একটু অরুণরাগ দেখা দিয়াছে। দনার্দ্দন সহসা বুঝিল না কে তাহাকে আক্রমণ করিল। আক্রমণের ভাব দেখিয়া বুঝিল, শত্রু বড় চতুর। দুই এক দণ্ডের মধ্যে যুদ্ধের অবসান হইল। দনার্দ্দন শতাধিক সৈন্যসহ ধৃত হইল। দুই তিন শত মাত্র পলায়নে সমর্থ হইল। অবশিষ্ট নিহত হইল।

রজনীপ্রভাতে দনার্দ্দন তাহার শত্রুকে চিনিল,—এ সেই চক্ষুঃশূল বাঙ্গালী। একবার ত্রিবেণীক্ষেত্রে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। তদবধি উভয় উভয়কে ঘৃণা করিত। এক্ষণে সেই ঘৃণাস্পদ বাঙ্গালীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইল দেখিয়া দনার্দ্দন মরমে মরিয়া গেল, কিন্তু উপায় নাই; গদাধরের পশ্চাতে বন্ধনাবস্থায় রাজধানী অভিমুখে দনার্দ্দনকে যাইতে হইল।

গদাধরও দনার্দ্দনকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ তিন প্রহর রজনী শত্রুশূন্য পতরকে অতিবাহিত করিয়া গদাধর, রাণীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। তা'রপর যখন তিনি অকস্মাৎ দূরে অশ্বপদশব্দ শুনিলেন, তখন তিনি বিস্মিত হইয়া ক্ষিপ্রতাসহ ব্যূহরচনা করিলেন; এবং মনে মনে রাণীর অনেক প্রশংসা করিলেন। পরে দিবালোকে যখন দনার্দ্দনকে দেখিলেন, তখন তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি উদ্দেশে রাণীকে প্রণাম করিলেন।

---

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

কতলু খাঁ এক বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইয়া আবার এক বিপদে পড়িলেন। তিনি দনার্দ্দনকে পরাস্ত করিয়া নরাজ-অভিমুখে ফিরিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় সহসা তিনি আক্রান্ত হইলেন। কে কোন্ দিক্ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিল বুঝিবার পূর্ব্বেই তাঁহার এক সহস্র সৈন্য বিনষ্ট হইল। তাঁহার বুদ্ধি, ক্ষিপ্রতা ও রণকৌশল অসাধারণ। তিনি সত্বর ব্যূহরচনা করিয়া শত্রুর সম্মুখীন হইলেন।

শত্রু এবার নগণ্য নয়,—স্বয়ং দীনকৃষ্ণ। তিনি দশ সহস্র সৈন্যসহ যথাসময়ে রাণীর আজ্ঞামত পাঠানকে আক্রমণ করিয়াছেন। পাঠানের সংখ্যা তখনও প্রায় বিংশতি সহস্র। সুতরাং যুদ্ধ শীঘ্র শেষ হইল না—পূর্ণতেজে চলিতে লাগিল। এমন সময় নৈশ আকাশ মথিত করিয়া সহসা কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। উভয় দল চমকিত হইয়া ক্ষণেকের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইল। এ কি পাঠানের কামান? না, হিন্দুর কামান? সকলে বুঝিল, যা'র কামান তার জয়।

কা'র কামান বলিতে হইলে আমাদের করিম সার অনুসরণ করিতে হয়। রাত্রি দেড় প্রহরের সময় করিম সা পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ নরাজে আসিয়া দেখিলেন, দুই সহস্র সৈন্যমাত্র তথায় অবস্থান করিতেছে। তিনি আচম্বিতে তাহাদের আক্রমণ করিয়া কতক নিহত ও কতক বন্দী করিলেন। দুইটা কামান শিবিরে ছিল। তিনি তাহা সঙ্গে লইয়া রাণীর আজ্ঞামত চৌঘর-অভিমুখে ছুটিলেন, এবং চুপি চুপি

পাঠান-বাহিনীর পার্শ্বদেশে আসিয়া কামান দাগিলেন। তিনি গোলা বারুদ বেশী আনিতে পারেন নাই; তাহা যখন নিঃশেষিত হইল, তখন তিনি অসিহস্তে ভীত ত্রস্ত পাঠানের পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিলেন। পাঠান-বাহিনী দুই দিকে ভীষণ বেগে আক্রান্ত হইয়া সত্বরই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। তবু তাহারা যুদ্ধ করিতে ছাড়িল না। কতলু খাঁ ব্যূহরচনা করিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। ব্যূহ একবার ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা পুনর্গঠন সহজসাধ্য নহে—বিশেষতঃ অন্ধকারে। পাঠান-সেনা তখন পলায়নপর হইল। দুই পার্শ্ব উন্মুক্ত,—পশ্চাৎ ও নদীর দিক্। পশ্চাতে দনার্দ্দন আছে; অনেকে নদীর দিকে ছুটিল। কতলু খাঁ ত্রিসহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ হিন্দু-সৈন্য ভেদ করিয়া কোনও মতে পলায়নে সমর্থ হইলেন। তখন অরুণোদয় হইয়াছে।

যাহারা নদী পার হইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারা এক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া আবার এক বিপদে পড়িল। নদীপারে স্থানে স্থানে নগরপালের শান্তিরক্ষক সেনা ছিল। হিন্দু বা পাঠান যে যখন নদীপারে আসিতেছে, সে তখন নিঃশব্দে ধৃত হইতেছে। যে সন্তরণে অপটু, সে নদীগর্ভে প্রাণ দিতেছে। এইরূপে অধিকাংশ পলাতক হিন্দু ও পাঠান প্রাণ বা স্বাধীনতা হারাইল।

পরদিবস প্রাতে রাজধানীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। চারিদিক্ হইতে জয়ের সংবাদ আসিতে লাগিল। কেহ বলিল, পাঠান ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়াছে; কেহ বা বলিল, বিদ্রোহিদলের নেতা দনার্দ্দন ধৃত হইয়াছে। দীনকৃষ্ণ রায় অচিরে চারি পাঁচ হাজার পাঠান বন্দীসহ নগরে প্রবেশ করিলেন। তখন লোকের আর উৎসাহ ধরে না। চারিদিকে রাণী ব্রজবালার জয় গীত হইতে লাগিল। কিছুকাল পরে গদাধর

দনার্দ্দনসহ নগরে প্রবেশ করিলেন। তদ্দৃষ্টে জনতা আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। দনার্দ্দনের হস্তপদ রজ্জুবদ্ধ। তাহার সহচরবৃন্দের অবস্থাও তদ্রূপ। সকলে নিম্নতুণ্ডে রাজসেনা পরিবৃত হইয়া নগরে প্রবেশ করিল। গদাধর তাঁহার বন্দীদের লইয়া প্রাসাদাভিমুখে চলিলেন।

প্রাসাদ-সান্নুদেশে এত জনতা যে, গদাধর প্রাসাদে প্রবেশ করিতে পথ পাইলেন না। আবার যখন নগরপাল পাঁচ ছয় হাজার বন্দী লইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন নগরের যাবতীয় লোক ভাঙ্গিয়া আসিয়া প্রাসাদ-তলে দাঁড়াইল। যখন সকল স্থান পূর্ণ হইয়া গেল, তখন যে পারিল, সে গাছে উঠিল। গাছেও যখন আর স্থান হইল না, তখন অনেকে নৌকা টানিয়া আনিয়া নদী'পরে দাঁড়াইল। এই বিপুল জনসঙ্ঘ আনন্দে অস্থির, ক্ষিপ্ত। তাঁহারা মুহুর্মুহুঃ ব্রজবালার জয়োচ্চারণ করিয়া আকাশতল প্রকম্পিত করিতে লাগিল।

ক্ষণপরে দেখা গেল, মানুষে দুইখানা শকট টানিয়া প্রাসাদাভিমুখে আসিতেছে। জনতা সরিয়া পথ দিল। শকটোপরি কি আছে, তাহা বুঝা গেল না; কেননা, তাহা বস্ত্রাচ্ছাদিত। শকটের আগে আগে করিম সা আসিতেছিলেন। তিনি প্রাসাদমূলে আসিয়া শকটের বস্ত্র টানিয়া দিলেন। তখন সকলে দেখিল, দুইটা কামান দুইখানা গাড়ীর উপর রহিয়াছে। এরূপ কামান বা গাড়ী উড়িষ্যায় দেখা যায় না। জনতা বুঝিল, কামান পাঠানের—হিন্দুর জয়লব্ধ ধন। তখন সেই বিপুল জনসঙ্ঘের উন্মত্ত চীৎকারে আকাশ মেদিনী কম্পিত হইল।

সেনানায়কেরাও পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। গদাধর জানিতেন না যে, দীনকৃষ্ণ দশ হাজার সেনা লইয়া বিশ হাজার পাঠানের সঙ্গে লড়াই করিতে গিয়াছিলেন। দীনকৃষ্ণও জানিতেন না যে, গদাধর, পনর হাজারের নায়ক দনার্দ্দনকে ধরিতে এক হাজার মাত্র সেনা

লইয়া গিয়াছিলেন। করিম সা, পাঠানকে আক্রমণ করিতে হইবে, এইটুকুই শুধু জানিতেন। নগরপাল নদীতটে লোকই শুধু ধরিতেছিলেন। জলে ভাসিয়া কোথা হইতে লোক আসিতেছিল, তাহা তিনি কিছুই বুঝিতেছিলেন না। তবে নদীপারে লড়াই চলিতেছিল, তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রাসাদমূলে সকলে সম্মিলিত হইয়া আত্মকার্য্যের পরিচয় দিতে লাগিলেন। রাণী ব্রজবালা যাহাকে যেটুকু না বলিলে নয়, সেটুকু ছাড়া আর কাহাকেও কিছু বলেন নাই। তিনি জানিতেন, মন্ত্রণা পাঁচ কাণ হইলে তাহা গোপন থাকে না। শুধু তাই নয়; রাণী যে মতলব আঁটিয়াছিলেন, তাহা যদি তিনি পাঁচজন সেনানায়কের সম্মুখে ব্যক্ত করিতেন, তাহা হইলে সকলেই তাঁহাকে উপহাস করিয়া উঠিত। এক্ষণে মন্ত্রগুপ্তির ফলে এই হইল যে, তাঁহার কার্য্যোদ্ধার হইল, আর উপহাসের পরিবর্ত্তে তিনি ভক্তি-শ্রদ্ধা লাভ করিলেন।

কিন্তু কি করিয়া যে এত বড় ঘটনাটা ঘটিল, তাহা সেনানায়কেরা কেহই বুঝিলেন না। কতলু খাঁ কেন শিবির ছাড়িয়া দূরে চলিয়া গিয়াছিল, দনার্দ্দন বা কেন কয়েক শত মাত্র সৈন্য লইয়া পলাইতেছিল, তাহা কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহারা স্থির করিলেন, ইহার ভিতর রাণীর কৌশল আছে।

রাণী তখন ভক্তিবিনম্রচিত্তে পশ্চিম-দক্ষিণাভিমুখী হইয়া উদ্দেশে জগন্নাথদেবকে প্রণাম করিতেছিলেন। যে ভক্তি ব্রজবালার হৃদয়ে কখন স্থান পায় নাই, আজ সেই ভক্তি, বন্যাপ্রবাহের ন্যায় আসিয়া জয়বিযুক্তা রাণীকে ভাসাইয়া দিল। তিনি রোমাঞ্চিত কলেবরে অশ্রুসিক্ত নয়নে মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া জগন্নাথদেবকে বারংবার উদ্দেশে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

এদিকে জনতা সহস্রমুখে 'রাণি-মা', 'রাণি-মা' শব্দে চীৎকার করিতেছে। সে চীৎকারে প্রাসাদ ফাটিয়া যাইতেছে, কিন্তু ব্রজবালার হৃদয়ে সে চীৎকার পঁহুছিতেছে না। তিনি তখন ধূল্যবলুণ্ঠিতা, আত্মবিস্মৃতা। এক অভিনব ভাব-প্রবাহে তাঁহার হৃদয় তখন তরঙ্গায়িত। তিনি আর যশের আকাঙ্ক্ষী নহেন; সমস্ত বাসনা সে সময়ে তাঁহার হৃদয় হইতে মুছিয়া গিয়াছে। তিনি আর রূপের কাঙ্গাল নহেন; এক অপূর্ব্ব রূপ জ্যোতিতে তাঁহার হৃদয় তখন আলোকিত। তাঁহার হৃদয় হইতে তেজ, গর্ব্ব, রাজ্যলিপ্সা অপসৃত হইয়াছে; তিনি তখন সিংহাসনারূঢ় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের পদতলে সাশ্রুনয়নে দীনচিত্তে উপবিষ্টা।

সহসা তিনি শিহরিয়া উঠিলেন,—তাঁহার সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিল। বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে ক্ষণকাল শূন্যপানে চাহিয়া রহিলেন। তিনি মানস-নয়নে দেখিলেন, বিপুল রক্তপ্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে, আর তাহাতে গতপ্রাণ অসংখ্য নরদেহ ভাসিয়া চলিয়াছে। প্রবাহ, নরদেহ বহিয়া আনিয়া সেই সিংহাসনারূঢ় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের পদতলে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্রজবালা দেখিলেন, সেই মহাপুরুষের গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইতেছে, আর সেই ধারা, রক্তপ্রবাহে সংমিশ্রিত হইয়া বিপুল অনলরাশির সৃষ্টি করিল। ব্রজবালা সভয়ে দেখিলেন, অনল অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কাল্পনিক দৃশ্য তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। তিনি ক্ষণপরে সুস্থির হইয়া নগরপালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

নগরপাল আসিলেন এবং নতজানু হইয়া অভিবাদন করিলেন। ব্রজবালা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুই পক্ষে কত সৈন্য হতাহত হয়েছে?"

নগরপাল। ত্রিশ হাজার হ'তে পারে।

রাণী স্তম্ভিত হইলেন। সেই রক্তপ্রবাহ তাঁহার মানসনয়ন-সম্মুখে

পুনরায় প্রকটিত হইল। তিনি উঠিলেন এবং শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানি পত্র লিখিতে বসিলেন। পত্রখানা রাজার বরাবর। লিখিলেন,—

"আপনার রাজ্য আপাততঃ নিষ্কণ্টক। আপনি সত্বর আসিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন।

"রাজ্য-পরিচালনা স্ত্রীলোকের কার্য্য নহে—পুরুষের। আমি একদিন ভুল বুঝিয়াছিলাম, তাই রাজ্যভার চাহিয়াছিলাম। এক্ষণে ভুল ভাঙ্গিয়াছে। লোক মারিতে হয় আপনি মারুন, আমাকে অব্যাহতি দান করুন।

"জগন্নাথদেবকে দর্শন করিবার মানস করিয়াছি; আপনি সত্বর আসিবেন।"

পত্র পাঠাইয়া দিয়া রাণী কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন। বাহিরে তখনও মহা কলরব হইতেছিল। নির্ম্মলা আসিয়া সংবাদ দিল, "সেনাপতি দর্শনপ্রার্থী হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন।" রাণী নিম্নতলে নামিয়া আসিলেন।

সেনাপতি দীনকৃষ্ণ ভক্তিবিগলিতচিত্তে রাণীকে প্রণাম করিলেন, বলিলেন, "মা, পুত্রের একটা আবেদন আছে।"

রাণী। কি?

দীনকৃষ্ণ। প্রজাদের একবার দেখা দিতে হবে। তাহারা অনেকেই আপনাকে দেখেনি। এখন একবার দেখ্‌বার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে।

রাণী। দেখা দিতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু যশের ভাগ নিতে আমার ঘোরতর আপত্তি আছে। যাঁহারা বুকের রক্ত ঢালিয়াছেন, তাঁহাদের নাম যশোবিমণ্ডিত হউক, আর যে সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্ অপ্রত্যাশিত ফল দান করিয়াছেন, তাঁহার নাম জয়যুক্ত হউক; আমি কে?

"মা—"

"পাটরাণীকে পাঠাচ্ছি—আমাকে ক্ষমা করুন।"

ব্রজবালার বিনীত অনুরোধে পাটরাণী ও প্রায় দুইশত রাজমহিষী প্রাসাদচূড়ায় উঠিলেন। * কিন্তু প্রজারা তাঁহাদের দেখিয়া পরিতুষ্ট হইল না। তাহারা বাঙ্গালী রাণীকে দেখিতে চায়। প্রজাদের আব্দার সকল দেশের সকল রাজাকে শুনিতে হইয়াছে। যিনি শুনেন নাই, তিনি প্রাণ বা সিংহাসন হারাইয়াছেন। ব্রজবালা উঠিলেন, কিন্তু নিতান্ত অনিচ্ছায় প্রাসাদচূড়ায় উঠিবার পূর্ব্বে তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, প্রজারা উড়িষ্যার রাণীকে দেখিতে চাহিয়াছে—ভিখারিণীকে দেখিতে চায় নাই। তখন তিনি বসন-ভূষণ আনাইয়া সজ্জিতা হইলেন। মাথায় মুকুট, কণ্ঠে মণিময় হার, কপালে সিন্দূরের বিন্দু পরিলেন; এবং রক্তোজ্জ্বল পট্টবস্ত্র পরিহিত হইয়া সেই বিপুল জনসঙ্ঘের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। মুহূর্ত্তে কোলাহল থামিয়া গেল। লক্ষ মানুষের নিশ্বাসের শব্দ, প্রবাহিণীর সলজ্জ অস্ফুট গান, বিহঙ্গমের মঙ্গল-গীতি সব থামিয়া গেল। রহিল শুধু নয়ন ও প্রাণ।

প্রজারা ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া রহিল। তাহারা মানুষ দেখিতে চাহিয়াছিল, রাণী দেখিতে চাহিয়াছিল,—এক্ষণে দেখিল দেবি-প্রতিমা। ক্ষণেকের জন্য আত্মবিস্মৃতি ঘটিল; মনে হইল, যেন আকাশ পৃথিবীর সংযোগস্থলে উষাদেবী সমুদিতা। ব্রজবালার আশে পাশে অনেক রমণী, অনেক মহিষী; কিন্তু লক্ষাধিক মানুষের নয়ন চাঁদের পানে—নক্ষত্রের পানে নয়।

তারপর স্মৃতি ফিরিয়া আসিল,—লক্ষাধিক কণ্ঠে সহসা জয়ধ্বনি উঠিল —আকাশ পৃথিবী প্লাবিত করিয়া জয়ধ্বনি উঠিল। যাহারা দূরে, অনেক দূরে ছিল, তাহারা রাণীর মুখাবয়ব দেখিতে পাইল না। তাহারা দেখিল

* উড়িষ্যায় বা বাঙ্গালায় তখনকার কালে অবরোধ-প্রথা ছিল না। গ্রন্থান্তরে তাহা আলোচিত হইয়াছে।

শুধু একখানি প্রতিমা—একটা ছটা, একটা জ্যোতিঃ। তাহারাই রাণীকে ভাল দেখিল।

গদাধর আজ ভূমিষ্ঠ হইয়া রাণীকে প্রণাম করিলেন। করিম সা মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া সেলাম করিলেন। দীনকৃষ্ণের গণ্ডবক্ষ বহিয়া আঁখি-ধারা গড়াইতে লাগিল।

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর দনার্দ্দন ও ভৃগুরামের বিচার হইল। নগরপাল বিচার করিয়া তাহাদের দোষী সাব্যস্ত করিলেন; এবং প্রাণদণ্ডের আদেশে দণ্ডিত করিলেন। রাণীর নিকট তাহারা কৃপা ভিক্ষা করিল। রাণী প্রাণদণ্ডের আদেশ রহিত করিয়া তাহাদের দুর্গের ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

তারপর রাণী মন্ত্রণাগারে বসিয়া প্রচার করিলেন, তিনি সত্বর জগন্নাথ-দেব-দর্শনে যাত্রা করিবেন। দীনকৃষ্ণ আপত্তি তুলিলেন। রাণী বলিলেন, "রাজা বা রাজকুমার আসিয়া রাজ্যভার গ্রহণ না করিলে তিনি যাইবেন না। অগত্যা দীনকৃষ্ণকে নিরুত্তর হইতে হইল।

দুই দিন পরে রাজার নিকট হইতে দূত পত্র লইয়া আসিল। রাণী পত্র পাঠ করিলেন। তাহাতে লেখা ছিল,—"আমার ব্রজসুন্দরী—

"শুনিলাম, তুমি উড়িষ্যা রক্ষা করিয়াছ—দনার্দ্দনকে বন্দী করিয়াছ—শত্রুর পঞ্চাশ হাজার সৈন্য মুহূর্ত্তে ধ্বংস করিয়াছ।

"তুমি উড়িষ্যার শক্তি—উড়িষ্যার লক্ষ্মী। তোমাকে দিবার কিছু নাই

—তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিবার অনেক আছে। তোমার দাসানুদাস মুকুন্দদেবের ভিক্ষা, তুমি চিরদিন উড়িষ্যায় অবস্থান কর।

"তুমি এখন শুধু আমার জীবনসঙ্গিনী, আমার হৃদয়েশ্বরী নও, তুমি এখন আমার শক্তি—আমার লক্ষ্মী—আমার উপাস্যদেবী।

"আমি ফিরিলাম—তোমাকে দেখিতে ফিরিলাম। কিন্তু শুনিতেছি বিদ্রোহীরা আবার দল বাঁধিতেছে। দনার্দ্দনের পুত্র হরিকীর্ত্তন এক্ষণে তাহাদের নেতা।

তোমার মুকুন্দদেব।"

ক্ষণপরে যুবরাজের নিকট হইতে দূত আসিয়া সংবাদ দিল, "যুবরাজ, কালাপাহাড়ের হস্তে পরাস্ত হইয়া ছিন্নভিন্ন সৈন্যসহ রাজধানী-অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন।"

এত বড় গুরুতর সংবাদ শুনিয়াও রাণীর বদনে চিন্তার কোনও লক্ষণ প্রকটিত হইল না। তিনি শুধু আকাশের দিকে চাহিলেন। তথায় কি দেখিলেন জানি না, কিন্তু তাঁহারা প্রশান্ত বদন দেখিয়া দাসীরা ভাবিল, উড়িষ্যার কোনও অমঙ্গল আশঙ্কা নাই। অচিরে সে সংবাদ প্রাসাদময় প্রচার হইল; এবং স্বল্পকালমধ্যে নগরের ভিতরে অতিরঞ্জিত অবস্থায় ছড়াইয়া পড়িল। তখন সকলে নিশ্চিন্ত হইল।

পরদিবস যুবরাজ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রায় সত্তর হাজার সৈন্য ছিল; কিন্তু এক্ষণে ত্রিশ হাজার মাত্র অবশিষ্ট আছে। রাণী তদ্দৃষ্টে তৎক্ষণাৎ নূতন সৈন্যদল গঠনের আদেশ প্রচার করিলেন। দীনকৃষ্ণ ও নগরপাল অর্থ চাহিলেন। একবৎসর কাল যুদ্ধের ব্যয় বহন করিয়া কোষাগার প্রায় শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। রাণী তখন নিজের সমস্ত অলঙ্কার বাহির করিয়া দিলেন। অঙ্গে যাহা ছিল, তাহাও দিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত অন্য কোনও পুরমহিলা অনুসরণ করিলেন না; কিন্তু নগরের

গৃহস্থ-কন্যারা করিলেন। তাঁহারা রাণী ব্রজবালার হিংসা করেন না—তাঁহাকে ভক্তি করেন।

যুবরাজ আসিয়াই সকল কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটাইলেন। রাণীর মন্ত্রণাগার বন্ধ করিয়া রাজার মন্ত্রণাগারে নিজের আসন পাতিলেন; এবং সিংহাসনে উপবেশন করিয়া স্বেচ্ছামত আদেশ প্রচার করিতে লাগিলেন। —যেন রাণীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়াই এরূপ করিতে লাগিলেন। রাণী সব বুঝিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে যুবরাজকে দূরীভূত করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি পুরুষোত্তম যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

যুবরাজ, রাণীর আদেশ প্রত্যাহার করিয়া দনার্দ্দন ও ভৃগুরামকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। দীনকৃষ্ণ ও নগরপাল গোপনে পরামর্শ স্থির করিলেন, "মা যাহাদের অব্যাহতি দিয়াছেন, আমরা তাহাদের মরিতে দিব না।" তাঁহারা বন্দিদ্বয়ের পলায়নের সুবিধা করিয়া দিলেন। তাহারা পলায়নপূর্ব্বক বিদ্রোহিদলে যোগদান করিল।

অচিরে রাজার নিকট হইতে সংবাদ আসিল যে, বিদ্রোহীর সংখ্যা এত বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, তাহাদের পিছনে রাখিয়া রাজা রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। তিনি আরও কিছু সৈন্য চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। যুবরাজ সাহায্য না পাঠাইয়া পত্রোত্তরে জানাইলেন যে, "এখানে সৈন্য অল্পই আছে।"

রাণী সেই দিবস সন্ধ্যার পর অতি গোপনে পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন। সঙ্গে নির্ম্মলা ও শান্ত ছিল। নগরবাসীরা কেহ জানিল না যে, তাহাদের ভাগ্যলক্ষ্মী প্রস্থান করিতেছেন।

কিন্তু নটবর সংবাদ পাইল। সে নগর-বাহিরে গিয়া রাণীকে ধরিল। তিনি শিবিকায় ছিলেন। নটবর জিজ্ঞাসা করিল, "মা ফিরিবে ত ?"

রাণী। মহাপ্রভুর ইচ্ছা।

নট। তোমার কি ইচ্ছা মা ?

রাণী। মানুষের ইচ্ছায় কি হয় বাবা ?

নট। বুঝেছি ; যুবরাজ আসিয়া অনর্থ ঘটাইয়াছে। বেশ আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

রাণী। ছেলেদের ফেলে ?

নট। না, নিয়ে। এখানে থেকে আর কি করব মা ? বারোঘাটী ত শীঘ্রই শত্রুর করায়ত্ত হবে।

নটবর ফিরিল ; এবং পরদিবস সস্ত্রীক পুরুসোত্তম অভিমুখে যাত্রা করিল। যাইবার আগে দীনকৃষ্ণকে বলিয়া গেল, "আপনাদের লক্ষ্মী ছেড়েছেন, সময় থাক্‌তে আপনারাও পালান।"

দীনকৃষ্ণ স্তম্ভিত হইলেন ; বুঝিলেন, রাণী আর ফিরিতেছেন না, সুতরাং উড়িষ্যার আর রক্ষা নাই।

দীনকৃষ্ণের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইল। পাঁচদিনের মধ্যে সংবাদ আসিল, রাজা মুকুন্দদেব বিদ্রোহিহস্তে নিহত হইয়াছেন। তা'র কয়েক দিন পরে কালাপাহাড় সদলবলে আসিয়া রাজধানী ও দুর্গ বেষ্টন করিলেন। প্রজারা আকুল প্রাণে সাশ্রুনয়নে ডাকিতে লাগিল, "কোথায় তুমি মা ? আমরা যে বিপদে পড়েছি, তুমি কি তা' দেখ্‌তে পাচ্ছ না ?"

---

# নবম পরিচ্ছেদ

মা তখন পুরুষোত্তমে। সমুদ্র-সৈকতে যে কুটীরে ব্রজবালা একদিন অবস্থান করিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই কুটীরে আশ্রয় লইলেন। শান্তকে বিদায় দিলেন, নির্ম্মলাকেও দিতেছিলেন, কিন্তু সে গেল না; বলিল, জগতে আমার আর স্থান নাই। ব্রজবালারই কি আছে? তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, আছে বই কি! শান্তিময় সমুদ্র-সৈকতে অনন্তের পদতলে স্থান আছে বই কি!

রাজা মুকুন্দদেবের মৃত্যুসংবাদ নির্ম্মলা ও ব্রজবালা পাইলেন। নির্ম্মলার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; কেননা, তাহাদের আশ্রয়স্থল ধ্বংস হইল।

রাজার শোক ব্রজবালার হৃদয়ে বড়ই লাগিল; তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন। এ কাতরতা নিজের জন্য নয়—রাজার জন্য, রাজ্যের জন্য। তিনি মানসনয়নে দেখিলেন, উড়িষ্যা পাঠান-চরণে দলিত হইতেছে—পুরুষোত্তমেরও বুঝি নিস্তার নাই।

ব্রজবালা কিছুতেই মুকুন্দদেবকে ভুলিতে পারিল না। যাঁহার নিকট হইতে প্রেম-শিক্ষা লাভ হয়, তাঁহাকে ভোলাও বড় সহজ নহে। সমুদ্র-তীরে যেখানে বসিয়া একদিন ব্রজবালা রাজার সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন, সেইখানে বসিয়া তিনি দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। সম্মুখে সেই সমুদ্র, পিছনে সেই কুটীর, মাথার উপর সেই আকাশ। কিন্তু ব্রজবালা আর সেই নাই। প্রবাহিণী আছে, কিন্তু

তা'র জল সরিয়া গিয়াছে; নূতন জল, নূতন তরঙ্গ আসিয়া প্রবাহিনী-বক্ষ হিল্লোলিত করিতেছে।

একদা অপরাহ্নে ব্রজবালা কুটীর-সম্মুখে বালুকার উপর উপবিষ্ট থাকিয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গের নর্ত্তন দেখিতেছিলেন। নির্ম্মলা কাছে বসিয়া রাজপ্রাসাদের রাজভোগের কথা ভাবিতেছিল। বোধ হয় তৎকালে তাহার ক্ষুধা পাইয়া থাকিবে। ব্রজবালা এক্ষণে একাহারী, নির্ম্মলাকেও বাধ্য হইয়া একাহারী হইতে হইয়াছে; নির্ম্মলা ভাবিতেছিল, কি করিলে আবার তেমনটি হয়। ব্রজবালা ভাবিতেছিলেন, কি করিলে "তেমনটির" স্মৃতি মুছিয়া যায়।

ক্ষণকাল নিস্তব্ধতার পর নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর?"

"কিসের পর?"

"এইখানে এই অবস্থায় কি চিরদিন কাটাতে হবে?"

"জগন্নাথদেবের ইচ্ছা।"

"তোমার ইচ্ছা কি?"

"মানুষের ইচ্ছায় আবার কি হয়?"

"কি-ই বা না হয়? তুমি যা' করেছ—"

ব্রজবালা শিহরিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "ছি, ছি! আমি কে?"

সেটা কিন্তু ব্রজবালার মুখের কথা। তাঁহার আমিত্ব—স্বাতন্ত্র্য তখনও ডুবে নাই। ডুবাইবার চেষ্টায় মুখে শতবার বলেন, "আমি কে?" ডুবাইতে পারিলে অনুতাপ থাকে না—বোঝার ভার থাকে না। সংসারের কয়টা লোক জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে পাপ-পুণ্যের ভার ভগবৎ-চরণে কায়মনোবাক্যে সমর্পণ করিয়া বলিতে পারে, "তুমি হৃষীকেশ, আমার হৃদয়ে অবস্থান করিয়া যাহা করাইতেছ তাহাই আমি করিতেছি?" যে পারে সে ত নিশ্চিন্ত। এই নিশ্চিন্ততাই ব্রজবালা খুঁজিতেছিলেন।

নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল, "মনে পড়ে কি রাণী, এইখানে একদিন বালুকার মধ্যে তুমি একটা জীবন্ত মৎস্য প্রোথিত করেছিলে? বালি সরিয়ে দেখ না, তা'র কাঁটা হয়ত আজও দেখ্‌তে পাবে।"

ব্রজবালা শিহরিয়া উঠিয়া দূরে সরিয়া গেলেন; গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, "নির্ম্মলা, অতীতের কোনও কথা আমার সাক্ষাতে তুলিও না।"

"ভবিষ্যত্রের কথা?"

"বলেছি ত ভবিষ্যৎ তাঁর হাতে।"

"বেশ; অতীতের কথা তুল্‌ব না, ভবিষ্যতের কথা বলব না। তবে কোন্ কথা আলোচনা করব?"

ব্রজবালা উত্তর করিলেন, "বর্ত্তমান।"

নির্ম্মলা। বর্ত্তমান কতটুকু!

ব্র। টুকু নয়—অনন্ত।

নি। অনন্ত?

ব্র। হাঁ, বর্ত্তমানই যে তুমি।

নি। আর অতীত?

ব্র। সসীম।

নি। বুঝলাম না।

ব্র। স্মৃতিটুকুর বাইরে আর অতীত নেই।

নি। ভবিষ্যৎ?

ব্র। ভগবান্ স্বয়ং।

নির্ম্মলা হাসিয়া উঠিল; বলিল, "তোমার কাছে নূতন কথা শুনিলাম; এত কথা তোমায় শিখাইল কে?"

ব্রজবালা উত্তর করিলেন, "কেহ কাহাকে কিছু শিখায় না নির্ম্মলা! —শিখায় মন—শিখায় ঘটনা।"

পিছন হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "ঠিক বলেছ মা! আমি এই দুই মাসে যা' শিখেছি, তা' হাজার পণ্ডিতে এক কল্প ধরে শিখালেও আমি শিখ্‌তে পার্‌তুম না।"

ব্রজবালা ফিরিয়া দেখিলেন; দেখিলেন, অদূরে ললাটী তাহার শিশুপুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তা'র পিছনে—একটু দূরে—নটবর তাহার অষ্টমবর্ষীয় কন্যার হাত ধরিয়া দণ্ডায়মান। অমনই রাণীর হৃদয়ে একটা আনন্দ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল। তিনি সহাস্যে কহিলেন, "একি ললাটী, নটবর তোমরা এখানে?"

"মা যেখানে ছেলে-মেয়েরাও সেখানে।"

প্রবাহটা তখন হৃদয় হইতে নয়নে আসিল। রাণী অশ্রুভারাকুল নয়নে ললাটীর ক্রোড় হইতে তাহার শিশুপুত্রটিকে লইলেন এবং বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন। রাণীর সমস্ত দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

নটবরের কন্যাটি ধীরে ধীরে আসিয়া রাণীর চরণে প্রণতা হইল। রাণী তাহার হাত ধরিয়া বুকে উঠাইয়া লইলেন। রাণীর দুই ক্রোড়ে দুই শিশু—নয়নে বারিধারা। যেন অনন্তের উপকূলে সনাতন ধর্ম্ম দণ্ডায়মান—ক্রোড়ে শান্তি, ভক্তি—নয়নে মুক্তি।

নটবর ও ললাটী রাণীকে প্রণাম করিল—ধূলায় লুটাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। তাহাদের নয়নে রুদ্ধ বারিধারা, হৃদয়ে অস্ফুট ভাষা। ক্ষণকাল নিস্তব্ধতার পর ললাটী কহিল, "জগন্মাতা কি আমাদের এমনি করে কোলে নিবেন না?"

সহসা কোমল, অথচ উচ্চকণ্ঠে মন্ত্রিত হইল, "নিয়ে ত রয়েছেন।"

কে এ কথা বলিল? সকলে বিস্মিত হইয়া চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিলেন। নিকটে কাহাকেও দেখা গেল না। ব্রজবালার মনে হইল,

দূরে যেন এক সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে মিশিয়া যাইতেছে।

ব্রজবালা বিস্মিত হইলেন, একটু অন্যমনস্কও হইলেন। মেয়েটি ক্রোড় হইতে নামিয়া পড়িল। ছেলেটি দেখিল, সে আর আদর পায় না; তখন সে-ও মায়ের কাছে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল। ব্রজবালা তখন সুপ্তোত্থিতার ন্যায় চমকিতা হইয়া শিশু দুইটীকে পুনরায় ক্রোড়ে লইলেন; এবং কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজের জন্য যে অন্নব্যঞ্জন ছিল, তাহা শিশু দুইটীকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। নির্ম্মলা সবিস্ময়ে দেখিল, ব্রজবালা ব্রাহ্মণ-কন্যা হইয়া অস্পৃশ্য জাতির স্পৃষ্ট অন্ন স্পর্শ করিতেছেন। নির্ম্মলার মনে একটা ঘৃণা জন্মিল; সে ভাবিল, একটা সুবিধামত স্থান জুটিলে সে এ ম্লেচ্ছ-সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে।"

ছেলেদের খাওয়াইয়া ধোয়াইয়া ব্রজবালা বাহিরে আসিলেন। সন্তানদ্বয় তৃপ্ত হইয়াছে দেখিয়া মাতাপিতা নিজেদের ক্ষুধাতৃষ্ণা বিস্মৃত হইল।

নটবর প্রণাম করিয়া বিদায় চাহিল। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে থাকিবার স্থান আছে?"

"তোমার ছেলের আবার স্থানাভাব? যদি হুকুম কর, রাজবাড়ী এখানে উঠিয়ে আন্‌তে পারি।"

রাণী একটু হাসিলেন।

সেই দিন গভীর রাত্রে রাণী অর্দ্ধজাগ্রত অর্দ্ধ সুপ্তাবস্থায় শুনিলেন, কে যেন সমুদ্র-সৈকতে বসিয়া গাহিতেছে—

প্রভু হৃদয়-মন্দিরে জাগো,<br>
পিতৃরূপে মাতৃরূপে পুত্ররূপে কন্যারূপে হৃদয়েতে জাগো,<br>
প্রভু, হৃদয়-মন্দিরে জাগো।

সখারূপে ভার্য্যারূপে, ভ্রাতারূপে ভগ্নীরূপে হৃদয়েতে জাগো,
প্রভু, হৃদয়-মন্দিরে জাগো,
সখা, মানস-মন্দিরে জাগো।
শ্রদ্ধা ভক্তি, স্নেহ মায়া, সখ্য প্রেম প্রীতি দয়া স্বরূপে জাগো,
মানস-মন্দিরে জাগো,
নিদ্রা জাগরণে জাগো,
জীবনে মরণে জাগো,
সকল সময়ে জাগো,
প্রিয়, মানস-মন্দিরে জাগো।
শক্তিরূপে শান্তিরূপে, জ্ঞানরূপে বুদ্ধিরূপে,
আমার হৃদয়ে জাগো,
নাথ, অহরহ জাগো,
ভিতরে বাহিরে জাগো,
আমার সুখ দুঃখে জাগো,
প্রভু মানস-মন্দিরে জাগো॥

---

# দশম পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া রাণী বলিলেন, "নির্ম্মলা, আজ দেবদর্শনে যাব।"

নির্ম্মলা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতকাল কি হয়েছিল?"

ব্রজ। এতকাল অধিকার পাইনি।

নির্ম্ম। সহসা আজ অধিকার জন্মিল কিরূপে?

ব্রজ। শিশু-স্পর্শে।

নির্ম্ম। সে কি রকম?

ব্রজ। আমি পূর্ব্বে কখন শিশু ক্রোড়ে করিনি। শিশু আমার নিকট ঘৃণাস্পদ ছিল। আজ আমি শিশু ক্রোড়ে করে পবিত্র হয়েছি।

নির্ম্ম। কথাটা বুঝলাম না।

ব্রজ। আজ আমার মাতৃপ্রাণ জাগরিত হয়েছে।

নির্ম্ম। বাহবা! তোমায় আমি জিজ্ঞাসা করলুম ভৈরব মানে কি, তুমি বল্লে কালভৈরব।

ব্রজ। তোমার যে আজও বুঝ্‌বার ক্ষমতা হয়নি, নির্ম্মলা!

নির্ম্ম। হ'য়েও কাজ নেই। কিনা ছুটো ধূলোমাখা, প্যাঁটাপড়া কুৎসিত ছেলে কোলে করলুম, আর আমি পবিত্র হ'য়ে গেলুম। আমি এমন পবিত্রতা চাইনে।

ব্রজ। বেশ, তবে তুমি কুটীরে থাক, আমি মন্দিরে যাই।

নির্ম্ম। একা যাবে নাকি?

ব্রজ। না, ললাটী এখনি আস্‌বে।

নির্ম্ম। সে আসে আসুক, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

তখন উভয়ে স্নানার্থে সমুদ্রে নামিলেন। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ছুটিয়া আসিয়া অঙ্গের মলা ধুইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মনের মলা ধুইয়া দিবার শক্তি বুঝি জড়ের নাই। ব্রজবালা সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "বারিধি, তুমি কত বড়, আমি কত ক্ষুদ্র। কিন্তু তুমি সীমাবদ্ধ—আমার সীমা নাই। তুমি সসীম—আমি অনন্ত। তুমি বিশাল হৃদয় লইয়াও চপল—সামান্য ঝটিকাঘাতে অস্থির, বিকম্পিত। আমি ক্ষুদ্র হইয়াও গম্ভীর—সহস্র প্রবৃত্তি-তাড়নেও অবিকম্পিত। বৃথাই তোমার শক্তির গর্ব্ব। তোমার শক্তি পাশবিক, ধ্বংসকারী—"

এমন সময় নির্ম্মলা চীৎকার করিয়া উঠিল। একটা তরঙ্গ আসিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় নির্ম্মলাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। ব্রজ-বালা তাহাকে ধরিলেন। নির্ম্মলা উঠিয়া সমুদ্রকে গালি পাড়িতে লাগিল। গালি শেষ হইবার পূর্ব্বেই আবার একটা তরঙ্গ আসিয়া স্খলিতপদ নির্ম্মলাকে ফেলিয়া দিল; এবং অতি নিষ্ঠুরভাবে অন্তরশুষ্ক বালুকার উপর টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ব্রজবালা কহিয়া উঠিলেন, "দয়া-মায়াবিবর্জ্জিত বারিধি, তাই তুমি এত ছোট!"

দুইজনে সমুদ্রকে গালি দিতে দিতে স্নান সমাপন করিলেন; এবং ললাটীকে সঙ্গে লইয়া অচিরে মন্দির-দ্বারে সমুপস্থিত হইলেন। কেহ কেহ রাণীকে সম্বর্দ্ধনা করিল; আবার কেহ কেহ ব্রজবালার রূপরাশি সন্দর্শন করিয়া আত্মপরিতৃপ্তি লাভ করিল। রাণী বা ব্রজবালা কোনও দিকে না চাহিয়া শ্রীমন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। মন্দিরাভ্যন্তরে অস্পষ্টালোক। রাণী প্রবেশ-পথে ক্ষীণালোকে দেখিলেন, এক দীর্ঘকায়, তেজঃপুঞ্জ, জটাবিমণ্ডিত সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহাকে

দেখিবামাত্র ব্রজবালার মন ভক্তিতে আপ্লুত হইল। বুঝিলেন, এই সন্ন্যাসীই পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে দূর হইতে দর্শন দিয়াছিলেন। ব্রজবালা, সন্ন্যাসীকে প্রণাম না করিয়া অগ্রসর হইলেন। সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমি তোমার অপেক্ষায় এখানে দাঁড়িয়ে আছি মা।"

"অপেক্ষা করুন, আগে ঠাকুর দেখিয়া আসি।"

ব্রজবালা এক পদ অগ্রসর হইলেন। সন্ন্যাসী বাধা দিয়া বলিলেন, "সেখানে গিয়ে কি কর্‌বে মা? ঠাকুর যে বিকলাঙ্গ।"

ব্রজ। তা'তে কি?

সন্ন্যা। যদি বাসনা কামনা ছেড়ে যেতে পার তবে যাও; নতুবা যেও না।

ব্রজ। আমার যা আছে, তাই নিয়ে ঠাকুরের কাছে যাব।

সন্ন্যা। তোমার কি আছে মা?

ব্রজ। কিছুই নাই।

সন্ন্যা। পুণ্য?

ব্রজ। না।

সন্ন্যা। ভক্তি?

ব্রজ। না।

সন্ন্যা। পাপ?

ব্রজ। না।

সন্ন্যা। তবে যাও মা, প্রেমময়ের চরণ দর্শনে তোমার অধিকার জন্মেছে।

অপরাহ্নে কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া ব্রজবালা দেখিলেন, নটবর তাঁহার অপেক্ষা করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ নটবর?"

নটবর উত্তর করিল, "সংবাদ আর কি দেব, মা?—মুসলমান বরোবাটী অধিকার করেছে।"

রাণী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীক্ষেত্র কি তাহাদের লক্ষ্যস্থল? ভুবনেশ্বরের দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে কি?"

নটবর। তা' ঠিক জানি না।

রাণী। যুবরাজ রামচন্দ্র কোথায়?

নট। নিহত।

রাণী। দনার্দ্দিন ও ভৃগুরাম?

নট। কালাপাহাড়ের পদতলে।

রাণী। দীনকৃষ্ণ?

নট। নিহত।

রাণী। আর গদাধর?

নট। ভুবনেশ্বরে।

রাণী। সেখানে কি করছেন?

নট। সৈন্য-সংগ্রহ। পাহাড়ীরা দলে দলে তাহাদের তীর্থক্ষেত্র রক্ষা করতে আসছে।

রাণী। আর খাণ্ডাইতরা?

নট। তারা আসছে না। সকলেই নেতা হতে চায়—নেতৃত্ব স্বীকার করতে কেহ চায় না।

রাণী। অধঃপতনের মূলই গর্ব্ব।

নট। তুমি একবার চল না, মা!

রাণী। আমি? আর না।

নট। উড়িষ্যা যে তোমার মুখ চেয়ে আছে, মা!

রাণী। আমি কে? এই সমুদ্রের বিম্ব মাত্র,—জগৎপিতার ইচ্ছায় সৃষ্ট হই, আবার তাঁরই ইচ্ছায় বিলীন হই।

# একাদশ পরিচ্ছেদ

কালাপাহাড় কটক-বারাণসী অধিকার করিয়া কতলু খাঁকে বিজিত প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিলেন; এবং স্বয়ং দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। চৌদ্বার, বারোবাটী তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত। দনার্দ্দন, ভৃগুরাম তাঁহার পদলেহনে ব্যাপৃত। দনার্দ্দন সিংহাসন চাহিয়াছিল, কালাপাহাড় তাহাকে অপমান সহকারে বিদায় করিয়াছিলেন।

কটকে হিন্দুর বলিতে আর কিছু রহিল না। মন্দির, বিগ্রহ সব ধ্বংস হইল। যাহা অধ্বংসনীয় তাহাই রহিল।

কটকে বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে হিন্দু রহিল না। যাহারা রহিল, তাহাদের বলপূর্ব্বক মুসলমান করা হইল। রাজভাণ্ডার লুণ্ঠিত হইল। পাঠান সেনানায়কেরা রাজমহিষীবৃন্দ বণ্টন করিয়া লইলেন। বাঙ্গালী-মহিষীকে অনেক অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

এদিকে দনার্দ্দন বিতাড়িত হইয়া ক্রোধে গর্জ্জিতে লাগিল; কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। তাহার কেমন একটা আত্মগ্লানি জন্মিয়াছিল; সেই আত্মগ্লানির সঙ্গে বিফল ক্রোধ সংমিশ্রিত হইয়া দনার্দ্দনকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। দনার্দ্দন, গদাধরের সঙ্গে যোগ না দিয়া নিজে সৈন্যদল গঠিত করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার কৌশল বা কৃতিত্ব ছিল না। একদিন কতলু খাঁ আচম্বিতে তাহাকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত ও নিহত করিলেন। ভৃগুরাম ভুবনেশ্বরের দিকে পলাইল।

ভুবনেশ্বরে গদাধর ও করিম সা সসৈন্যে অবস্থান করিতেছিলেন। ভৃগুরাম আসিয়া আশ্রয় যাজ্ঞা করিল, গদাধর তাহাকে সৈন্যদলভুক্ত করিয়া লইলেন। কিন্তু সে তথায় অবস্থান করিল না। ব্রজবালাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল; যখন তাঁহাকে পাইল না, তখন ভুবনেশ্বর ত্যাগ করিয়া চলিল।

অনুতপ্ত বিদ্রোহীর দল স্বদেশ রক্ষার্থ গদাধরের পতাকা নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইল। হরিকীর্ত্তন আসিলেন। গদাধর তাঁহাকে নেতৃত্ব প্রদান করিলেন। তিনি একজন সদ্বংশজাত উৎকলবাসী অন্বেষণ করিতেছিলেন। বাঙ্গালীর নেতৃত্ব স্বীকার করিতে সকলে সম্মত নহে। খাণ্ডাইত হরিকীর্ত্তন বয়সে নবীন হইলেও বংশ ও পদমর্য্যাদায় মহা-সম্মানিত। গদাধর তাঁহাকে সেনাদলের মাথায় বসাইয়া নিজে মাথা হইয়া বসিলেন।

ভুবনেশ্বরে বেশ একটা বড় দল সজ্জিত হইল। লোকের অভাব হইল না, কিন্তু অস্ত্রের অভাব হইল। অস্ত্রের অভাবে গদাধর ধানুকী দলের সৃষ্টি করিলেন; এবং পার্ব্বত্যপথে স্থানে স্থানে প্রস্তর স্তূপীকৃত করিলেন। দুইটা কামান ছিল, তাহা দুর্গপ্রাকারে স্থাপন করিলেন। আট দশ হাজার বন্দুক ছিল; তরবারি ও ভল্ল যথেষ্ট ছিল। গদাধর দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া সেই সব অস্ত্রে নূতন সৈন্যদলকে সজ্জিত করিলেন।

গদাধর তাঁহার ধানুকী সৈন্যসহ পার্ব্বত্য-পথ রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। করিম সা অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া নগর হইতে কিছু দূরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। হরিকীর্ত্তন দুর্গ ও নগর রক্ষার ভার লইলেন।

কালাপাহাড় সসৈন্যে ভুবনেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইলেন। পার্ব্বত্য-

পথ ছাড়া আর একটা পথ ছিল। সে পথে আসিতে হইলে দুইটা নদী পার হইতে হয়। নদীর উপর সেতু ছিল; গদাধর দুইটা নদীরই সেতু ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। কালাপাহাড় তথাপি পার্ব্বত্যপথ অবলম্বন না করিয়া উন্মুক্ত নদীর পথ ধরিলেন। গদাধর তখন পাহাড় ছাড়িয়া নদীর ধারে আসিয়া বসিলেন।

কালাপাহাড় চন্দ্রভাগা-উপকূলে আসিয়া দুই দিবসের মধ্যে সেতু প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। সন্নিকটে বড় বড় গাছ থাকিলে সেতু বাঁধিতে বিলম্ব হয় না। গদাধর বাধা দিয়া রাখিতে পারিলেন না; কালাপাহাড় চন্দ্রভাগা পার হইয়া বরুণার তীরে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। বরুণা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। সেখানে পুনরায় বাধা দিবার উদ্যোগ চলিতে লাগিল; কিন্তু তেমন সুবিধা হইল না। কালাপাহাড় উন্মুক্ত স্থান পছন্দ করিয়াছিলেন; তথায় বন্দুকের সম্মুখে ধানুকী দাঁড়াইতে পারিল না। সঙ্গে কামান থাকিলে ভাল হইত; কিন্তু হরিকীর্ত্তন কামান আনিতে দেন নাই।

কিন্তু গদাধর সহজে পশ্চাৎপদ হইলেন না। যে দিন সায়াহ্নে সেতু নির্ম্মিত হইয়া গেল, সেই দিন গভীর নিশীথে গদাধর সেতুর অদূরে বালুকার উপর গভীর খাদ নিঃশব্দে খোদিত করিলেন। এবং সেই খাদের ভিতর বাছা বাছা দুই শত ধানুকী-সৈন্য রক্ষা করিলেন। খাদের গভীরতা প্রায় তিন হাত পরিমাণ।

পরদিন প্রভাতে যখন পাঠান-সৈন্য আসিয়া সেতুর উপর দাঁড়াইল, তখন খাদের ভিতর হইতে দুইশত শর নিক্ষিপ্ত হইল। একশত পাঠান অচিরে ধরাশায়ী হইল। তাহাদের স্থান লইতে আবার একশত পাঠান ছুটিয়া আসিল। তাহারাও ভূশয্যা গ্রহণ করিল। আবার পাঠান আসিল, তাহারাও মরিল। তখন কালাপাহাড়ের কাছে সংবাদ গেল।

তিনি তখন শিবিরমধ্যে বসিয়া হরিকীর্ত্তনের একখানি পত্র পাঠ করিতেছিলেন। পত্রে লেখা ছিল,—"আসুন আপনাতে আমাতে উড়িষ্যা বণ্টন করিয়া লই। আপনি আমাকে দক্ষিণ উড়িষ্যার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করুন; আপনি উড়িষ্যার সকল দ্বার উন্মুক্ত পাইবেন।"

পত্র পাঠ করিয়া কালাপাহাড় পত্র-বাহককে ডাকিলেন। সে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া দুর্দ্দান্ত পাঠান-সেনাপতির সম্মুখে দাঁড়াইল। কালাপাহাড় তাহার আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে কে পাঠিয়েছে?"

"খাণ্ডাইত হরিকীর্ত্তন।"

"তিনি কোথায়?"

"পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইয়া ভুবনেশ্বরে অপেক্ষা করিতেছেন।"

"তাঁহাকে বলগে আমি অচিরে তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইব।"

দূত বিদায় হইল। তখন কালাপাহাড় শুনিলেন, পাঠান-সৈন্য কোনমতে সেতু পার হইতে পারিতেছে না। কালাপাহাড় জ্বলিয়া উঠিলেন এবং ঝটিতি শিবির ত্যাগ করিয়া অশ্বারোহণ করিলেন। সেতুমুখে আসিয়া দেখিলেন, গভীর খাদমধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া হিন্দু সৈন্য শরক্ষেপে অগ্রবর্ত্তী পাঠান-সৈন্য বিনাশ করিতেছে। কালাপাহাড় মুহূর্ত্তমধ্যে সম্যক্ অবস্থা উপলব্ধি করিয়া তদনুরূপ ব্যবস্থা করিলেন। পাঁচ শত পাঠান বন্দুক লইয়া নদীর ধারে দাঁড়াইল; দুই শত বক্ষে হাঁটিয়া সেতু পার হইতে লাগিল। এই দুই শতকে মারিতে হিন্দু-সৈন্য যখন ধনুক উঠাইল, তখন খাদের ভিতর তাহাদের সোজা হইয়া দাঁড়াইতে হইল। ফল এই হইল যে, তাহাদের মুণ্ড অপর তীরস্থ পঞ্চশত বন্দুকধারী পাঠানের লক্ষ্যস্থল হইল। ধনুতে শর যোজিত হইবার পূর্ব্বেই ধানুকী সৈন্যের অধিকাংশ, গুলিতে আহত হইয়া গহ্বরমধ্যে লুটাইয়া পড়িল।

তখন গদাধর অনন্যোপায় হইয়া খাদ ত্যাগ করিলেন; এবং অসি-হস্তে সেতুমুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সঙ্গে চল্লিশ পঞ্চাশ জন ধানুকী-সৈন্য ছিল; তাহারা স্বল্পকালমধ্যে গতপ্রাণ হইল। কিন্তু গদাধর অক্ষতদেহে উলঙ্গ কৃপাণ ঘুরাইয়া একাকী অগণিত পাঠানের পথ রোধ করিয়া সেতুমুখে দাঁড়াইলেন। পাঁচ সাত জন পাঠান তরবারি আঘাতে জীবন ত্যাগ করিল। কালাপাহাড় দূর হইতে তাহা দেখিলেন; এবং অশ্ব ত্যাগ করিয়া পদব্রজে অগ্রসর হইলেন। তিনি একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া অঙ্গুলি হেলনে পাঠান-সৈন্যকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিলেন। পাঠান নীরব নিস্পন্দ হইয়া অপর পারে দাঁড়াইল। কিন্তু একজন কোনও নিষেধ শুনিল না; সে বুনা। তাহার গতি সর্ব্বত্র অবারিত। বুনা আসিয়া কালাপাহাড়ের পশ্চাতে দাঁড়াইল।

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কালাপাহাড় বলিলেন, "গদাধর আবার দেখা।"

গদাধর উত্তর করিলেন, "হাঁ, কিন্তু এইবার শেষ।"

কালা। কেন প্রাণ দিতে এসেছ গদাধর?

গদা। প্রাণে আর প্রয়োজন কি ভাই?

কালা। এতদিন ছিল?

গদা। হাঁ।

কালাচাঁদের বক্ষ আলোড়ন করিয়া একটা নিঃশ্বাস পড়িল। গদাধর

তাহা লক্ষ্য করিলেন; সে নিঃশ্বাসের মর্ম্মও বুঝিলেন। বলিলেন, "কালাচাঁদ, তুমি এত অসুখী?"

কালাচাঁদ প্রত্যুত্তর করিলেন, "সে সব কথায় প্রয়োজন নাই—অস্ত্র ধর।"

দুইজনে লড়াই বাধিল। দুইজনই তুল্য নিপুণ, তুল্য বলশালী। অর্দ্ধ দণ্ড যুদ্ধ চলিল, কেহ কাহাকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না। উভয়ে ক্ষণকাল বিশ্রামার্থে অসি-অগ্রভাগের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের একজন আজ নিশ্চয়ই মরিবে; কিন্তু কে মরিবে গদাধর?—তুমি না আমি?"

গদা। আমি।

কালা। না, না, তুমি বেঁচে থাক—তুমি হিন্দু, হিন্দুধর্ম্মরক্ষক—

গদা। তুমিই কি হিন্দু নও, কালাচাঁদ?

কালা। ও কথা বল না, গদাধর। আমার যজ্ঞোপবীত নেই, আমি গায়ত্রী জপ করি না—

গদা। গায়ত্রী ত জপ কর্‌বার নয়—ধ্যান করবার—ধ্যানের বস্তু। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অণুপরমাণুতে সর্ব্বশক্তিময় দেবতা বিরাজ করছেন, এ চিন্তাই ত গায়ত্রী; তা' হিন্দুর বেশ ধারণ করেই কর, আর মুসলমানের পোষাক পরেই কর।

ক্ষণকাল মৌনী থাকিয়া কালাচাঁদ কহিলেন, "আমি ত ঠাকুর দেবতার—তোমাদের ঠাকুর দেবতার কখন ধ্যান করি না।"

গদাধর। তিনি ত ধ্যানের বস্তু ন'ন—তিনি অনুভবের বস্তু, কালাচাঁদ!

বুনার নয়ন অশ্রুভারাবনত হইল। কালাচাঁদ সুদূর আকাশপ্রান্ত পানে চাহিয়া নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার প্রতীতি হইল, যেন

একটা বিশ্বব্যাপী শক্তি তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাঁহার দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল; বহুদূর হইতে শব্দতরঙ্গে বাহিত হইয়া মধুর বীণাধ্বনি তাঁহার কর্ণমূলে ঝঙ্কৃত হইল; পরে তাঁহার দশ ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত হইল—তিনি সেই শক্তিসাগরে সংমিশ্রিত হইয়া গেলেন।

পর মুহূর্ত্তেই কালাচাঁদ তাঁহার স্বাতন্ত্র্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন; এবং মাথা নাড়িয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি আমায় কালাচাঁদ বলে ডেকো না—কালাপাহাড় বল।"

গদা। তুমি চিরদিনই কালাচাঁদ—হিন্দু—

কালা। না, না, অস্ত্র ধর—

উভয়ে পুনরায় দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অসিচালনা করিতে করিতে গদাধর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কালাচাঁদ, তুমি কি ভাব, তোমার অনতিক্রম্য শক্তিপ্রভাবে তুমি এই হিন্দুর দেশ জয় করিতেছ?"

"না, তা' মনে করি না; আমি কে?"

"তবে তুমি সহস্রবার হিন্দু; এ ভাব শুধু হিন্দুরই।"

কালাচাঁদ একটু উত্তেজিত হইয়া উত্তর করিলেন, "না, না, আমি হিন্দু নই—আমি হিন্দুর দুষমন।"

এই উত্তেজনা কালাচাঁদকে অসতর্ক করিল; গদাধর কালাচাঁদকে কাটিতে তরবারি উঠাইলেন—বুনা তদ্দৃষ্টে চীৎকার করিয়া উঠিল; নদীর অপর পার হইতে একটা গুলি ছুটিয়া আসিয়া গদাধরের বক্ষ বিদ্ধ করিল—উদ্যত খড়্গ হস্তচ্যুত হইল। কালাচাঁদ, গদাধরের পতনোন্মুখ দেহ বাহুমধ্যে ধারণ করিয়া ভূশয্যায় স্থাপন করিলেন; পরে পিছন ফিরিয়া নদীর অপর কূলের দিকে নেত্রপাত করিলেন। দেখিলেন, একজন পাঠান বন্দুক নামাইতেছে। কালাচাঁদ ক্ষিপ্রপদে ছুটিয়া গেলেন এবং সেই বন্দুকধারী সৈনিককে দ্বিখণ্ড করিয়া কাটিলেন। তাহাতেও তাঁহার

তৃপ্তি হইল না; তিনি তাহার মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া অবশেষে পদাঘাতে নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন।

উন্মত্ত হৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়া কালাচাঁদ দেখিলেন, গদাধরের ক্ষত-স্থানে বুনা বারিসিঞ্চন করিতেছে। অনেক শুশ্রূষার পর গদাধর নয়নোন্মীলন করিলেন। সস্নেহে কালাচাঁদ, গদাধরের ভূলুণ্ঠিত দেহ ক্রোড়োপরি তুলিয়া লইলেন। গদাধর ডাকিলেন, "কালাচাঁদ!"

"কি ভাই?"

"এক ভিক্ষা আছে।"

"তোমাকে আমার অদেয় কি আছে ভাই?"

গদাধর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিলেন, "ভাই, ব্রজবালাকে দেখিও।"

কালাচাঁদ চমকিয়া উঠিলেন; সহসা কোন উত্তর করিলেন না। গদাধর কহিলেন, "কালাচাঁদ, আমার সময় অতি অল্প।"

কালাচাঁদ। বেশ, আমি তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিলাম।

গদাধরের নয়নপ্রান্তে অশ্রু দেখা দিল। ধীরে, অতি ধীরে কহিলেন, "কালাচাঁদ, তুমি যা' মনে করেছ, সে তা' নয়। একদিন আমার মত তোমারও ভুল ভাঙ্গবে।"

কালাচাঁদের ক্রোড়ে শুইয়া নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-সন্তান গদাধর প্রাণত্যাগ করিলেন। কালাচাঁদ বরুণার উপকূলে স্বহস্তে চিতা সাজাইয়া গদাধরের দেহ ভস্মীভূত করিলেন।

---

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কালাপাহাড়ের গতি কেহ রোধ করিতে পারিল না। করিম সা সেই দিবস অপরাহ্ণে প্রায় পঞ্চসহস্র সৈন্য লইয়া বাধা দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু কালাপাহাড় তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "বৃথা লোকক্ষয় করিও না, সম্রাটপুত্র! তোমার এ মুষ্টিমেয় সৈন্য আমি একাই সংহার করিতে পারি। আজ আমার সম্মুখে আসিও না—পলাও।"

করিম সা উত্তর করিলেন, "গর্ব্ব, শক্তি নয়, পাঠান-সেনাপতি! যদি বাহুতে শক্তি থাকে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করুন।"

"দিতেছি—সত্বরই দিতেছি।"

"আপনি হয়ত বিস্মৃত হইয়াছেন আমার অস্ত্রগুরু কে? আজ সেই গুরুর নিকট অস্ত্রশিক্ষার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।"

"পরিচয় লইবার অবসর নাই, সম্রাটপুত্র! আর এটাও স্মরণ রাখিবে, গুরু শিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু শক্তি ও চক্ষু দিতে পারে না—আত্মরক্ষা কর।"

কালাপাহাড়ের প্রথম আঘাতেই করিম সার খড়্গ ভাঙ্গিয়া পড়িল। পাঠান-সেনাপতি, করিম সাকে কাটিতে খড়্গ উঠাইলেন। করিম সা প্রফুল্লমুখে কালাপাহাড়ের উদ্যত অস্ত্র-নিম্নে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "আমায় মার, সেনাপতি, আমার এ অপ্রয়োজনীয় জীবনের শেষ করে দেও।"

কালাপাহাড় উদ্যত খড়্গ নামাইয়া কহিলেন, "দ্বিতীয় অস্ত্র গ্রহণ কর, সম্রাটপুত্র!"

করিম সা দ্বিতীয় অস্ত্র গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "আজ আমার জীবন সার্থক; বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ অস্ত্রবিশারদ—"

বাক্য শেষ হইতে না হইতেই করিম সা অশ্বসহ দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িলেন। তাঁহার সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কালাপাহাড় ভুবনেশ্বরের দ্বারে সমুপস্থিত হইলেন। শোকোন্মত্ত পাঠান সেনাপতি আজ ভীষণদর্শন—নয়নে বিদ্যুৎ, বদনে নিবিড় মেঘ, কণ্ঠে গম্ভীর গর্জ্জন। মূঢ় হরিকীর্ত্তন সে মেঘ বা বিদ্যুৎ দেখিতে পাইল না। সে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পারিষদবৃন্দে পরিবৃত হইয়া ক্ষুদ্র পতঙ্গের ন্যায় বহ্নি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; এবং হাস্যবদনে অভিবাদন করিয়া বলিল, "পাঠান-সেনাপতি, স্বাগত। আপনার অভ্যর্থনার্থে নগর সুসজ্জিত হইয়াছে।"

বলিতে বলিতে তিনি হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন এবং বারংবার পাঠান-সেনাপতিকে সেলাম করিতে লাগিলেন। পাঠান-সেনাপতি কিন্তু অশ্ব হইতে নামিলেন না; তিনি তদুপরি অবস্থান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাণ্ডাইত, আপনি সিংহাসন চাহিয়াছেন না?"

অতি প্রফুল্লকণ্ঠে হরিকীর্ত্তন উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, জাঁহাপনা।"

কালাপাহাড় কহিলেন, "আপনি আপনার পিতার উপযুক্ত পুত্র—আপনাকে সত্বরই সিংহাসনে বসাইতেছি।"

বলিয়া তিনি এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করিলেন। সে ব্যক্তি দলবলসহ আসিয়া হরিকীর্ত্তনকে বেষ্টন করিল। জল্লাদ অগ্রসর হইয়া ভূগর্ভে শূলদণ্ড প্রোথিত করিল। তদ্দৃষ্টে হরিকীর্ত্তন কাঁপিয়া উঠিল। একজন পাঠান বিদ্রূপ করিয়া কহিল, "সিংহাসনটা কিছু উচু হ'ল, না?"

আর একজন বলিল, "বাপের দুর্দ্দশা দেখেও যা'র শিক্ষা হ'ল না, তা'র শূলে যাওয়াই ভাল।"

হরিকীর্ত্তন কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "আমি ত সমস্ত রাজ্য চাইনি—"

কালাপাহাড় গর্জ্জিয়া বলিলেন, "যে স্বদেশবৈরী বিশ্বাসঘাতক, তার আসন শূলের উপর—সিংহের উপর নয়।"

সহসা কালাপাহাড় শুনিলেন, তাঁহার কাণের কাছে কে বলিয়া গেল, "আর তোমার আসন কোথায় কালাপাহাড় ?" তিনি চমকিয়া উঠিলেন; মুখ আরও গম্ভীর করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

দুর্গপ্রাচীরনিম্নে সকলের সম্মুখে কম্পিতকলেবর হরিকীর্ত্তনকে সমুচ্চ শূলের উপর বসান হইল। উৎকলবাসীরা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। কালাপাহাড় সসৈন্যে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং বিনা কালব্যয়ে হিন্দুমন্দিরধ্বংসে প্রবৃত্ত হইলেন। শালগ্রাম কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল—বিগ্রহ পদতলে মর্দ্দিত হইল—পুত্তলিকা খড়্গাঘাতে ছিন্ন ও বিধ্বস্ত হইল। সে চিত্র অঙ্কনে কোন প্রয়োজন নাই। সকলেই অবগত আছেন, কালাপাহাড় হিন্দুমন্দির কিরূপে উড়িষ্যা, বাঙ্গালা, আসাম ও কাশীধামে ধ্বংস করিয়াছিল। এখনও দেশমধ্যে প্রবাদ আছে, "কালাপাহাড়ের কাড়া নাগরা বাজিলে দেবমূর্ত্তিসকল কম্পিত হইত।"

ভুবনেশ্বর ধ্বংস করিয়া কালাপাহাড় শ্রীক্ষেত্র অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেখানে প্রবল বাধা প্রাপ্ত হইলেন। কুজঙ্গ অধিপতি, মুকুন্দদেবের দ্বিতীয় পুত্র ছকড়ি রায়কে টানিয়া আনিয়া গৌড়িয়া গোবিন্দ নাম দিয়া তাড়াতাড়ি সিংহাসনে বসাইলেন; এবং বিগ্রহ রক্ষার্থ বিপুল আয়োজন করিলেন। কিন্তু নগর রক্ষার্থ তেমন ব্যবস্থা হইল না; জগন্নাথদেবকে লইয়াই সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তা' হইলেও নগরে এত লোক, এত অস্ত্র সমবেত হইয়াছিল যে, কালাপাহাড়কে পনর দিবস কাল নগরদ্বারে বসিয়া নানা কৌশল উদ্ভাবন

করিতে হইয়াছিল। পনর দিন পরে কালাপাহাড় যখন নগরে প্রবেশ করিলেন, তখনও তাঁহাকে প্রত্যেক পাদভূমি নররক্তে রঞ্জিত করিয়া শবস্তূপের উপর দিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল।

পথে পথে এইরূপ তিন দিন যুদ্ধ করিয়া কালাপাহাড় অবশেষে একদা মধ্যাহ্নে গরুড়স্তম্ভের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু সেখানে দাঁড়াইবার অবসর পাইলেন না। মন্দির-প্রাচীরের উপর অগণিত ধানুকী-সৈন্য উচ্চ সোপানাবলীতে ভল্ল ও শূল লইয়া সহস্র সহস্র উৎকল-যোদ্ধা, বিস্তীর্ণ মন্দির-প্রাঙ্গণে অসংখ্য খড়্গধারী অবস্থান করিতেছিল। কালাপাহাড় একটু পিছাইয়া সোপানাবলীর সম্মুখে একটা কামান বসাইলেন। উৎকলযোদ্ধা কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু পিছাইল না। মহাপ্রভুর নামোচ্চারণ করিতে করিতে একে একে প্রাণ দিল, কিন্তু একজনও নড়িল না। কালাপাহাড় যখন সোপানতলে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন শবস্তূপে তাঁহার পথ রুদ্ধ। মৃতদেহ সরাইয়া কালাপাহাড়কে পথ করিতে হইল।

উপরে—মন্দির-প্রাঙ্গণে—কালাপাহাড়কে বিপুল বাধা পাইতে হইল। সেখানে কামান বা বন্দুক চলিল না; খড়্গ ও শূল লইয়া হাতাহাতি যুদ্ধ করিতে হইল। পাঠান হটিল; আবার অগ্রসর হইল; আবার পিছাইল। অবশেষে পাঠানকে ফিরিয়া আসিয়া গরুড়স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইতে হইল। ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিয়া কালাপাহাড় উলঙ্গ কৃপাণ-হস্তে পুনরায় অগ্রসর হইলেন। তাঁহার পিছনে বাছা বাছা দুই হাজার পাঠানযোদ্ধা চলিল।

এবার কালাপাহাড়ের গতি কেহ রোধ করিতে পারিল না। তাঁহার সুদীর্ঘ খড়্গতলে শতাধিক হিন্দুযোদ্ধা লুটাইয়া পড়িল। ক্ষণমধ্যে শবস্তূপে প্রাঙ্গণ ভরিয়া গেল। কিন্তু হিন্দু পিছাইল না; হিন্দু, বিগ্রহ-

রক্ষার্থে প্রাণ দিতে আসিয়াছিল,—প্রাণ লইয়া পলাইতে আসে নাই। যে হিন্দুর অস্ত্র ভাঙ্গিয়া গেল, সে মৃত যোদ্ধার হস্ত হইতে অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। যাহার সে সুযোগ হইল না, সে মুষ্ট্যাঘাতে পাঠান মারিতে লাগিল। যে আহত হইয়া ধরাশায়ী হইল, সে পতনকালে একজন না একজন শত্রুকে জড়াইয়া ধরিয়া পড়িল। এইরূপে হিন্দু, দেবতার শত্রুকে মারিয়া প্রাণ দিতে লাগিল। কিন্তু প্রাণ দিয়াও হিন্দু, বিগ্রহ রক্ষা করিতে পারিল না; পাঠান শ্রীমন্দিরের দ্বারে গিয়া উঠিল।

সেখানে মুষ্টিমেয় হিন্দু যে বীরত্ব দেখাইয়াছিল, তাহা পাঠান পূর্ব্বে কখন দেখে নাই। শবস্তূপে দ্বারপথ বন্ধ হইয়া গেল; হিন্দু সেই স্তূপের উপর উঠিয়া লড়াই করিতে লাগিল। হিন্দুর শ্রান্তি নাই, ভয় নাই। পাঠান একদল শ্রান্ত হইয়া পিছাইয়া যায়, নূতন দল আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। দশজন পাঠান ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়ে, বিশজন পাঠান তাহার স্থান গ্রহণ করে। কিন্তু হিন্দু মরিলে তাহার স্থান গ্রহণ করিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। অবশেষে পাঠান শবরাশি সরাইয়া মন্দিরের ভিতর গিয়া উঠিল। সেখানে অন্ধকার; কালাপাহাড়ের আদেশে শত দীপ ক্ষণমধ্যে জ্বলিয়া উঠিল।

এই কি সেই লোকবিশ্রুত জগন্নাথ? এই কি সেই পদ্মপত্রায়তনয়ন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শান্ত কৃষ্ণমূর্ত্তি? এই কি ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার সনাতনী প্রতিমা? অনন্ত দয়া, অনন্ত প্রেম, অনন্ত রূপ লুকাইয়া রাখিয়া, এ কি ভয়াবহ মূর্ত্তিতে দর্শন দিতেছ নাথ?

কালাপাহাড় মুহূর্ত্তের জন্য স্পন্দহীন নয়নে প্রতিমা পানে চাহিলেন। তারপর দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া প্রতিমার চরণ ধরিয়া সবলে টানিলেন; প্রতিমা কাঁপিয়া উঠিল। এক ব্যক্তি বেদীর পিছন হইতে সহসা অগ্রসর

হইয়া কালাপাহাড়ের সম্মুখীন হইল; এবং পাঠান-সেনাপতির হস্তধারণ করিয়া বলিল, "মুসলমান, ক্ষান্ত হও।"

কালাপাহাড় বলিলেন, "কে, বেসর মহান্তি? এখনও জীবিত আছ?"

মহান্তি। প্রভুর ইচ্ছা তাই বেঁচে আছি।

কালাপাহাড়। দেখি তোমার প্রভু কেমন তোমায় বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারেন?

বলিয়া তিনি একজন পাঠানকে ইঙ্গিত করিলেন। পাঠান অগ্রসর হইয়া মহান্তিকে কাটিতে খড়্গ উঠাইল; কিন্তু খড়্গ নামিল না। মহান্তি গদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন, "মুসলমান, তুমি আজও বুঝ নাই, খোদাতালার ইচ্ছা ব্যতীত একটী পিপীলিকাও পদতলে মর্দ্দিত হইতে পারে না।"

কালাপাহাড় ফিরিয়া দেখিলেন, পাঠান-সৈনিকের উত্থিত হস্ত শূন্যে রহিয়াছে—পাঠান হাত নামাইতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতেছে না। সে একটু ভীত, ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেনাপতি দ্বিতীয় পাঠানকে ইঙ্গিত করিলেন। সে খড়্গ উঠাইল, কিন্তু নামাইতে পারিল না। কালাপাহাড় দেখিলেন, এক বৌদ্ধ ভিক্ষু দ্বিতীয় পাঠানের সান্নিধ্য হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। ভিক্ষুর মূর্ত্তি কালাপাহাড়ের নয়ন হইতে দূরে অপসৃত হইতে না হইতেই মন্দির পরিপূরিত করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে নিনাদিত হইল,—"কালাচাঁদ, প্রণাম কর—জগন্নাথ সুভদ্রা বলরামকে প্রণাম কর—বুদ্ধ ধর্ম্ম সঙ্ঘের সম্মুখে মস্তক নমিত কর—শান্তি ভক্তি মুক্তিকে বরণ কর।"

কালাপাহাড়ের অজ্ঞাতসারে তাঁহার মস্তক নমিত হইয়া আসিল, সমস্ত দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল; তিনি ক্ষণেকের জন্য আত্মবিহ্বল

হইলেন, তা'রপর সেই ক্ষণিক দুর্ব্বলতা দূর করিয়া ফেলিয়া কালাপাহাড় মেঘমন্দ্র কণ্ঠে আদেশ করিলেন,—"মূর্ত্তি উঠাও।"

বিশ ত্রিশ জন পাঠান বেদীর উপর উঠিল; এবং জগন্নাথদেবকে ধরিয়া নীচে নামাইল। তারপর 'আল্লা' 'আল্লা' রবে ক্ষেত্রভূমি ফাটাইয়া মূর্ত্তি বহিয়া লইয়া সমুদ্র-অভিমুখে চলিল। কালাপাহাড় অশ্বারোহণে সকলের আগে; বুনা তাঁহার পিছনে—দ্বিতীয় অশ্বে। কালাপাহাড় নয়ন ফিরাইয়া চতুর্দ্দিকে বৌদ্ধ ভিক্ষুর অনুসন্ধান করিতেছিলেন, কিন্তু পথে কোনও স্থানে তাঁহার দর্শন পাইলেন না। কালাপাহাড় যেন একটু নিরাশ হইলেন।

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

স্থির হও বারিধি, স্থির হও। চঞ্চল চরণে আর বহিও না, গর্ব্বে আর স্ফীত হইও না, হুঙ্কারে আর গগন ফাটাইও না। ফিরিয়া দেখ, তোমার তটে সান্ধ্যগগন আলোকিত করিয়া কাহার চিতা জ্বলিতেছে। যাঁহার ইচ্ছায় তুমি সৃষ্ট, যাঁহার পূত চরণ স্পর্শ করিয়া তোমার এত অহঙ্কার, যাঁহার পূজার্থে তুমি নিয়ত পুষ্পমাল্য অর্পণ করিতেছ, আজ তাঁহার চিতা তোমার তটে জ্বলিতেছে। লক্ষ লক্ষ চিতা তোমার তটে জ্বলিয়াছে, কোটী কোটী শব তোমার গর্ভে নিহিত রহিয়াছে; কিন্তু তোমার রাজা, পৃথিবীর রাজা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতির চিতা প্রজ্বলিত

হইতে কখন দেখিয়াছ কি? চিতা ধূ-ধূ জ্বলিতেছে—চাহিয়া দেখ—বিশ্বে যে যেখানে আছ কোটী নয়নে চাহিয়া দেখ—বিশ্বপিতার চিতা আজ সমুদ্র উপকূলে পুড়িতেছে।

যেখানে জগন্নাথদেবের দারুমূর্ত্তি পুড়িতেছিল, তাহার অদূরে ব্রজবালার ক্ষুদ্র কুটীর। ব্রজবালা তখন সৈকতভূমে দণ্ডায়মানা। তিনি প্রাতঃকালেই শুনিয়াছিলেন, মন্দির পাঠান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। উৎকর্ণ হইয়া ব্রজবালা সমস্ত দিন গগনভেদী সমর কোলাহল শুনিতেছিলেন। সন্ধ্যাকালে ললাটীর নিকট শুনিলেন, পাঠান শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠিক্ বল্‌তে পার কি ললাটী, শ্রীবিগ্রহ হ্রদ-গর্ভে লুকিয়ে ফেলা হয়েছে কি না?"

"না মা—আমি জানি নে; নগরের ভিতর আমি ত যেতে পারছি না।"

এমন সময় নটবর রক্তাক্ত কলেবরে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "প্রতিমা লুকান হয় নি—তোমার কথা কেহ শুনে নি মা! শীঘ্রই প্রতিমা দেখ্‌তে পাবে।"

বলিতে বলিতে নটবর ছুটিয়া পলাইল; এবং অন্ধকার-ক্রোড়ে সত্বর অদৃশ্য হইল। ললাটী চিন্তিতান্তঃকরণে তাহার অনুসরণ করিল। দূরের কোলাহল নিকটতর হইল; মশালের আলোকে মনুষ্যাবয়ব দৃষ্ট হইতে লাগিল। নির্ম্মলা কুটীরদ্বারে উপবিষ্টা ছিল; সে ভীত হইয়া ছুটিয়া পলাইল। ব্রজবালা একাকিনী সমুদ্র-সৈকতে দণ্ডায়মানা থাকিয়া কোলাহল শুনিতে লাগিলেন।

এমন সময় অকস্মাৎ এক ব্যক্তি অন্ধকারের ভিতর হইতে আসিয়া ব্রজবালার হাত চাপিয়া ধরিল; এবং ব্যস্ততাসহ বলিল, "রাণি, রাণি, শীঘ্র পালিয়ে এস।"

রাণী কণ্ঠস্বরে চিনিলেন, এ ব্যক্তি, ভৃগুরাম। তিনি রোষভরে বলিলেন, "ভৃগুরাম, এত আস্পর্দ্ধা!"

"এখন কে তোমায় রক্ষা করবে ব্রজসুন্দরি?"

এইরূপে অভিহিত হইয়া ব্রজবালা জ্বলিয়া উঠিলেন; এবং সবলে হস্ত মুক্ত করিয়া লইয়া গর্জ্জিয়া কহিলেন, "এখনি তা' দেখবে, পাপিষ্ঠ!"

যে বেগে রাণী হস্ত মুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, সে বেগ ভৃগুরাম সহ্য করিতে পারিল না—তাহার চরণ টলিয়া উঠিল। এমন সময় একটা তরঙ্গ আসিয়া ভৃগুরামকে আঘাত করিল। ভৃগুরাম বালুকার উপর পড়িয়া গেল; সে আর উঠিতে পারিল না। তরঙ্গ একবার টানিয়া লইয়া যায়, আবার নির্ম্মমভাবে টানিয়া আনিয়া কূলের উপর আছড়াইয়া ফেলে। তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া ব্রজবালার বড় কষ্ট হইল। তিনি তাহাকে রক্ষা করিতে হস্ত প্রসারণ করিলেন। ভৃগুরাম অন্ধকারে সে প্রসারিত হস্ত লক্ষ্য করিতে পারিল না। ব্রজবালার দৃষ্টি ও মন সহসা অন্য দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি দেখিলেন, কয়েকজন পাঠান, জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি আনিয়া বেলাভূমির উপর স্থাপন করিল। পুরোভাগে অশ্বারোহণে কালাপাহাড়। তাঁহার চতুর্দ্দিকে বহুতর ব্যক্তি প্রজ্বলিত মশাল লইয়া চলিয়াছে। সৈন্যেরা সমুদ্রকূলে আসিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি আকারে ব্যূহরচনা করিল। ব্রজবালা দূর হইতে দেখিলেন, কালাপাহাড়, অশ্ব হইতে নামিয়া বেলাভূমিতে দাঁড়াইলেন। তাঁহার পার্শ্বে আর এক জন কে দাঁড়াইল; এ ব্যক্তি বুনা। কিন্তু ব্রজবালা তাহাকে চিনিতে পারিলেন না; অথচ পূর্ব্বে তাহাকে দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তা'রপর সহসা প্রতিমা জ্বলিয়া উঠিল। ব্রজবালা আত্মবিস্মৃত হইয়া মহাপ্রভুর প্রজ্বলিত মূর্ত্তি প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

ব্রজবালার সে সমাধি নটবর ভঙ্গ করিল। সে বলিল, "প্রতিমা পুড়্ছে, তাই দেখ্ছ মা? দেখ, দেখ—নয়ন ভরে দেখ—উড়িষ্যার ভাগ্য, সুখ, ধর্ম্ম পুড়ছে দেখ; ভস্মাবশেষ কিছু কি ফিরে পাব না?—ওই যে মেঘ উঠ্ছে—"

ব্রজবালা সহসা কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। ক্রমে বুঝিলেন, নটবর তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, আর ভৃগুরাম পায়ের কাছে লুটাইতেছে। তিনি ভৃগুরামকে রক্ষা করিতে পুনরায় হস্ত প্রসারণ করিলেন। নটবর জিজ্ঞাসা করিল, "এ কে মা?"

"ভৃগুরাম।"

"তা'র এমন দুর্দ্দশা কেন?"

"জগন্নাথদেবের ইচ্ছা; অপরাধ আমার হাত ধরেছিল।"

"আমার মায়ের হাত—"

মুখের কথা শেষ না করিয়াই নটবর, ভৃগুরামকে জল হইতে টানিয়া তুলিল; এবং বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানা ক্ষুদ্র খড়্গ বাহির করিয়া তাহার বক্ষমধ্যে আমূল প্রবিষ্ট করাইয়া দিল। নটবর ক্ষণেকের জন্য নীরব নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইল। তারপর বিকট হাস্য করিয়া খড়্গ উঠাইয়া লইল; এবং টলিতে টলিতে জলের উপর দিয়া প্রতিমার দিকে ছুটিল। ব্রজবালা দাঁড়াইয়া একটু কি ভাবিলেন, তা'রপর নটবরের অনুসরণ করিয়া চলিলেন।

এমন সময় সমস্ত বিশ্ব চমকিত করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল। পাঠান শিহরিয়া উঠিল; সমুদ্রের উপর মেঘের গর্জ্জন পাঠান কখন শুনে নাই। কিন্তু কালাপাহাড় নির্ভীক। বুনা ভীতচিত্তে সরিয়া আসিয়া কালাপাহাড়ের পার্শ্বে দাঁড়াইল। আবার মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল—আকাশ পৃথিবী উদ্ভাসিত করিয়া তড়িল্লতা খেলিয়া গেল। সেই আলোকে

কালাপাহাড় দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে—অদূরে এক জটাজূটসমন্বিত মহাতেজঃপুঞ্জ দীর্ঘাকার সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তিনি ডাকিলেন, "কালাচাঁদ!"

সেনাপতি চমকিয়া উঠিলেন। যিনি মেঘের ডাক গ্রাহ্য করেন নাই, তিনি এখন অন্তরমধ্যে কাঁপিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল, এই সন্ন্যাসীকেই যেন তিনি ক্ষণপূর্ব্বে বৌদ্ধভিক্ষুরূপে মন্দিরমধ্যে দেখিয়াছিলেন। কালাচাঁদ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সন্ন্যাসীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী ডাকিলেন,—"কালাচাঁদ!"

কালাচাঁদ। তোমাকে চিনেছি সন্ন্যাসি! তুমিই একদিন বাল্যকালে আমার কররেখা দেখে বিষপ্রয়োগে আমাকে সংহার করতে জননীকে পরামর্শ দিয়েছিলে।

সন্ন্যাসী। পরামর্শটা কি অন্যায় হ'য়েছিল, কালাচাঁদ?

কালাচাঁদ। যা'র বিশ্বাস ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত গাছের পাতাটি পড়ে না, তা'র পক্ষে এ পরামর্শ অন্যায় হ'য়েছিল।

সন্ন্যাসী। তোমার যদি বিশ্বাস থাকিত, বাক্য মনঃ সকলই তিনি, তাঁহা হইলে তুমি এ কথা বলিতে না। তোমার শিক্ষা অসম্পূর্ণ—গর্ব্বই তাহার অন্তরায়। তুমি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু তোমার গর্ব্ব পর্ব্বতপ্রমাণ। আজ তোমার দর্প চূর্ণ হইবে—তাঁহারই ইচ্ছায় এই দারুময়ী প্রতিমা তোমার কবল হইতে রক্ষা পাইবে।

কালাচাঁদ। পৃথিবীর শক্তি একত্র হইলেও এই প্রতিমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

সন্ন্যাসী। এখনও গর্ব্ব! বেসর মহাস্তির কাছে শিক্ষা পাইয়াও কি চৈতন্য হয় নাই? বিংশতিসহস্র সৈন্য পরিবেষ্টিত দুর্দ্দান্ত পাঠান-সেনাপতি, একজন অস্ত্রহীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট পরাস্ত হইল; ইহা

দেখিয়াও কি বুঝিলে না তোমার শক্তি কত সামান্য? তুমি কত ক্ষুদ্র? তবে দেখ, গর্ব্বি—

তাঁহার বাক্য শেষ হইতে না হইতে আকাশ ভীম গর্জ্জনে ডাকিয়া উঠিল; সেই সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। অচিরে প্রজ্বলিত প্রতিমার অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। অনেক মশালও নিবিয়া গেল। পাঠান কেমন একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিল। কালাপাহাড় চীৎকার করিয়া আদেশ করিলেন, "তবু জগন্নাথের রক্ষা নাই—প্রতিমা সমুদ্রজলে ডুবাও।"

বিশ পঁচিশ জন পাঠান আসিয়া প্রতিমা ধরিল এবং বাহিয়া লইয়া সমুদ্রজলে ফেলিতে চলিল। তখন অনেক মশাল নিবিয়া গিয়াছিল; কয়েকটা মাত্র সেনাপতির অদূরে জ্বলিতেছিল। কিন্তু সে মৃদু ও অস্পষ্ট আলোকে কিছুই ভাল দেখা যাইতেছিল না। বৃষ্টিও মুষলধারে পড়িতে-ছিল। এমন সময় এক ব্যক্তি বুকে হাঁটিয়া দন্তে খড়্গ ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে কালাপাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইল। লোকটা তাঁহার পিছনে আসিয়া হস্তে খড়্গা লইল এবং ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিল না। তা'রপর কালাপাহাড়ের পৃষ্ঠ লক্ষ্য করিয়া খড়্গা উঠাইল। কিন্তু সে খড়্গা কালাপাহাড়ের পৃষ্ঠে পড়িল না—আর একজনের বক্ষে পড়িল। সেনাপতি সচকিতে ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, ব্রজবালা ভূলুণ্ঠিত, আর তাঁহার সন্নিকটে এক ব্যক্তি রুধিরাপ্লুত দেহে দণ্ডায়মান;—এ ব্যক্তি নটবর।

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কালাপাহাড় বুঝিলেন, ব্রজবালা তাঁহার জীবন রক্ষার্থে প্রাণ দিয়াছে। কেন সে প্রাণ দিল? যা'র নির্য্যাতনই ব্রজবালার ব্রত ছিল, এখন তা'র জীবন রক্ষার্থে কেন সে তা'র স্বার্থভরা প্রাণ দিল? কালাচাঁদ স্তম্ভিত হইলেন। তিনি বিকলচিত্তে ব্রজবালার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। যে মুখ তিনি আর দেখিবেন না স্থির করিয়াছিলেন, সেই মুখপানে পলকশূন্য নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

এই কি সেই ব্রজবালা? যা'র একবিন্দু প্রীতি পাইলে আজ এই শুষ্ক মরুভূমি কুসুম-উদ্যানে পরিণত হইত—উড়িষ্যা আজ অক্ষত থাকিত—বাঙ্গালা পাঠানশূন্য হইত, এই কি সেই লোকললামভূতা দীপ্তিময়ী ব্রজবালা?

বুনা একটা মশাল লইয়া ত্বরিতপদে কালাপাহাড়ের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বুনা দেখিল, ব্রজবালার হৃদয়মধ্যে তখন খড়্গ প্রোথিত রহিয়াছে। বুনা খড়্গ উঠাইতে সাহস করিল না—কি জানি যদি রক্তস্রাবে ব্রজবালার মৃত্যু ঘটে। ব্রজবালা সজ্ঞান, হাস্যমুখী। বুনা তাঁহাকে নাড়িতে সাহস করিল না; সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কালাচাঁদের মুখপ্রতি চাহিল। দেখিল, তিনি তখন বাহ্যজ্ঞানবিরহিত,—অনিমেষ নয়নে ব্রজবালার প্রীতিভরা মুখখানি দেখিতেছেন। এ প্রীতি ব্রজবালার নয়নে বা বদনে পূর্ব্বে তিনি আর কখন দেখেন নাই। ব্রজবালাও সমস্ত প্রাণটা নয়নে আনিয়া কালাচাঁদকে দেখিতেছিলেন।

এমন সময় নটবর চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "বেশ হয়েছে, মা—বেশ, হয়েছে; যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল। তুমিই ত আমার মাথা খেয়েছ। শিখালে ধর্ম্ম, শিখালে দেশ-প্রীতি, এখন তা'র ফল ভোগ কর।"

তা'রপর পাঠান-সেনাপতির দিকে ফিরিয়া বলিল, "কালাপাহাড়, দেশের শত্রু! ধর্ম্মের শত্রু! আমি তোমাকে মারতে এসেছিলাম; তোমাকে না মেরে, যে আমার ধর্ম্ম অপেক্ষা, দেশ অপেক্ষা বড়, তা'কে মেরেছি—আমাকে শাস্তি দাও।"

কালাপাহাড় নড়িলেন না, বাঙ্নিষ্পত্তি করিলেন না—যেমন অবস্থায় ব্রজবালার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তেমনই দাঁড়াইয়া রহিলেন। দুইজন পাঠান নটবরকে লইয়া অদৃশ্য হইল।

ব্রজবালার মস্তক বুনা কোলের উপর উঠাইয়া লইল; তখন ব্রজবালার দৃষ্টি সহসা বুনার মুখপ্রতি পড়িল। তিনি বলিলেন, "দিদি——ভূপবালা, তুমি?"

বুনা মুখ ফিরাইয়া লইল; এবং সজল ক্ষমাপ্রার্থী চক্ষু দুইটী উঠাইয়া কালাচাঁদের বদন প্রতি স্থাপন করিল। কিন্তু কালাচাঁদ সে দিকে লক্ষ্য করিলেন না,—তাঁহার নয়ন মন ব্রজবালার প্রতি। মৃদুকণ্ঠে একবার ডাকিলেন,—"ব্রজ, আমার ব্রজরাণী—"

ব্রজবালার নয়ন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল—বদনময় একটা জ্যোতিঃ প্রকটিত হইল।

এমন সময় সন্ন্যাসী দূর হইতে সমুচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, "ওই দেখ কালাচাঁদ, অর্দ্ধদগ্ধ প্রতিমা তরঙ্গশিরে ভাসিয়া চলিয়াছে, আর বেসর মহান্তি মূর্ত্তির চরণ ধরিয়া যাইতেছে। মহান্তি প্রতিমা রক্ষা করিবে, আবার স্বস্থানে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে। তোমার গর্ব্ব বৃথা, শক্তি বৃথা।"

কালাচাঁদের সমাধি ভঙ্গ হইল,—তিনি সমুদ্রপানে নয়ন ফিরাইলেন; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সব অন্ধকার—নিবিড় অন্ধকার। সন্ন্যাসীর কণ্ঠ আবার গর্জ্জিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "অন্ধকার ভেদ করিতে অসমর্থ হইলে কালাচাঁদ? তবে কেন শক্তির গর্ব্ব কর? ওই দেখ—সম্মুখে, নিকটে চাহিয়া দেখ—আমি তোমাকে চক্ষু দিতেছি, চাহিয়া দেখ—মহাশূন্যে তোমার মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে—ওই দেখ, তোমার হস্ত পদ নাসিকা কর্ণ জিহ্বা একে একে খসিয়া পড়িতেছে—"

কালাপাহাড় শিহরিয়া উঠিলেন। ভূপবালার হাতের আলো নিবিয়া গেল—একে একে সকল মশালই নিবিয়া আসিল। চারিদিক্ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। সেই নিবিড় অন্ধকার কাঁপাইয়া, সমুদ্র গর্জ্জন ডুবাইয়া সন্ন্যাসীর গগনভেদী কণ্ঠ আবার উঠিল। হিন্দু, পাঠান সকলে শুনিল, সন্ন্যাসী বলিতেছেন,—"আবার দেখ—দূরে চাহিয়া দেখ—গগনস্পর্দ্ধী সমুচ্চ মন্দিরচূড়া—মন্দিরমধ্যে লক্ষ শালগ্রামের উপর প্রেমময় জগন্নাথদেবের সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি। দেখ, ত্রিলোক দেবদর্শনে ছুটিয়া চলিয়াছে—ওঙ্কার মূর্ত্তি ধরিয়া প্রতিমার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—বেদ গীতা, ধর্ম্ম সত্যরূপে পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে,—ওই দেখ, জয় জগন্নাথ!"

## গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | বীরপূজা | ( দ্বিতীয় সংস্করণ ) | উপন্যাস |
| ২। | বঙ্গ সংসার | ঐ | ঐ |
| ৩। | রাজা গণেশ | ঐ | ঐ |
| ৪। | বাঙ্গালীর বল | ঐ | ঐ |
| ৫। | নীরদা | ঐ | ঐ |
| ৬। | বঙ্কিম-জীবনী | ঐ | ঐ |

প্রায় সকল পুস্তকই নিঃশেষিত হইয়াছে। পুনরায় ছাপাইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।